

মাসুদ রানা
সাগর সঙ্গম
দুইখন্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন





এক নজরে

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমণি *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
 দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিশ্ময়ণ *রক্তদ্বীপ
 নীল আতঙ্ক *কায়রো *মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচর *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি
 অন্ধকার *জ্ঞান *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষাপা নর্তক *শয়তানের
 দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু
 পিশাচ *দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *শ্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু
 অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলহবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক
 এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং স্মাট *কুউউ!
 বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা
 সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান
 সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাভ্রা
 বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা
 নিরাপদ কারাগার *স্বর্ণরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত
 লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুড়া *বেনামী বন্দর *নকল রানা
 রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *সম্পর্ক *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ
 চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা
 অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী
 কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং
 কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ
 যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন স্মাট *বিষকন্যা *সত্যাবা
 *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর
 স্থাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *শ্যাক ম্যাজিক *তিষ্ঠে অবকাশ
 ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক
 *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী
 দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ
 রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাঁউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ
 নীল বন্ধু *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা
 রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকস্মাট *সাত রাজার ধন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং
 স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

সাগর সঙ্গম-১

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৬৭

এক

নানান সাইজের টপ্ সিক্রেট মার্কা মারা একগাদা ফাইলের মধ্যে ডুবে বসে আছে রানা মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার একটি প্রাসাদোপম বাড়ির ছয়তলায়, নিজ অফিস কামরায়। আর উত্তরোত্তর বিরক্ত হয়ে উঠছে মনে মনে। অসহিষ্ণুভাবে উল্টে যাচ্ছে সে পাতার পর পাতা। আরও ঝাড়া একটি ঘন্টা নাঙ্গল চালাতে হবে তাকে এই সব শুকনো, নীরস, কাঠখোঁট্টা ফাইলের মধ্যে। রুটিন ওয়ার্ক। করতেই হবে।

জাহেদ, সলীল, নাসের—তিনজনই বাইরে। নাসেরের খবর পাওয়া গিয়েছে, বেঁচে আছে, সুইস সরকারের তত্ত্বাবধানে জেনেভার এক হাসপাতালে আরোগ্যলাভ করছে সে কাজ সমাধা করে। আর দু'জনের কোন খবর নেই। সবাই আছে ওরা কাজের মধ্যে। আর রানা? মাছি মারছে সে ঢাকায় বসে। কোনও কাজ নেই। তাছাড়া ওরা কেউ একজন না ফিরলে ওকে দেশের বাইরে পাঠানো যাবে না। হাতের ফাইলটা বন্ধ করে আউট লেখা ট্রেডে ফেন্সল রানা ঝপাৎ করে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেটের দিকে চাইল।

এপ্রিলের গরম ক্যানের হাওয়ায় কাটছে না। থেকে থেকেই ঘেমে উঠছে হাতের তালু। সর্বদে একটা চটচটে ভাব। বিচ্ছিরি। পাশের ঘরে খটাখট টাইপ করে চলেছে নাসরীন রেহানা রানার ইন্সট্রাক্ট অ্যাসাইনমেন্টের বিস্তারিত রিপোর্ট। গত সাতদিন ধরে অবিরাম খাটছে বেচারী নিষ্ঠার সঙ্গে।

বিরাট বাড়ি বিকেলের দিকে কেমন যেন নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিচের তলার দপ্তরগুলো ডালা মেঝে দিয়ে একে একে চলে যায় ভাড়াটেরা। হঠাৎ শূন্য ফাঁকা মনে হয় রানার। মনে হয়, একসময় থাকবে না সে পৃথিবীতে, কিন্তু এই বিশাল বাড়িটা থাকবে। এই কামরায় বসে অন্য কেউ একজন অনুভব করবে এই নির্জন নিস্তব্ধতা।

সত্যি, ক'দিন বাঁচবে সে? আর সাত বছর পর বিপজ্জনক কাজ থেকে সরিয়ে ডেপুটি-ওয়ার্ক দেয়া হবে ওকে। কিন্তু এই সাত বছর কি পারবে সে টিকে থাকতে? সাত বছর মানে কমপক্ষে সাত দু'গুণে চোদ্দটা ভয়ঙ্কর অ্যাসাইনমেন্ট। একশটিও হতে পারে। টেকার সম্ভাবনা কম। তাই টাকা জমায় না সে কখনও। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে ওর। যত কম পারা যায় তত কম টাকা ব্যাঙ্কে রেখে মারা যেতে চায় সে। রাজার মাকে নমিনি করে পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইনশিওরেন্স করিয়েছে আজ বছর চারেক হলো, এই যা ওর সঞ্চয়।

তবে এটা ঠিক, ডেস্কওয়ার্কের বয়স হয়ে গেলে চাকরি ছেড়ে দেবে সে। ছয় বছর পরেই ইনশিওরেন্সের টাকাটা হাতে আসছে। একশো দেড়শো বিঘা জমি নেবে সে রাজশাহীতে। গোটা দুই পাওয়ার টিলার নিয়ে গিয়ে ফার্ম করবে আধুনিক পদ্ধতিতে। ইরি ধানের চাষ।

ক্রিবলিং প্যাডটা টেনে নিয়ে হিসেব করতে বসল সে। বিঘা প্রতি তিরিশ মন করে ধান হলে একশো বিঘায় ধান পাওয়া যাবে তিন হাজার মন। বিশ টাকা মন দরে বিক্রি করলে টাকা আসছে ষাট হাজার। ঠিকমতো সার দিয়ে চাষ করলে বছরে অন্তত পক্ষে দুটো ফসল তোলা যাবে। তাহলে বছরে আসছে এক লাখ বিশ হাজার। খরচ ধরা যাক বিশ হাজার। বছরে লাভ দাঁড়াচ্ছে এক লাখ অর্থাৎ মাসে আট হাজার! আর কি চাই? বাহু।

ভবিষ্যতের সমস্ত সমস্যা সমাধান করে ফেলে খুশি হয়ে উঠল রানার মন। হিসেবের কাগজটা ফস করে ছিড়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল ওয়েস্ট পেনার বাস্কেটে। কেউ দেখে ফেললে লজ্জায় পড়ে যাবে। এবার হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল টেবিলের বা ধারে বাটালি হিলের সমান উঁচু হয়ে থাকা ফাইলের ঢিবির দিকে। মুহূর্তে উবে গেল সমস্ত উৎসাহ। অসহায় দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে চাইল সে রমনা রেস কোর্সের আবছা হয়ে আসা শিব মন্দিরটার দিকে।

হঠাৎ খেমে গেল পাশের ঘরে টাইপ রাইটার। সোজা হয়ে বসল রানা নিজের চেয়ারে। মিনিট খানেক কোন শব্দ নেই। তারপর ঠুং-ঠাং একটা পরিচিত শব্দ কানে আসতেই খুশি হয়ে হেলান দিয়ে বসল রানা আবার। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই হাতে দুটো কফির কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল রেহানা।

‘খ্যাঙ্ক ইউ, রেহানা।’

‘রাখো তোমার খ্যাঙ্ক ইউ। আমার ছুটির কি হলো? রিপোর্ট তো শেষ—এবার এক মাসের ছুটি আমাকে দিতেই হবে।’

‘ইম্পসিবল্। ওসব ধানাই-পানাই ছেড়ে দাও, খুকি। ছুটি-ফুটি হবে না। অন্য কথা থাকলে বলতে পারো।’

নীরবে কফির কাপে ময় হয়ে রইল ওরা কিছুক্ষণ। অনেক উসখুস করেও প্রশ্নটা করতে পারল না রেহানা। মদু হাসল রানা। কফি শেষ করে ফাইল টেনে নিল একটা। তারপর বলল, ‘না, এখনও কোন খবর পাওয়া যায়নি জাহেদের। আর কিছু জিজ্ঞেস করবে?’

‘যাহ। ওর কথা কে জিজ্ঞেস করতে গেছে?’ বলল রেহানা ডয়ানক লজ্জা পেয়ে। ‘আমি...আমি ভাবছিলাম সেই দুর্ধর্ষ দস্যু ইয়াকুবের কথা। রিপোর্টের শেষে গোপস্বরের ফণার মত একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন মনের মধ্যে উদয় হয়। লোকটা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিল, রানা; তোমাকে এম. ডি. রক্তমে নিয়ে গিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কেন?’

‘ওটাই একটা মশু বড় রহস্য, রেহানা।’ খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, ‘ঠিকই ধরেছ তুমি। আমার মৃত্যু সে চায়নি। এই প্রশ্নটা নিয়ে আমিও বহুবার চিন্তা করেছি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। অজুত মানুষের মন! কখন যে কাকে ভাল লেগে যায় বলা মুশকিল। অত নিষ্ঠুর একজন দস্যুর

মধ্যেও দেখো, কি সুন্দর একটা দুর্বলতা। কোন কারণ নেই, কিছু না, শত্রুপক্ষের লোক জেনেও সৌহ জন্মে গেল। কি করবে সে এখন? পরিষ্কার করে বলতে পারছে না সব কথা, কিন্তু অনেক ভাবে চেষ্টা করেছে সে আমাকে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। দেখো, মরে ভূত হয়ে গেছে লোকটা—কিন্তু আশ্চর্য, প্রায়ই মনে পড়ে আমার ওর সেই অনুরোধপূর্ণ দৃষ্টিটা। লোকটা একসময় বেঁচে ছিল, ওর হৃদয়ে একটা পবিত্র দুর্বলতা ছিল আরেকজনের জন্যে, কেবল এইটুকুর জন্যেই চিরকাল বেঁচে থাকবে ও আমার মধ্যে। সৌহ, ভালবাসা কী অদ্ভুত জিনিস, তাই না?’

জবাব দিল না রেহানা। চুপচাপ উপলব্ধি করল সে রানার সুন্দর মনটাকে। কতখানি সত্যতা থাকলে এত গভীর একটা কথাকে এত সহজ করে বলা যায়, বুঝল সে মনে মনে। এতদিন ধাক্কা করেছে সে এই লোকটাকে—আজ বুঝল, প্রেমে পড়া যায় না, কিন্তু নিশ্চিন্তে ভালবাসা যায় একে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে অদ্ভুত এক সহানুভূতি আছে এর হৃদয়ের গভীরে। শত্রুকে শত্রু জেনে নির্মমভাবে দমন করেছে—কিন্তু তার ভিতরের মানুষটার প্রতি ধাক্কা হারায়নি সে জয়ের দপ্তে।

এমনি সময় চীক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইন্টারকমের মাধ্যমে। খনখনে ধাতব কণ্ঠস্বর।

‘একটু ওপরে আসতে পারবে, রানা?’

‘তোমার কাছে, না বুড়ো মিঞার কাছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘বুড়ো মিঞা।’

‘ব্যাপার কি?’

‘বোঝা যাচ্ছে না। তেমন কিছু জরুরী বলেও মনে হলো না। শুধু আমাকে রিং করে বললেন, তুমি যদি এখনও বেরিয়ে না গিয়ে থাকো তাহলে যেন ওর সাথে দেখা করতে বলি।’

‘ঠিক আছে। যাচ্ছি।’

উঠে দাঁড়ান রানা। ঘড়ির দিকে চাইল। পৌনে ছ’টা। রেহানাকে ছুটি দিয়ে তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে সাততলায়। কার্পেট বিছানো লম্বা করিডর দিয়ে এসে দাঁড়ান মেজর জেনারেল রাহাত খানের কামরার সামনে। ছলং করে উঠল ওর বুকের ভিতর এক ঝলক রক্ত।

দুই

রানা যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল, মেজর জেনারেল রাহাত খান তখন পুরু কাঁচ-ঢাকা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারটায় বসে পাইপ ধরাচ্ছেন। জুলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে একটা চেয়ারের দিকে আবছা ইঙ্গিত করলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল রানা চেয়ারটায়। ধূমকুণ্ডলীর

ফাঁক দিয়ে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলেন তিনি রানার মুখ, তারপর ম্যাচ বাস্কেট টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলেন।

‘অনেকদিন পর দেখা, তাই না?’ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

অবাক হয়ে চট করে চাইল রানা ওঁর চোখের দিকে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, ‘জী, স্যার।’

এ কেমন ধারা প্রশ্ন? এমন তো কখনও হয় না! জীবনে এই প্রথম বৃদ্ধের মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনে রানা। মুখ দিয়ে একটি বাড়তি শব্দ বের করা ওঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

‘কেমন আছ? ইস্তাখুল থেকে ফিরে থরো মেডিকেল চেকআপ করিয়েছিলে তো?’

‘জী, স্যার। এক-সেকশন ওকে বলে সারটিফাই করেছে।’

এবার আবার অবাক হয়ে গেল রানা। আবার একবার ঘুরে এল ওঁর দৃষ্টিটা বৃদ্ধের মুখের ওপর থেকে। স্তম্ভিত প্রশ্ন অপছন্দ করেন রাহাত খান। ব্যাপার কি? কিছুই তো পরিবর্তন হয়নি। তেমনি সপ্রতিভ অভিজ্ঞাত চেহারা, তেমনি ধবধবে স্ফূদা স্ফিজিশিয়ান কটনের স্ট্রিক-কলার শার্ট, দামী ট্রপিকালের সুট, ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা টাই। ছিমছাম, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। শুধু চুরুটের বদলে এখন টানছেন পাইপ। এ-ও এমন কিছু পরিবর্তন নয়—মাঝে মাঝেই তিনি পুরানো অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন কিছু মধ্য বৈচিত্র্য খোঁজেন। কোন একটা অভ্যাসের দাস হয়ে থাকতে অপমানিত বোধ করেন তিনি। এসব বহুবার দেখেছে রানা। আগামী দু’বছরের মধ্যে যে তিনি আর চুরুট খাবেন না এটাও ওঁর জ্ঞানা আছে। তাহলে? এমন সব উদ্ভট কথা বলছেন কেন তিনি?

‘বেশ। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে এবার। কিন্তু নিজে থেকে ঢেকে রাখতে পারেনি। তোমার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে সবার কাছে। এরকম হলে ভবিষ্যতে অপারেশনের কাজে তোমাকে ব্যবহার করাই মুশকিল হয়ে পড়বে।’ রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, পাইপের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলে চললেন রাহাত খান, ‘চারদিক থেকে মেসেজ আসছে, প্রশংসা-বাণী আসছে—কেউ কেউ আবার অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইছে। জানি, এতে তোমার কোনও হাত ছিল না, কিন্তু ভেবে দেখ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এতে কতখানি ক্ষতি হলো।’

‘সরি, স্যার!’

‘সরির কিছু নেই।’ বাম চোখের পাতা চুলকালেন বৃদ্ধ অনামিকা দিয়ে। ‘করবার কিছুই ছিল না তোমার। সমস্ত ব্যাপারটা ভুলভুল হয়ে গেল শেষের দিকে—এমন জগাখিচুড়ী পাকিয়ে গেল, প্রত্যেকটি লোক এমন সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত হয়ে পড়ল যে সেই অবস্থায় আত্মগোপন করা যায়ও না।’

পাইপটা দাঁতে চেপে অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা মৃদু টান দিয়েই বুঝলেন রাহাত খান যে নিতে গেছে ওটা। ম্যাচটা তুলে নিয়ে পরপর দুটো কাঠি ছেলে পাইপের পিছনে বেশ খানিকটা সময় নষ্ট করলেন তিনি। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে চুপচাপ টানলেন ময় চিস্তে। খোলা জানালা দিয়ে শব্দ পাওয়া গেল সামনের

রাস্তা দিয়ে একটা ট্রাক চলে যাবার। বাঁকা পাইপটা হাতে নিয়ে ওটার মুখ থেকে বেরোনো পাতলা একফালি নীলচে সাদা ধোয়ার দিকে চেয়ে রইলেন রাহাত খান।

হঠাৎ রানা বুঝতে পারল কিছু একটা ব্যাপারে বিব্রত বোধ করছেন মেজর জেনারেল। ঠিক কেমন ভাবে কথাটা পাড়বেন বুঝতে পারছেন না তিনি। সাহায্য করতে ইচ্ছে করল রানার, কিন্তু কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলবে ভেবে চূপ হয়ে গেল। একটু নড়েচড়ে আয়েস করে বসল চেয়ারে, তারপর অন্যমনস্কতার ভান করে নখ খুঁটতে থাকল অলস ভঙ্গিতে।

পাইপ থেকে চোখ তুলে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন রাহাত খান।

‘বিশেষ কোম কাজ আছে তোমার আজ সন্ধ্যায়, রানা?’

‘না তো, তেমন কিছুই কাজ নেই। কোন দরকার আছে নাকি, স্যার?’

‘দরকার মানে, না—হ্যাঁ,’ নিজের অস্বস্তির জন্যে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন রাহাত খান। জুকুটি করে চাইলেন রানার দিকে, যেন রানারই দোষ। ‘তবে ব্যাপারটা আমাদের কাজ সংক্রান্ত কিছু নয়। অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপারের মত। ভাবছিলাম, তুমি হয়তো সাহায্য করতে পারতে।’

‘নিচয়ই পারব, স্যার,’ বলল রানা। খুশি হয়ে উঠল সে এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটল বলে। এইবার বলে ফেলবে বুড়ো মিঞা গড়গড় করে। খুব সম্ভব কোন নিকট আত্মীয় বিপদে পড়েছে। আই. বি.-র কাছে সাহায্য চাইলেই খুশি হয়ে সাহায্য করত ওরা—হয়তো উনি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে চান না। ব্লাকমেইল খুব সম্ভব। কিংবা শ্বাগনিং-ও হতে পারে। মেজর জেনারেল রাহাত খান যে ওর কাছেই সাহায্য চাইবেন বলে স্থির করেছেন সেজন্যে ধন্য হয়ে গেল রানা। ভিতর ভিতর গর্ব অনুভব করল সে। ওর সাধ্যমতো ও করবে। ব্যক্তিগত কাজে রানাকে ব্যবহার করতে এই নির্ভাবান বুড়ের যে কি পরিমাণ খারাপ লাগছে বুঝতে পারল সে অনায়াসে। ওর কাছে ব্যক্তিগত ব্যাপারে রানার সাহায্য নেয়া আর অফিসের টাকা খরচ করে ফেলা প্রায় সমান অপরাধ।

‘খুব বেশি সময় নষ্ট হবে না তোমার। বড় জোর ঘণ্টা তিনেক।’ একটু থেমে সোজাসুজি চাইলেন তিনি রানার চোখের দিকে। ‘শিল্পপতি গোলাম হারুদারের নাম শুনেছ নিচয়ই।’

‘নিচয়ই, স্যার,’ বলল রানা বিন্দ্বিত কণ্ঠে। হঠাৎ এই নামটা উচ্চারণ করবেন বুদ্ধ ভাবতেও পারেনি সে। ‘কে না শুনেছে ওঁর নাম? যে কোন দৈনিক পত্রিকা খুললেই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে ওঁর সম্বন্ধে। দৈনিক অবজারভার তো প্রতি রোববার ধারাবাহিকভাবে জীবনী ছাপছে ওঁর। আশ্চর্য সব ঘটনা! এত অল্প বয়সে মানুষ...’

‘জানি,’ থামিয়ে দিলেন রানাকে রাহাত খান। নিভে যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে নিলেন আবার। চূপচাপ পনেরো সেকেন্ড চেয়ে রইলেন পশ্চিম আকাশে গোধূলির রঙের দিকে। তারপর বললেন, ‘তবু, বমো দেখি ওর

সম্মুখে যা জানো। তোমার ধারণার সঙ্গে আমারটা মিলিয়ে দেখতে চাই আমি।

মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হলো রানা। অসংলগ্ন কথা সহ্য করতে পারেন না রাহাত খান। প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার এবং যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।

‘ন্যাশনাল হিরো’ ভদ্রলোক এ-দেশের। জনসাধারণের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন তিনি নিজ মহত্বে। মেজর আজীজ ভাট্টি বা স্কোয়াড্রন লীডার আলমের মতই। সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ই প্রথম পরিচয় ঘটল জনসাধারণের এর সঙ্গে। যুদ্ধ তহবিলে দু’কোটি টাকা দান দিয়ে শুরু হলো। তারপর একের পর এক হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন তিনি। জনসাধারণের ধ্যান-ধারণায় তিনি প্রেরিত মানব না হলেও একজন অতি-মানব। গত বছরই খেতাব পেলেন তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। দেশের জন্যে দেশের জন্যে তাঁর যে বিপুল দান, যে কঠোর परिश्रम, যে অসীম সহানুভূতি তাতে আগামী নির্বাচনে দাঁড়ালে যাচ্ছেতাই একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। রানা লক্ষ করল ক্ষীণ একটা বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা মুটে উঠেই মিলিয়ে গেল রাহাত খানের ঠোঁটে। ‘যাই বলেন, স্যার, এত কম বয়সে এত সুনাম অর্জন করা সহজ কথা নয়। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে উনি কেবল দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি হিসেবেই নয়, দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মানিত নাগরিক হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে।’

শুধু হাসি হাসলেন রাহাত খান। ‘তুমি দেখছি লোকটার গুণ-কীর্তনই করে চলেছ পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধির শিল্পী-পরিচিতির মত। অসাধারণ লোক তাতে সন্দেহ নেই। তথ্য কি জানো ওর সম্বন্ধে তাই বলা। আমি তো সরকারী সূত্র থেকে তেমন কোন তথ্য বের করতে পারলাম না। ওর নামে কোন ফাইল নেই, পুলিশ বা আই. বি. রিপোর্ট নেই—এটুকুই জ্ঞানতে পেরেছি কেবল।’

এবার সত্যিই অবাক হলো রানা। এই লোকটার সম্পর্কে এই ধরনের স্বোচ্চ-খবর কেন করছেন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান? সত্যিই তো! এই লোকটার সম্বন্ধে সত্যিকার তথ্য কয়টা জানে দেশের লোক? খানিকক্ষণ চুপচাপ থোলা জানালা দিয়ে কালচে হয়ে আসা আকাশের দিকে চেয়ে রইল রানা। দূরে অনেকগুলো চিল একজায়গায় উড়ে বেড়াচ্ছে ঘুরে ঘুরে—বোধহয় একঝাঁক পোকা নতুন পাখা গজাবার আনন্দে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে উড়াল দিয়েছে অসীমের পানে, তাই খাচ্ছে ধরে ধরে। আধার হয়ে আসছে চারদিক; কিন্তু কোনদিকে দৃকপাত নেই, ব্যস্তসমস্ত হয়ে টপাটপ গিলে চলেছে ওরা যে যত পারে।

‘খুব অল্পদিনে বড়লোক হয়েছেন ভদ্রলোক, তাতে সন্দেহ নেই,’ বলল রানা, ‘কিন্তু এ রকম হঠাৎ বড়লোক তো আরও অনেকেই আছে, স্যার। এদের অনেকের অতীতই আমরা জানি না। হয়তো পুলিশ বা আই. বি.-র ফাইলেও কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু ওর ব্যাপারেই কেন এ কথা জিজ্ঞেস

করছেন, স্যার?’

‘কি কি ব্যবসা আছে ভুল্ললোকের তা জানো?’ প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন বৃদ্ধ আরেকটা প্রশ্ন করে।

‘খুলনায় জুটমিল, চিটাগাং-এ কোটি কোটি টাকার ফার্টলাইজার ফ্যাক্টরী, টঙ্গীতে সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি, তেজগায়ে হায়দার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, করাচিতে কটন মিল, জাপানী কয়েকটা গাড়ির এজেন্সী, এ ছাড়াও কয়েকটা মস্ত বড় বড় হোটেল, আরও কত কি!’

‘কয়দিনে হয়েছে এ সবকিছু?’

‘তিন বছরে।’

‘অনেক টাকা লোকটার, তাই না?’

‘কোটি কোটি।’

‘সেই জন্যেই তো আশ্চর্য হয়েছে।’ কথাটা শেষ না করে কিছুক্ষণ এক মনে পাইপ টানলেন রাহাত খান। তারপর আবার সোজাসুজি চাইলেন রানার চোখের দিকে। ‘হ্যাঁ। রূপকথার মত কাহিনী, অসাধারণ একজন মানুষ, সব সত্য। শুধু একটা জিনিস...’ তন্দ্রায়ভাবে মাথার পিছন দিকটা চুলকালেন বৃদ্ধ।

‘কি জিনিস, স্যার?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘ক্লাবে গোলাম হায়দার তাস খেলার সময় জোড়ুরি করে।’

তিন

‘জোড়ুরি করে!’ চমকে উঠল রানা।

‘হ্যাঁ। চুরি করে সে তাস খেলতে গিয়ে। রমনা ক্লাবের সেক্রেটারিরও এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না সে। কোটিপতি একজন লোক স্টেকে ব্রিজ খেলতে গিয়ে চুরি করে, ভাবতে অবাক লাগছে না তোমার?’

‘না, স্যার।’ সামলে নিয়েছে রানা। ‘তুনেছি অনেক কোটিপতি পেশেল খেলতে গিয়েও নিজেকে ঠকায়।’ হাসল ও।

‘তোমার কাছে এটা হাসির ব্যাপার হলেও আসলে গোলাম হায়দারের এই সামান্য বড়লোকী খেলার জন্যে অনেক লোকের সর্বনাশ হয়ে গেছে, ইতিমধ্যেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন করে? রমনা ক্লাবের ব্যাপার তো জানোই। বিরাট বিরাট সব লোকের সমাবেশ ওখানে—দেশের মাথা একেকজন। সেই ক্লাবে বসে জোড়ুরি করার মধ্যে হাসির কিছুই নেই। ধরা পড়লে যত বড় ন্যাশনাল হিরোই হোক না কেন, ধূলিসাৎ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে। পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়বে খবর, মুখে চুনকালি মেখে বিদায় করে দেয়া হবে তাকে সমাজ থেকে। এটা কত বড় একটা রিস্ক চিন্তা করতে পারো?’

‘তাই তো!’ বলল রানা নির্জীব কণ্ঠে।

‘ব্যাপারটা ভেঙেই বলছি। আজ সকাল বেলা আমার বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিল আমার এক পুরানো বন্ধু ব্রিগেডিয়ার ইকতিখার। বেচারী বছর কয়েক হয় রিটারায় করেছে। আমারই বৃত্তিতে আজ ক’দিন হলো পেনশনের সব টাকা একসাথে তুলে নিয়েছে সে ব্যবসা করবে বলে। প্রায়ই যায়, গতকাল সন্ধ্যায়ও রমনা ক্লাবে গিয়ে বসেছিল সে। পরিচয় ছিল গোলাম হায়দারের সঙ্গে, অনুবোধ উপেক্ষা করতে না পেরে হাই স্টেজে বসেছিল। ব্রিগেডে ব্রিগেডে। ঠোকের মাধ্যমে পেনশনের সব টাকা তো গেছেই, ব্যাঙ্কে জমানো বত্রিশ হাজার টাকাও গেছে। এখন নিঃস্ব পথের ভিখারী সে।’

‘মোট কত টাকা, স্যার?’

‘নব্বুই হাজার।’

চুপচুপ শব্দ করল রানা জিত দিয়ে। এইবার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল সে। কেন ওকে ডেকে এনে এত কথা বলছেন রাহাত খান, তা-ও আন্দাজ করতে পারল। খুঁটিয়ে পোড়া ছাই বের করে অ্যাশট্রেতে ফেলে ধী নানস্-এর কৌটো থেকে আবার পাইপে টোবাকো ভরলেন রাহাত খান। সেটা না ধরিয়েই কথার খেই ধরলেন আবার।

‘ক্লাবের চেয়ারম্যান যেমান আমার পরিচিত। ওকে ফোন করে সব ব্যাপার বলতেই ওর বহুদিনের চেপে রাখা সন্দেহের কথা বলল। ধরতে পারেনি কখনও, কিন্তু ওর স্থির বিশ্বাস চুরি করে গোলাম হায়দার ব্রিজ খেলায়। স্ক্যাডালের ভয়ে চুপ করে আছে সে, কাউকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। আমার সাহায্য চেয়ে বসল সে এই ব্যাপারে। রাজি হয়েছি আমি।’ পাইপটা এবার ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান। ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। একটা সুইচ টিপে দিতেই চোখ ধাঁধানো চারটে উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল ঘরের চারকোণে। ‘আমি শুনেছি তাস খেলায় তোমার জুড়ি নেই। তুমি হয়তো ধরতে পারবে কিভাবে চুরি করে ও, পারবে না?’

‘ওর খেলা না দেখলে বলা যায় না, স্যার। হাজারো রকম চুরি আছে। কিংবা হয়তো অস্বাভাবিক কপাল গুণও হতে পারে। দেখলেই বুঝতে পারব।’

‘বেশ। আজও গোলাম হায়দার ঢাকায় আছে। কাল চলে যাবে চিটাগাং। ঢাকায় থাকলে ক্লাবে সে আসবেই। ক্লাবে এলেই বিজ্ঞ খেলবে। পারবে তুমি সাড়ে আটটার দিকে একবার ক্লাবে আসতে? অসুবিধা নেই তো কোন?’

‘কিছু অসুবিধে নেই, স্যার। আমি ঠিক সাড়ে আটটার দিকে পৌঁছে যাব। আপনি থাকবেন নাকি, স্যার?’

‘না, আমার একটা ডিনার আছে ইন্টারকন্টিনেন্টালে। ব্রিগেডিয়ার ইকতিখার থাকবে পেটের কাছে, কোন অসুবিধে হবে না তোমার।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা, স্যার, যদি দেখি গোলাম হায়দার সত্যিই চুরি করছে তাহলে কি করব? আমি যে বুঝে ফেলেছি কেবল সেই কথাটা জানিয়ে দিয়েই কান্ত হব, না আরও কিছু করতে হবে?’

‘আমি দশটার দিকে পৌঁছে যাব ক্রাবে। কি করতে হবে তা আমি ওখানেই বলব তোমাকে। তুমি আগে গিয়ে সব দেখে তনে বুঝে রাখবে। আচ্ছা?’

‘জী, স্যার।’

‘আর ভাল কথা, সাপারটা ক্রাবেই খেয়ে নিও। বিল আমি পে করব।’

হেসে ফেসল রানা। বলল, ‘আচ্ছা, স্যার।’

বেরিয়ে এল সে রাহাত খানের এয়ার-কুলড কামরা থেকে। আন্তে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা। নিচ্চিস্ত মনে শিস্ দিতে দিতে সিড়ি বেয়ে নেমে এল নিচতলায়।

বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গেল রানার লরেল গ্রীন মেটালিক কালারের করোনা সিডান প্রকাণ্ড বাড়িটার প্রশস্ত গেট দিয়ে।

চার

হেঁটে বেড়াচ্ছে রাভার মা!

সামনের লনে মানীর কাজের তদারকি করছে সে। অবাক হয়ে এগিয়ে গেল রানা।

‘ব্যাপার কি, রাভার মা? চাক্রা হয়ে উঠেছে দেখছি?’

দস্তহীন মিষ্টি হাসল রাভার মা। গত কয়েক মাস যাক সাপ্তাহিক বাতে ভুগছিল সে—মাঝে হাসপাতালে ছিল দেড় মাস। নড়াচড়ার ক্ষমতা ছিল না। নানান রকম চিকিৎসায় কোন ফল হয়নি। অনেক বড় বড় ডাক্তার ফেল পড়ে গেছে। রিমোটয়েড আরথ্রাইটিস্। গত পরও দিন রানার এক বন্ধু আর্মির এজ-সার্ভিসম্যান খোন্দকার ইলিয়াস দেওয়ানের মুখে এই রোগটার নাম তনেই চমকে উঠেছিল রানা। ওঁরও নাকি হয়েছিল। বহুদিন পড়ে ছিলেন করাচি হাসপাতালে। ইনভ্যালিড হিসেবে রিটায়ার করেছেন। এমনি সময় পাকিস্তানে এলেন রানী এলিজাবেথ, সঙ্গে এলেন ওঁর নিজস্ব ফিজিশিয়ান একজন। জুরিখের ডাক্তার—নাম মনে নেই, পা বোঁড়া, ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে চলাকেরা করেন। সেই ডাক্তার এসেছিলেন হাসপাতাল পরিদর্শন করতে। দেওয়ান সাহেবকে দেখেই মৃদু হেসে সাধারণ একটা ওষুধ প্রেসক্রাইব করে গিয়েছেন। বলে গিয়েছিলেন প্রথম দু’দিন দিনে চারটে বড়ি, তারপর দু’দিন তিনটে করে, তারপর একহুতা একটা করে—আর বাকি জীবন চার ভাগের একভাগ করে খেতে হবে। আশ্চর্য ধনুতরি সে ওষুধ। দু’দিন পরই বাড়ি চলে এসেছিলেন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে।

‘কি ওষুধ?’ জিজ্ঞেস করেছিল রানা।

‘প্রিডনিকট, তিরিশটা ট্যাবলেট থাকে কাইন্ড মিলিথামের। দাম চার টাকা। সাধারণত হাঁপানি জাতীয় রোগে এই ওষুধটা দেয় ডাক্তারেরা। কিন্তু

এটা বাতেরও সাম্ভাবিতিক ওষুধ। প্রথম দিকে প্রস্রাব হয় খুব। কিন্তু জীবনে আর কাছে ঘেঁষতে পারে না বাত।

সেইদিনই এক ফাইল কিনে এনে প্রয়োগ করেছিল রানা রাঙার মার ওপর। গতকাল সন্ধ্যায়ও শয্যাশায়ী দেখেছে সে বৃদ্ধাকে, আর আজ দিবা বাগান তদারক করে বেড়াচ্ছে।

‘একটুও বাধা নাই, আন্না। আগে এ ওষুধ পালি আর এতটাকা নষ্ট হতো না চিকিৎসের পিছনে। আন্নাই তো মস্তবড় ডাক্তার দেখতে পাচ্ছি, নন্না নন্না পাস দিয়ে ডাক্তারগুলো চিত্তির হয়ে গেল...’

কথার শেষ না শুনেই দ্রুতপায়ে নিজের কামরায় ঢুকল রানা। জানালার ভারি পর্দাগুলো টেনে দিয়ে কাপড় ছেড়ে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে ঢুকে পড়ল অ্যাটাচড বাথরুমে। তার আগে চালু করে দিল নতুন বসানো এয়ারকুলারটা।

দশ মিনিট শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে দেহটা জুড়িয়ে গেল রানার। গা মুছে চুলগুলো বাশ করে নিয়ে চলে এল সে বেডরুমে। ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে ঘরটা। একটা টিলা শার্ট আর পাজামা পরে বুক-শেল্ফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। এডমন্ড রিফের ‘কার্ড চীটিং’ বইটা বের করে নিয়ে রাইটিং টেবিলে গিয়ে বসল। ড্রয়ার থেকে বের করল নতুন এক প্যাকেট তাস। কয়েক রকম শাকলি এক কার্ড বাঁটা প্র্যাকটিস করল সে বিশ মিনিট। কয়েকটা চ্যান্টারে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল একবার। কফির জন্যে বৈশ্ব বাজিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। ভাববার চেষ্টা করল রিফের কয়েকটা কালবার্টসন কমবিনেশনের কথা। যেখানে যেখানে সন্দেহ হলো পাতা উল্টে দেখে নিল বইটা। কফি নিয়ে ঢুকল মোখলেস।

‘কিরে, রাঙার মা সেরে গেছে মনে হচ্ছে? এবার তোর কাজের চাপ একটু কমবে।’

‘বাড়বে, স্যার। ওর ফাই-ফরমাশ খাটতে খাটতে জ্ঞান বেরিয়ে যায়, চোন্দ্রার করে বাজারে পাঠায়। কথা না শুনলে কান ঝালাপালা করে দেয়। বয়স যত বাড়ছে কথা বাড়ছে তার ডবল।’

‘কই, আমি তো তেমন কিছু শুনতে পাই না?’

‘আপনি যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ওর কলজেটা ঠাণ্ডা থাকে। একটা রা নেই মুখে—আদর করে ডেকে আমাকে এটা ওটা খাওয়ায়। যেই বেরিয়ে গেলেন অমনি ডিগ্রী চড়তে থাকল মেজাজের। আপনি যত দেরি করবেন, ততই ঝেঁপে যাবে ও আমার ওপর। আর পারা যায় না, স্যার। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আমার।’

‘তবে যে শুনলাম সেবার ওকে যশোরের ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে কান্দছিল তুই?’

‘যখন আদর করে তখন সব তুলে যাই, স্যার,’ লজ্জিত কণ্ঠে কথাটা বললই তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল মোখলেস। স্যারের কাছে আরও কি দুর্বলতা বেরিয়ে পড়বে কে জানে!

মুদু হেসে কফিতে চুমুক দিল রানা। টের গেল, রাঙার মায়ের হাতের

কক্ষি। নিম্নের রাজ্যতু আজই দখল করে নিয়েছে রাজ্যের মা, এরই জন্যে মোখলেসের এত অসন্তোষ। দিনরাত ঝগড়া লেগে আছে ওদের মধ্যে। অথচ এই রাজ্যের মা-ই যখন হাসপাতালে ছিল তখন সকাল-বিকেল ওখানে মোখলেসের ধরনা দিয়ে পড়ে থাকা দেখলে কে বলবে ওরা আপন মা-বেটা নয়?

কফিটুকু শেষ করে বিছানার ওপর শ্বাসনে শুয়ে পড়ল রানা। এক এক করে পা, হাত, মুখ, গাল, কপাল ঢিল করে চোখ বন্ধ করল। শরীরের কোথাও কোন স্নায়ু বা পেশীতে চাপ বা টান পড়ছে না আর। এবার মাথার মধ্যে থেকে একে একে সমস্ত চিন্তা আর উদ্বেগ দূর করে দিল সে। বিশ্রাম। চুপচাপ মড়ার মত পড়ে রইল সে পাঁচ মিনিট। তারপর যখন উঠে বসল তখন রানার শরীরে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। সম্পূর্ণ সতেজ, সজীব ওর দেহ-মন।

ঘীরে সুস্থে হালকা ছাই রঙের ট্রপিকালের স্যুটটা পরে নিল রানা। কালো সিল্কের টাই বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় দুটো সাদা সিল্কের রুমাল বের করে দলা পাকিয়ে ভাঁজ ভেঙে কোটের দুই সাইড-পকেটে রাখল সে একটা করে। শোল্ডার হোলস্টারে লুকানো পিস্তলটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে কিনা একবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত মনে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। চমৎকার সন্ধ্যা কাটবে আজ রমনা ক্লাবে।

সারাদিনের গরমের পর মিষ্টি একটা হাওয়া বইছে সন্দের পর থেকে। উল্টোপাল্টা মাতাল হাওয়া। আজ চৈত্রের শেষ। রমনা পার্কের পাশের চণ্ডা সড়ক দিয়ে যেতে যেতে রানার কাছে অল্পত সুন্দর লাগল পৃথিবীটা।

রমনা ক্লাবের গেটের কাছেই পায়চারি করতে দেখা গেল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। পাতলা, লম্বা, পিঠটা একটু কুঁজো। ডুফু জোড়া কুঁচকে থাকায় কপালে ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। দৃষ্টিভ্রম ভাঁজ।

‘বিগেডিয়ার ইকুতিখার?’ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা সম্মের সঙ্গে।

‘ইয়েস! হু দা হেল ইউ আর?’ কটমট করে চাইলেন বিগেডিয়ার রানার দিকে।

বাবা! রানা ভাবল, কি গভীর আর কর্কশ কণ্ঠস্বর! চেহারার দিকে চেয়ে না থাকলে বিশ্বাসই করা যায় না এই চিকন লোকটার মধ্যে থেকে এত মোটা আওয়াজ বেরোতে পারে।

‘মেক্সর জেনারেল রাহাত খান পাঠিয়েছেন আমাকে,’ বলল রানা বিনয়ের সঙ্গে, ‘আমার নাম মাসুদ রানা।’

মুহূর্তে কেঁচো হয়ে গেলেন বিগেডিয়ার। ‘সরি, মাই বয়, আমি দুঃখিত। বজ্রা টেনশনের মধ্যে আছি, ভাই, কিছু মনে করো না। আমিও তো তারই জন্যে অপেক্ষা করছি।’

‘উনি বিশেষ কাজে আটকে গেছেন, আসতে দেরি হবে, তাই আমাকে পরিচয় করে নিতে বলেছেন আপনার সঙ্গে। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।’

‘ভেতরে গিয়ে আর কি হবে? তুমি জানো না, সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার ওর ভেতরে ঢুকে। সর্বস্ব খুইয়েছি। আত্মহত্যাটা করতে পারছি না কেবল মেজ্বর জেনারেলের অনুরোধে। তা তুমি এসেছ, ভাল কথা—কিন্তু তোমাকে দিয়ে আমার কি হবে? এত করে বললাম, যা গেছে, সে তো আর ফিরবার নয়, শুধু শুধু……’

‘আগে ভেতরে চলুন, তারপর আলাপ করা যাবে। এসে গেছেন গোলাম হায়দার সাহেব?’

‘না। ও ন’টার আগে আসে না।’

‘ততক্ষণে আমরা সাপারটা সেরে নিই, চলুন। বিলটা মেজ্বর জেনারেল পে করবেন বলেছেন।’

অভিজ্ঞাত রমনা ক্রাবের মোজাইক টাইল বসানো চকচকে মেঝের উপর দিয়ে এগিয়ে পেল ওরা ডাইনিং রুমের দিকে। নানান রকমের ডান মফদ খেলার ব্যবস্থা আছে ক্রাবটায়। একদিকে স্কোয়াশ, টেবিল টেনিস; একদিকে দাবা, ক্র্যাকল, ক্যারাম, আর এক কোণের ওই মস্ত ঘরটায় তাস। বিজ্ঞ আর পোকার ছাড়া অন্য কোন রকম তাসের জুয়া এখানে চলে না—কিন্তু এত উঁচু স্টেপে বিজ্ঞ-পোকার সারা দেশে আর কোথাও খেলা হয় কিনা সন্দেহ। আরও অনেক রকমের খেলার ব্যবস্থা আছে, টেনিস, গল্ফ, সুইমিং। সুইমিং পুলের অভিজ্ঞাত শয়তানির পর বিলাসের জন্যে আছে রেস্টরুম আর ‘বার’। ক্লি নেই? বিদেশী কায়দার অর্কেস্ট্রা, বল, টুইস্ট, সব আছে। সব কিছুতেই একটা অভিজ্ঞাতের প্রলেপ মাখানো।

ইউনিফর্ম পরা ধোপ-দুর্গুণ্ড বয়, বেয়ারা, পেজ, রিসেপশনিস্ট, গেট-কীপার, পোর্টার—কোথাও পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই।

ডাইনিং রুমে বসে মেনুর দিকে চেয়েই মুড় পরিবর্তন হয়ে গেল ব্রিগেডিয়ারের। অকৃপণভাবে ফরমালেশ দিয়ে চললেন তিনি। মুরগীর রোস্ট, বিরিয়ানি, কাবাব, মাটন্ কোর্মা, মাটন্ রেফালা; কিন্তু সবচেয়ে আগে চাই চিকেন সুপ, আর সবশেষে কোন্ড পুডিং এবং কফি। রানা বুঝল, সেরেছে। বারোটা বেজেছে আজ রাহাত খানের। এক সাপারেই ধসিয়ে দেবে ব্রিগেডিয়ার। আত্মহত্যার আগে শেষ খাওয়া খেয়ে নিতে চাইছে নাকি লোকটা?

টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে দিতেই অমায়িক হাসি ফুটে উঠল ব্রিগেডিয়ারের মুখে। চোখ নাচিয়ে ইঙ্গিত করলেন তিনি রানাকে, তারপর বললেন, ‘নাও হে ইফম্যান, শুরু করে দাও। আলাপ-আলোচনা পরে হবে। এগুলো সামনে রেখে শুধু শুধু আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?’

কথা বলতে বলতেই ন্যাপকিনটা বিছিয়ে ফেললেন ব্রিগেডিয়ার উকুর উপর। তারপর প্রবল বিরূপে ঝাপিয়ে পড়লেন একখানা অস্ত্র মুরগীর রোস্টের বিরুদ্ধে। প্রচুর পরিমাণে খেলেন ব্রিগেডিয়ার, রানাকেও কখনও তাড়া দিয়ে, কখনও মিষ্টি কথা বলে, বকা-ঝকা করে বাধ্য করলেন খেতে। এত চকনো-পাতলা লোককে এত বেশি খেতে দেখেনি রানা আগে কখনও। পুডিং শেষ

করে দুই গ্রাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে প্রকাণ্ড একটা ঢেঁকুর তুললেন ব্রিগেডিয়ার, যেন সমুদ্র-যুদ্ধে পরাজিত করেছেন তিনি প্রকল কোন শত্রুকে, তারপর একখানা কিং স্টার্ক সিগারেট বের করে ধরালেন।

‘বুঝলে হে, আজই ধরেছি ব্র্যাডটা। একেবারে মন্দ নয় খেতে। দেখবে নাকি টেস্ট করে?’

‘না, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।’

‘আরে, লজ্জা কিসের? আমি ওসব মাইন্ড করি না। আমার সামনে খেতে পারো, ওসব বাজে প্রেজুডিস আমার নেই। কি নাম যেন বললে তোমার হে, ছোকরা?’

‘মাসুদ রানা।’ বাড়িয়ে ধরা প্যাকেট থেকে একটা বগা সিগারেট নিতে বাধ্য হলো রানা, কিন্তু ধরাল না।

‘তা “স্যার”। বলছ কেন আমাকে? আমি তো রিটায়ার করেছি। তাছাড়া টাকা-পয়সাও সব খুইয়ে বসে আছি। আমি তো পথের ভিখিরি, হে। আমাকে সম্মান দেখিয়ে লাভ কি? কোথাও কোন স্থান নেই আমার আর।’

রানা বৃদ্ধ, সারা জীবনের সঞ্চয় এভাবে যোকের বশে খুইয়ে ফেলে ভয়ঙ্কর অনুশোচনায় ভুগছেন ব্রিগেডিয়ার। প্রতিটা কথায় নিজেই যেন চাবুক মারছেন তিনি। কেমন যেন মায়া হলো রানার বেচারার প্রতি। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে ব্রিগেডিয়ারের চরিত্র। অত্যন্ত ভাল মানুষ, কিন্তু সংযম নেই। দিলটা বড়, কিন্তু সেই তুলনায় সামর্থ্য নেই।

‘এক্সকিউজ মি, আপনি কি মি. মাসুদ রানা আছেন?’ একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল গা ঘেঁষে। বাংলার উর্দুভাষী টান।

‘দ্যার্টস রাইট। আপনাকে তো চিন্লাম না?’

‘হামি এই ক্লাবের চেয়ারম্যান, রেমান আছি। আনিসুর রেমান। আভি আভি মেজ্বর জেনারেল রাঁহাত খান ফোনে হামাকে জানানইলেন, ব্রিগেডিয়ার ইফতিখারের সাধু যিনি সাপার খাচ্ছেন তাঁর নাম মেজ্বর মাসুদ রানা। যেন তাঁকে হামার তরফ থেকে পুরা অ্যাসিস্ট্যান্স, ইয়ানে, সহযোগিতা করা হোয়।’

‘কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সেটা জালা আছে আপনার?’

‘আলবাং! দোপুংহেরে কোথা হয়েছ হামার সাথে।’ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল চেয়ারম্যান রানার পাশে।

‘এসে গেছে মক্কেল?’

‘হাঁ।’

‘আপনি কি মনে করেন, উনি জোড়ুরি করেন?’

‘কসম খেতে পারব না। ও আপনি দেখলেই মানুম হয়ে যাবে। আসুন হামার সাধু, কাছু আন্দাজা লাগলে ইশারা কোরবেন। হামি স্যামঝে লিব। বাহার নিকনিয়ে বাতচিত হোবে। ঠিক হ্যায়?’

‘ঠিক হ্যায়, চলুন।’

ব্রিগেডিয়ারকে ডাইনিং রুমেই বসিয়ে রেখে চলে গেল রানা

চেয়ারম্যানের সাথে কার্ড-রুমের দিকে। দশটা ব্রিজ এবং ছয়টা পোকারের টেবিল সাজানো আছে ঘরটায়। বেশির ভাগ টেবিলই জমজমাট হয়ে গেছে সোয়া নটাতেই। আরও লোক আসবে। শেষ রাত পর্যন্ত চলবে খেলা। এয়ার-কুল্ড ঘরটা গমগম করছে টুকরো টুকরো কথা, বিশ্ময়ধ্বনি, আর থেকে থেকে দরাজ গলার অট্টহাসিতে।

প্রথমেই চোখ পড়ল রানার অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীর উপর। অম্লত দণ্ড ভঙ্গিতে বসে আছে সে তাস হাতে নিয়ে। কাজল-কালো আকর্ষণীয় দুটো চোখ—লম্বা ঘন পাপড়িগুলো উপর দিকে বাকানো। মনে হচ্ছে চেয়ে তো নেই, যেন স্বপ্ন দেখছে চোখ দুটো। কাটা চেহারা। মুখের আদল এবং গায়ের রং দেখে এদেশী মনে হলো না। তারই সামনে রান্নার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে কোটিপতি গোলাম হায়দার। পিছন থেকে প্রকাণ্ড একটা মাথাভর্তি এলোমেলো চুল ছাড়া কিছু দেখা গেল না গোলাম হায়দারের।

‘ওই ছোকরি হায়দারের পার্টনার। আগর দু’জন হামার লোক,’ বলল রোমান রানার কানে কানে।

‘ডাবল!’ চিৎকার করে উঠল গোলাম হায়দার। উদ্ধত, কর্কশ কণ্ঠস্বর।

‘এইবার বাগে পেয়েছি বাবা, গোলাম হায়দার! এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই— লাগাও রি-ডাবল। বলুন, মেমসাহেব?’ বলল গোলাম হায়দারের বামে বসা লোকটা। সি. অ্যান্ড বি-র ফাস্ট ক্লাস কন্ট্রাস্টের ভদ্রলোক।

‘নো বিড,’ বলল সুন্দরী কার্ড থেকে চোখ তুলে। হঠাৎ রানার ওপর ধমকে গেল ওর দু’টি।

‘নোপ,’ বলল কন্ট্রাস্টের পার্টনার।

‘আমারও নো বিড,’ বলল গোলাম হায়দার।

‘বেশ। ফাইভ হার্টস রি-ডাবল্ড। আপনার লিড, মেমসাহেব,’ বলল কন্ট্রাস্টের উৎসাহিত কণ্ঠে।

‘আই, স্কেলতে এসেছ, ভদ্রভাবে খেলো। খবরদার, “মেমসাহেব, মেমসাহেব” করে টিটকারি মারবে না বলে দিচ্ছি!’ হঠাৎ টেবিলে এক প্রচণ্ড চাপড় মেরে গর্জে উঠল গোলাম হায়দার।

হকচকিয়ে গিয়ে ঢোক গিলল কন্ট্রাস্টের, ‘বেশ, কি বলতে হবে শিখিয়ে দাও।’

‘মিস্ রুমানা বলবে।’

‘আচ্ছা আচ্ছা। দিন, ডিল দিন, মিস্ রুমানিয়া।’

ফিক্ করে হেসে ফেলল সুন্দরী। বলল, ‘আরেকবার বকা খেলৈ মিস কুলগেরিয়া বলে ডেকে ফেলবেন মনে হচ্ছে।’

মেয়েটির মুখে চমৎকার ঝরঝরে ইংরেজী শুনে একটু অবাক হলো রানা। লম্বা পা স্কেলে গোলাম হায়দারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। স্পেড আর ডায়মন্ডের টেকা আছে ওর হাতে। চটপট নিয়ে নিল সে দুটো দান। আবার স্পেড স্কেলতেই নিচের হাতের কিং দিয়ে ধরল কন্ট্রাস্টের দানটা।

‘এইবার!’ বলল সে পুলকিত কণ্ঠে। ‘কুইন নিয়ে মোট চারটে রঙের

কার্ড বাইরে। দেখো, গোলাম হায়দারের রানীকে ঘরের বার করি কি রকম। ভাল চাও তো দিয়ে দাও রানী, নইলে নয় টপেই দান নিয়ে নিচ্ছি।' হার্টসের নয় খেলল সে নিচের হাত থেকে।

তিন ফেলল গোলাম হায়দার।

দুই ফেলল কন্ট্রাস্টর।

কুইন দিয়ে দান জিতে নিয়ে গেল রুমানা। ডাণ্ডা পড়ল যেন ট্রিকের মাথায়।

তাজ্জব হয়ে চোখে রইল কন্ট্রাস্টর টেবিলের উপর চিত হয়ে পড়ে থাকা রানীর দিকে। হাঁ হয়ে গিয়েছে ওর মুখ। বোকার মত সবার মুখের দিকে চাইল সে একবার। পার্টনারের চেহারা বিকৃত হয়ে যেতেই আত্মরক্ষার তাগিদে বলল, 'আচ্চ! ওর হাতে হার্টসের কুইন আসে কি করে?' একটু সামলে নিয়ে রসিকতা করে বলল, 'বাবা, বুদ্ধি বানা দিয়া! ওটা ঠিক কুইন তো, না আপনার ছায়া?' হাতের কার্ডগুলো টেবিলের উপর চিত করে নামিয়ে বলল, 'যাক, বাকি সব আমার। দেখুন পার্টনার, আমার দোষ নেই। ডাবল দিল গোলাম হায়দার, কুইন বেরোচ্ছে তার পার্টনারের কাছে থেকে! আমি কি করব?'

'কিছুই করার নেই, দাদা,' বলল গোলাম হায়দার। 'মোট হলো চারশো পয়েন্ট। নাও, তোমার ডিল।' কার্ড কেটে এগিয়ে দিল সে কন্ট্রাস্টরের দিকে। এগিয়ে চলল খেলা।

তার মানে গতবার গোলাম হায়দারের ডিল ছিল, ডাবল রানা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়াল গিয়ে মেয়েটার পিছনে। বারবার চাইছিল রুমানা ওর দিকে, অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছিল রানা—তাই দৃষ্টি এড়িয়ে গেল এই ভাবে। 'তাছাড়া ডিলের মধ্যেই যদি কৌশল থাকে তাহলে, সামনে থেকে দেখতে হবে গোলাম হায়দারকে।

'আপনাদের রবার কেতনা দূর?' জিজ্ঞেস করল চেয়ারম্যান।

'এই যে, রোমান।' ঘাড় কিরিয়ে চাইল গোলাম হায়দার চেয়ারম্যানের দিকে। 'তবসইছে না বুঝি? শ্রম্পক্ষ হাজির?'

'ব্রিগেডিয়ার এসে পৌছায়নি। কিন্তু উনকা পার্টনার এসে গেছেন। উনি ভি এসে যাবেন আখুনি। এই যে উনকা পার্টনার মিস্টার মাসুদ রানা। ইনি মিস্টার গোলাম হায়দার।'

'বেশ বেশ, খুশি হলাম খুব। ব্রিগেডিয়ার আজ তাহলে ফাইন্যান্সিয়ার জুটিয়ে এনেছে। গতরাতেও হারা টাকা আজ না উঠিয়ে ছাড়বে না! কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। কি যাবেন হুইকি-সোডা, না ওধু সোডা?'

'থ্যাঙ্কস্। কিছুই লাগবে না। এখুনি খেয়েছি।'

যেন খেলা দেখছে এমনি ভাব দেখিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা গোলাম হায়দারের মুখটা। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় কাগজে যে ছবি ছাপা হয় তাতে এই উদলোকের প্রবল ব্যক্তিত্ব, সম্মান, প্রাণবন্ত এবং স্বচ্ছন্দ ক্ষমতার বিচ্ছুরণ, কিছুই প্রকাশ পায় না। কটোর নিচে 'বাঘের বাচ্চা' ক্যাপশন নিখে দিলেও কেউ বুঝতে পারবে না কি দুর্দান্ত শক্তি আছে এর

ভিতরে। কাছ থেকে না দেখলে বুঝবার উপায় নেই। প্রকাণ্ড মাথায় এলোমেলো তকনো চুল, চিরুনি বা তেলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই সে চুলের। স্বাভাবিক চওড়া কাঁধ। গলায় সাদা একটা গোল দাগ দেখা যাচ্ছে কলারের ঠিক ওপরেই। পিছন থেকেও এই দাগটা লক্ষ করেছিল রানা। মনে হচ্ছে যেন সাদা একটা ফাঁস পরানো আছে ওর গলায়। বড়সড় রসগোল্লার সমান ডান চোখটা কোটর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। একটি পাপড়িও নেই সে চোখের পাতায়, মণিটা ঘোলাটে, লাল কয়েকটা শিরা দেখা যাচ্ছে সাদা অংশে। বাম চোখ স্বাভাবিক। বাম চোখেই দেখে গোলাম হায়দার। শান দেয়া ছুরির মত মাঝে মাঝে ঝিক করে উঠছে সে চোখ। এবার লোমশ দুটো হাতের দিকে চোখ পড়ল রানার। এত ঘন লোম যে গায়ের রং দেখা যায় না, ফর্সা না কালো বুঝতে হলে মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে হয়। ফর্সা। উপরের পাটির দাঁতগুলো উঁচু হয়ে থাকায় হাসলে লোকটাকে কুৎসিত, ভয়ঙ্কর দেখায়।

হাত দুটো সর্বক্ষণ ব্যস্ত। একটার পর একটা ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট ধরাচ্ছে, কখনও হাতের তাসগুলো এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক সাজাচ্ছে, কখনও টেবিলের উপর রাখা সিগারেট কেসের পাশে লাইটারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, আর থেকে থেকেই দাঁত দিয়ে ডানহাতের অনামিকার নখ কাটছে। সোনার ঘড়িটা ডান হাতে খরা, রানা একনজর দেখেই বুঝল পাটেক ফিলিপ ঘড়ি। দামী ফ্ল্যানেলের সুট, সাদা সিল্কের শার্ট, লাল টাই।

গোলাম হায়দারকে ডাল করে দেখে নিয়ে খেলায় মন দিল রানা। মিনিট পনেরো নিয়ম মাস্কি চলল, গেম করতে পারল না কেউ। কোন কৌশল ধরতে পারছে না দেখে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা নিজের উপর।

‘এবার আমার ডিল,’ স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠে বলল গোলাম হায়দার। ‘গেমটা করেই ফেলি, কি বলো, কন্ট্রাস্টর? কতক্ষণ আর বোচারাদের বসিয়ে রাখা যায়? রাবার না হলে ওঠা যাচ্ছে না, অথচ চ্যালেঞ্জ বাউন্ডের জন্যে ছটফট করছে মনটা।’ কথা বলতে বলতে ধীর স্বচ্ছন্দগতিতে তাস বাউন্ডে আরম্ভ করল গোলাম হায়দার। ঝিক ঝিক করতে থাকল অনামিকায় পরা দশ ক্যারেটের একটা ইয়েলো ডায়মন্ড ঘরের উজ্জ্বল আলোয়। ‘কি হে, চেয়ারম্যান, তোমার ব্রিগেডিয়ারের তো কোন পাতাই নেই!’

রানা চেয়ে রয়েছে গোলাম হায়দারের হাতের দিকে। ইঠাৎ বুঝে ফেলল সে রহস্যটা। ছি-ছি, এত সাধারণভাবে চুরি করছে লোকটা! এত নামজাদা অভিজাত ক্লাব না হয়ে অন্য যে-কোন জায়গায় এই কৌশল করতে গেলে নির্বাণ ধরা পড়ে যেত লোকটা—কান ধরে উঠিয়ে দেয়া হত ওকে টেবিল থেকে। আর রানাই বা কম আহাম্মক নাকি? টেবিলের দিকে একনজর চেয়েই তো বুঝে ফেলা উচিত ছিল ওর ব্যাপারটা। কিন্তু অদ্ভুত সাহস তো লোকটার! সে কি কেয়ার করে না? এত সহজ সাধারণভাবে চুরি করলে যে-কোন মুহূর্তে ধরা পড়তে পারে, এটা কি সে জানে না? লোকটা শাইনার।

‘আমি গিয়ে দেখি,’ বলল রানা, ‘বিগেডিয়ার হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন গেটের কাছে।’ রেমানের দিকে চেয়ে সামান্য ইঙ্গিত করল রানা, তারপর বেরিয়ে এল ওরা দু’জন বাইরে। গোলাম হায়দার তখন ডেকে বসেছে, ফোর নো ট্রাম্পস্।

সোজা চেয়ারম্যানের অফিস-কামরায় চলে এল ওরা। বিগেডিয়ারকে ডেকে আনতে গেল একজন বেয়ারা। বাতি জ্বেলে দরজা ভিড়িয়ে দিল রেমান।

‘কিয়া, মেজর? কিছু বুঝা গেল।’

‘হ্যাঁ। চুরি ঠিকই করে।’

‘ইয়া আল্লা! কায়া, মুসিবাত গিরা দিয়া। কায়সে?’ আঘাতের আতিশয্যে নিজের ভাষা বেরোল চেয়ারম্যানের।

‘ডিল করবার সময়। চক্চকে সিগারেট কেসটা দেখেছেন না টেবিলের ওপর? ডিল করবার সময় প্রত্যেকটা কার্ডের প্রতিচ্ছবি দেখে সে ওর ওপর। কারও চোখে পড়ে না। তাস আর ওর হাত দিয়ে ঢাকা থাকে সিগারেট কেসটা ডিল করবার সময়। কার হাতে কি আছে জানা হয়ে যায় ওর পরিষ্কার। আমরা চুকেই যে ডাবল্ দেয়া দেখলাম—সেবার ওর ডিল ছিল। ও জানত ওর পার্টনারের কাছে হার্টসের কুইন আছে। ট্রিক করতে গিয়ে বোকা বনবে কন্ট্রাস্টর।’

‘কিন্তু প্রত্যেকবার তো আর সে ডিল করে না,’ বলল রেমান।

‘অন্যান্যবার সাধারণভাবে খেলে যায়। ভাল প্লেয়ার সে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চিন্তা করুন, ভাল প্লেয়ার যদি প্রতি চারবারে একবার করে সবার হাতের তাস জানতে পারে তো ব্যাপারটা কি সাম্প্রতিক হয়ে দাঁড়ায়!’

‘কিন্তু কেউ ডাউট করেনি কেন এতদিন?’ সন্দেহ প্রকাশ করে রেমান।

‘চেইন স্মোকারের সিগারেট কেস টেবিলের ওপর থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। যখন একজন ডিল করে তখন তার নিচের দিকে তাকানোও অস্বাভাবিক নয়—সবাই তাকায়। তার উপর হীরের আংটির ঝিকিমিকি দিয়ে দর্শকের মনোযোগ অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়, সেই সাথে সিগারেটের ধোয়া ছাড়ে সে তখন টেবিলের মাঝ বরাবর। তাছাড়া আপনিই বলুন, একটি প্লেয়ারও কি ওর জোকুরি ধরবার চেষ্টা করেছে কখনও?’

‘না, করেনি। একথা কল্পনা করাও যায় না। গোলাম হায়দারের মত আদমী! তাজ্জব কারবার! কেবল আমার মনেই হালকা একটা সন্দেহ এসেছিল, প্রকাশ করার হিম্মত হয়নি। কিন্তু কাজটা করছে কেন লোকটা? লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকা যার, হাজার রকম বিজনেস, সে কেন...’ চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল চেয়ারম্যান। আবার বিড়বিড় করে শুরু করল, ‘কমিটিকে জানালে শোরগোল পড়ে যাবে। স্ক্যাভাল হুড়িয়ে পড়বে। পাবলিক হিরো...এত বড় একজন আদমীকে যদি...উহ! কি করা যায়, মেজর মাসুদ রানা? হামার ক্রাবের মেম্বারদের লাখ-লাখ টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে সে, হামি তো চুপ থাকতে পারি না। কাছ তো বাখলান, মেজর?’ উত্তেজনার চোটে

পায়চারি আরম্ভ করল সে ঘরময়।

ব্রিগেডিয়ার এসে ঢুকলেন ঘরে। নিঃশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

‘মেজর জেনারেল রাহাত খান আমাকে পাঠিয়েছেন ব্যাপারটা সত্যি সত্যি চুরি কিনা তাঁকে জানানোর জন্যে,’ বলল রানা চেয়ারম্যানের কথার উত্তরে। ‘কোন কিছু করতে আমাকে বলেননি। তিনি এসে যা হয় করবেন।’

‘কিন্তু ততক্ষণ থাকবে না তো গোলাম হায়দার। এগারোটার বেশি খেলে না সে। আওর কাল সকালেই ও চিটাগাং চলে যাবে। আপনি কিছু বুদ্ধি বাখলান, মেজর। স্ক্যান্ডাল না করে ওকে রুখবার কোন কায়দা নেই?’

‘আছে। ওর কুইনাইন ওকে দিয়েই গেলানো যায়।’

‘তো তাই করুন না?’ আশার আলো ফুটে উঠল রেমানের চোখে।

‘আমি আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করতেই ভালবাসি। এক গালে চড় খেয়ে আরেক গাল পেতে দেয়া আমার নীতি নয়। মেজর জেনারেল তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।’

‘কি করতে চাইছেন?’ জিজ্ঞেস করল রেমান।

‘প্রথমতঃ, আমি ওকে বুদ্ধিয়ে দেব যুে ওর কৌশল বুঝে ফেনেছি আমি, যাতে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর না করে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিগেডিয়ারের টাকাতলো ফেরত দিতে হবে ওকে। কায়দা করে বের করে নেব আমি।’

‘কি করে?’

‘জোড়ুরি করে। রাজি আছেন?’

‘সেটা কি ঠিক হবে?’ হঠাৎ বলে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার, ‘টাকা আমার নিজের দোষে গেছে...’

‘না। আপনার দোষে যায়নি, স্যার। গোলাম হায়দারের শয়তানির জন্যে গেছে। স্টেকে ব্রিজ খেলাটা দোষের কিছু নয়, চুরি করাটা দোষের।’

‘কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাও?’

‘সে রিস্ক আমার। আপনি কি বলেন, মিস্টার রেমান?’

‘হাস্যামার মধ্যে না গিয়ে আপনি যা করবেন আমি রাজি আছে।’

‘বেশ!’ কোটের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিল্কের ক্রমাল দুটো স্পর্শ করল রানা। ‘লাল, নীল দু’রকম তাসের দুটো প্যাকেট পাঠিয়ে দিন। দশ মিনিট একা থাকতে চাই আমি এই ঘরে।’

পাঁচ

‘চলুন, ব্রিগেডিয়ার,’ বলল রানা।

‘আমার কিন্তু ভয় করছে, ইয়ংম্যান। যদি ধরা পড়ে যাও, তাহলে কি অবস্থা হবে ভেবেছ একবার? তাছাড়া মেজর জেনারেলকে কিছু না জানিয়ে

এভাবে...

‘সে সব আপনাকে ভাবতে হবে না, স্যার। যেমন কাজে উনি সত্যি সত্যি রাগ করবেন তেমন কাজ আমি করবই না। দশ বছর ওঁর আভারে কাজ করছি...’

‘আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। কিন্তু কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে না, শেষে বোকা বনতে না হয়।’

‘ভুনুন। ওকে মাথায় তুলে আছাড় মারব আমি...’

‘বলো কি।’ আঁতকে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার।

‘কথাটা শেষ করতে দিন। কাজেই, প্রথমে ওকে মাথায় তুলতে হবে।’ প্রথম দিকে হারতে থাকবে আমরা। যেন খেলার কিছুই বঝি না, এরকম অভিনয় করব, স্টেক বাড়িয়ে দেব—কিন্তু ঘাবড়াবেন না। পূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন আমার ওপর। ওকে মাথার ওপর তুলে নেব আগে, তারপর গুঁড়ো করে দেব ওর অহঙ্কার। ওর বায়ে বসব আমি। আপত্তি নেই তো কোন?’

‘না, আপত্তি কিসের? আর কিছু?’

‘আর একটা ব্যাপার আছে। যখন সময় আসবে, আমি আমার কোটের পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করব। আপনি সেই দানটা ডাকাডাকির ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবেন আমার ওপর। ঠিক আছে?’

‘ঠিক আছে।’

কার্ড-রুমের একটি টেবিলও খালি নেই। জমজমাট হয়ে রয়েছে ঘরটা খেলোয়াড় ও দর্শকের মূদু গুঞ্জনে। সারাটা ঘরে দৃষ্টি বুলাল রানা একবার। তারপর এগিয়ে চলল গোলাম হায়দারের টেবিলের দিকে। কত পদের লোক রয়েছে ঘরটার মধ্যে—কেউ ঠকবাজ, কেউ লোভী, কেউ ভীত, কেউ মিথ্যাক, কেউ হয়তো বাড়িতে বৌ পেটায়, কারও হয়তো মস্তিষ্ক-বিকৃতি আছে—কিন্তু চারদিকে উচ্ছল একটা ভাব বিরাজ করছে বলে এই ঘরের দামী পোশাক-পরিচ্ছদ পরা প্রত্যেকটি লোককে সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, সুখী মনে হচ্ছে।

কট্টাঙ্গির আর তার পার্টনার উঠে গেছে। বেরমান বসে গল্প করছে গোলাম হায়দারের সঙ্গে। কাছে যেতেই চড়া পর্দায় উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

‘অ্যাসট্রোলজি যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তোমার সব কথা বলে দিলাম কি করে? কালই যদি সাত রত্নের একটা রু স্যাফায়ার না পরো তাহলে চারদিনের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট হবে তোমার।’ ব্রিগেডিয়ারের ওপর চোখ পড়তেই হেসে উঠল গোলাম হায়দার। ‘আসুন, আসুন। আপনার চ্যালেঞ্জ আমি সাহসে গ্রহণ করেছি। অধীর চিন্তে অপেক্ষা করছি আমি ছুরি হাতে নিয়ে, আমার ছাপল আর আসে না।’

এগিয়ে গিয়ে গোলাম হায়দারের বায়ের চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা। ব্রিগেডিয়ার বসল উল্টো দিকের চেয়ারে। শ্যানেল নান্নার ফাইভের হালকা মিষ্টি গন্ধে চট করে চাইল একবার রানা মেয়েটির দিকে। ওর দিকে চেয়ে আছে রুমানা। মুচকে হাসল একটু।

সবাই তৈরি হয়ে গেল খেলার জন্যে। গোলাম হায়দারের উদ্ধত কর্কশ কথাবার্তায় অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করল রানা। কিন্তু ওর ভাবে প্রকাশ পেল না কিছুই। টসে জিতল গোলাম হায়দার। ওর ডিল। ব্রিগেডিয়ার শাফল করতে আরম্ভ করল এক প্যাকেট লাল কার্ড।

‘আজ কি স্টেকে খেলবেন, ব্রিগেডিয়ার? গতকাল ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ খেলে বিরক্ত হয়ে গেছি। কিফটি পর্যন্ত খেলতে রাজি আছি আমি।’

‘ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ দিয়ে শুরু তো হোক, তারপর দেখা যাবে। কি বলো হে, মাসুদ রানা?’

ইঠাৎ প্রশ্ন করে বসল গোলাম হায়দার, ‘আপনার বন্ধুটি মাসুদ রানা কি সোহেল রানা তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু ফাইভ অ্যান্ড ফাইভের মানে বোঝেন তো উনি?’

‘আজ্ঞে হাঁ, ওটুকু জ্ঞান আছে,’ বলেই হাসল রানা গোলাম হায়দারের নষ্ট চোখের দিকে চেয়ে, ‘কত টাকা জেতার ইচ্ছে আছে আজ আপনার?’

‘আপনার শেষ পাই পয়সা পর্যন্ত,’ গোলাম হায়দারও উত্তর দিল মৃদু হেসে। ‘আছে কত আপনার?’

‘খেলা তো শুরু করা যাক, পয়সা শেষ হলে জানাব।’ গায়ে জ্বালা করে উঠল রানার জোচ্চোরের দম্ব দেখে। ইঠাৎ বলে, বসল, ‘আপনার লিমিট গুনলাম কিফটি অ্যান্ড কিফটি। ওই স্টেকেই শুরু করা যাক।’

কথাটা বলে নিজেই চমকে উঠল রানা। এ কী বলে বসল সে? সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। যদি সত্যিই হেরে যায়, এত টাকা দেবে কোথেকে ও? ব্রিগেডিয়ারের তো একটা পয়সাও অবশিষ্ট নেই, রাহাত খানও এমন কিছু বড়লোক নন যে এত টাকা ধার দিতে পারবেন। ছি-ছি, ঝোঁকের মাথায় এ কী পাগলামি করে বসল সে। ব্যাপারটার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতও নয় সে। সাহায্য করতে এসেছে মাত্র। তাও বসের অনুরোধে। লোকটা একে জোচ্চোর তার ওপর দুর্বিনীত। শায়েস্তা করতে চায় সে ওকে—কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বড্ডো বেশি।

টেবিলের প্রত্যেকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে রানার মুখের দিকে। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে ব্রিগেডিয়ার এবং রেমানের মুখ। গোলাম হায়দারের চোখে অবিশ্বাস। ঠোট বাঁকিয়ে বিক্রপের হাসি হাসল সে।

‘ভাল, ভাল। কিফটি অ্যান্ড কিফটিই সই। উঁচু স্টেক না হলে, সত্যি বলতে কি, মজা লাগে না খেলতে।’ ব্রিগেডিয়ারের কাটা হয়ে গেলে ডিল করতে আরম্ভ করল গোলাম হায়দার। ‘কিন্তু ওঁর কমিটমেন্টের সিকিউরিটি কি, চেয়ারম্যান? উনি তো ক্রাবের মেশার নন। আর ব্রিগেডিয়ার তো নিঃশব্দ।’

রানা চাইল রেমানের লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে। দুই সেকেন্ড চূপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিল রেমান। এরকম একটা অবস্থা যে সুস্থি হতে পারে, ধারণা ছিল না রানার। এখন যদি রেমান জানায়, সত্যি সত্যিই রানার কমিটমেন্টের একবিন্দুও সিকিউরিটি নেই, হেরে গেলে টাকা দিতে পারবে না রানা। তাহলে? মাথা নিচু করে বের হয়ে যেতে হবে ওকে এই ঘর ছেড়ে।

লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না কোথাও।

‘হামি উনার সিকিউরিটি আছে। স্যাটিসফায়েড?’ রানাকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল রেমান।

রানা জানে রমনা ক্লাবের চেয়ারম্যান যখন, মস্ত কোন হোমরাচোমরা লোক হবে আনিসুর রেমান। কিন্তু আগের থেকে জানা নেই শোনা নেই, হঠাৎ এই অবাকানী ভদ্রলোক যে তাকে এমনভাবে সমর্থন করে বসবে, আশা করতে পারেনি সে।

‘ওহ, ড্যাম স্যাটিসফায়েড।’

হঠাৎ স্টেজ বাড়িয়ে দেয়ায় যে গ্লানিবোধ এসেছিল রানার মধ্যে, মিলিয়ে গেল সেটা। সেই জায়গায় এল গভীর একটা আত্মপ্রত্যয়। চূর্ণ করতে হবে হায়দারের দন্ত। এমন শিকাই দেবে সে আজ একে, যেন চিরকাল মনে থাকে ওর।

ধীরে ধীরে কার্ড বাঁটছে গোলাম হায়দার সিগারেট কেসটার দিকে চেয়ে। আরাম করে নড়েচড়ে বসল রানা চেয়ারে।

সাধারণ তাস উঠল রানার হাতে। কল দেবার মত নয়। গোলাম হায়দার তিনটে ক্লাবস ডাকল; রানা নো কিড; রুমানা ফোর ক্লাবস, ব্রিগেডিয়ার নো। চারটে ক্লাবসের খেলা হলো, গেম হলো না। ক্লাবসের টেকা, কিং ছিল রুমানার হাতে। চোখাচোখি হলো একবার রেমান ও রানার মধ্যে।

কিন্তু এই একটা দানই। তারপর পর পর তিনটে দান জিতে রাবার করল রানা ও ব্রিগেডিয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই, উদ্বিগ্ন দেখাল গোলাম হায়দারকে। নয় হাজার টাকা হেরে গেছে সে। ভাল কার্ড আসছেই না ওর হাতে।

‘সোজা খেলা চলুক, কি বলেন? আবার কাটাকাটি করা ঝামেলা,’ বলল গোলাম হায়দার।

রানা বুকল, আসল কথা ডিল করতে চাইছে সে। বলল, ‘আমার আপত্তি নেই।’

এবার কপাল ফিরল গোলাম হায়দারের। স্মল স্মল করল হার্টসের। গুনগুন গান বেরোল ওর কর্কশ কণ্ঠ থেকে। এবারও পরিষ্কার বোঝা গেল কার হাতে কি কার্ড আছে, জানা না থাকলে নির্ধাত হারত গোলাম হায়দার। ছোট ছোট সাতটা হার্টস ছিল রুমানার হাতে। স্পেডস্ ছিল না একটাও।

‘আর্চর্ভ! কি করে জেতো তুমি, গোলাম হায়দার?’ প্রশংসা করে বলল রেমান।

উত্তর দিল রানা। এখন থেকেই পিন ফুটাতে আরম্ভ করতে হবে। বলল, ‘স্বরূপশক্তি।’

চট করে তাকাল গোলাম হায়দার রানার দিকে। ‘স্বরূপশক্তি! তার মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি? ট্রিকের সঙ্গে স্বরূপশক্তির কি সম্পর্ক?’

‘এবং কার্ড সেল,’ যোগ করল রানা, ‘এই দুটো গুণ একসাথে হলে হয় মস্ত কার্ড প্লেয়ার।’

‘ও, বুঝলাম,’ কার্ড কেটে রানার দিকে এগিয়ে দিল গোলাম হায়দার।

কার্ড বাঁটতে বাঁটতে অনুভব করল রানা, এই প্রথমবার ভাল করে লক্ষ করছে তাকে, মূল্য নিরূপণ করবার চেষ্টা করছে গোলাম হায়দারের চোখ। স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলল খেলা।

রুমানার একটা ভুল কলে ডাবল দিয়ে দাবিয়ে দিল ব্রিগেডিয়ার—দুই পিঠ শর্ট পড়ল। কিন্তু পরের দানেই আবার গেম করে রাবার করল গোলাম হায়দার। প্রথম রাবারের জয় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়ে হাজার তিনেক টাকা তলে পড়ল রানার।

ওয়েটারকে ডেকে ড্রাই জিন চাইল গোলাম হায়দার, রুমানার জন্যে শ্যাম্পেন। রানা এবং ব্রিগেডিয়ার প্রত্যাখ্যান করায় ওদের জন্যে কফির অর্ডার দিল দুই কাপ। মাথা ঠিক রাখতে হবে এখন, ভাবল রানা—উত্তেজক কিছু খাওয়া চলবে না।

কার্ড বাটার পর হঠাৎ রানার দিকে ঘুরে গোলাম হায়দার বলল, ‘আসুন, এই দানটায় আমরা দু’জন একটা স্পেশাল বাজি ধরি। খেলায় প্রাণ আসবে। পাঁচশো টাকার বাজি। যে জিতবে সে পাবে। বাজি?’

সোজাসুজি গোলাম হায়দারের চোখের দিকে চাইল রানা। নষ্ট চোখটা আরেকটু লাল দেখাচ্ছে, ছোট চোখটায় ঠাণ্ডা একটা ভরসনা। রানা ভাবল, আমি সত্যি সত্যিই কিছু সন্দেহ করেছি কিনা বাজিয়ে দেখতে চায় ব্যাটা। স্মরণশক্তির কথাটায় ঘাবড়ে গেছে বোধহয়। ঠিক আছে, আরও খানিকটা ভড়কে দেয়া যাক।

‘আপনার ভিলে?’ মৃদু হেসে বলল রানা, ‘আচ্ছা, ঠিক আছে। এর পরের ভিলেও এই বাজিটা বলবৎ থাকুক।’

‘আচ্ছা, এর পরের দানটাও আমি প্যচ্ছি,’ বলল গোলাম হায়দার কঠিন গলায়।

‘এই দানটা জিতবেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরের দানটা আমারও হতে পারে।’ আরেকটু খোঁচা দিল রানা। মুহূর্তে কঠোর হয়ে গেল গোলাম হায়দারের মুখ।

কিন্তু পরপর দুটো দানই জিতল গোলাম হায়দার। তার পরের দুটোও। রাবার করল সে। টিটকারি মেরে বলল, ‘আঠারো হাজার ডাউন।’

‘আগামী রাবারের স্টেক ডাবল করে দেয়া যাক, কি বলেন?’ বলল রানা তিত্ত কণ্ঠে। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। একটু যেন বিচলিতও।

ভিল করে ততক্ষণে কার্ড হাতে তুলে নিয়েছে গোলাম হায়দার। ওহাচ্ছে সেগুলো। ঠোটের কোণে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল ওর। ঠোট দুটো ভেজা ভেজা। সোজাসুজি রানার দিকে চাইল সে। রানা তখন চুমুক দিচ্ছে কফির কাপে। হাতটা একটু একটু কাঁপছে না ওর?

‘ঠিক আছে। বাজি আছি আমি তাতে।’ একটু উদারতা দেখাবার জন্যে যোগ করল গোলাম হায়দার, ‘কিন্তু আমার হাতে গোটা কয়েক চমৎকার তাস দেখতে পাচ্ছি, ইচ্ছে করলেই চেপে যেতে পারেন, মিস্টার মাসুদ রানা,

এবারের মত।’

‘না, না। চেপে যাব কেন? আমিই তো স্টেকটা বাড়াতে বললাম।’
আনাড়ির মত তাস তুলে সাজ্জাবার চেষ্টা করছে রানা এখন।

‘বেশ, বেশ,’ বলল গোলাম হায়দার উৎফুল্ল কণ্ঠে।

‘ধী নো ট্রাম্পস্।’

‘নো।’

‘ফোর নো ট্রাম্পস্।’

‘নো।’

অন্যাসে গেম করল গোলাম হায়দার।

কিন্তু তারপরেই ভাণ্ড প্রসন্ন হলো রানার প্রতি। একটা স্মল স্লাম করল সে হার্টসের। তার পরপরই ব্রিগেডিয়ার গেম করল ফোর স্পেডসের। টকটকে লাল হয়ে উঠল গোলাম হায়দারের নষ্ট চোখটা। ভিতর ভিতর অপমানিত বোধ করছে সে। আরও গা জ্বালিয়ে দিল রানা ওর। বলল, ‘জবাই করতে এসে ছাগলের গুতোয় অস্থির হয়ে উঠেছেন দেখছি।’ ঘেমে উঠল গোলাম হায়দারের কপাল। ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হয়েছে এখন ব্যাপারটা। বলবার কথা না পেয়ে দাঁত দিয়ে জোরে জোরে নখ কাটতে আরম্ভ করল পূর্যদন্ত শিল্পপতি।

খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ব্রিগেডিয়ারের মুখটা। এতক্ষণে কিংস্টার্ক ধরাল একখানা।

‘আর একটা রাবার খেলেই উঠতে হবে আমাকে,’ বলল রানা ঘড়ির দিকে চেয়ে, ‘ঘুম পেয়ে গেছে।’

স্কার-শীটে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো গোলাম হায়দার। রানার দিকে চেয়ে বলল, ‘হাজার দশেক টাকা মাত্র ব্যালেন্স দেখা যাচ্ছে। এই দশ হাজার নিয়ে কেটে পড়তে চাইলে যেতে পারেন। কিন্তু আসুন না, শেষেরটা এই ক্লাবের একটা স্মরণীয় রাবার করে রাখি আমরা? চারগুণ করে দিই স্টেক, ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাক? কি, রাজি?’ ওই বেরোয়া লোকটাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে না পারলে স্বত্তি পাচ্ছে না সে কিছুতেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করল রানা।

‘কি হলো?’ অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল গোলাম হায়দার।

‘রাজি!’ বলল রানা নিষ্ঠুর কণ্ঠের একটা চোখের দিকে চেয়ে।

ছয়

ঘরে ঢুকলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। ডিডু ঠেলে এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। এতক্ষণে লক্ষ্য করল রানা ওদের টেবিলের চারপাশে বেশ

ভিড় জমে গিয়েছে উৎসুক দর্শকবৃন্দের। রাহাত খানকে দেখতে পেয়েই একটু দূরে নিয়ে গেল রেমান। আজ রাতের ঘটনাগুলো বোধহয় বলছে। ভুরু কুচকে মাথা নেড়ে কি যেন বললেন রাহাত খান। বোঝাবার চেষ্টা করছে রেমান। বিস্ময়জনক দৃষ্টিতে একবার চাইলেন বৃদ্ধ রানার দিকে। আবার মাথা নেড়ে অসম্মতি জানানলেন তিনি। রানা ভাবল, বুড়ো তো গোলমাল আরম্ভ করে দেবে, তাড়াতাড়ি খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই হয় এখন।

রিগেডিয়ার ক্যেটে দিতেই তাস বাঁটতে আরম্ভ করল গোলাম হায়দার। তর্কাতর্কি শেষ করে এগিয়ে এল দু'জনেই আবার টেবিলের দিকে। রাহাত খানের মুখে অসন্তোষ আর বিরক্তির ছাপ।

টেবিলের উপর থেকে কার্ডগুলো তুলে নিয়েই খুশি হয়ে উঠল রানার মন। এই প্রথম সে এত ভাল কার্ড পেল। তাও আবার গোলাম হায়দারের বাঁটায়। সাতটা স্পেডসের চারটেই টপ অনার্স, হার্টসের টেক্সা, ডায়মন্ডের টেক্সা, কিং। গোলাম হায়দারের দিকে চাইল রানা। ওদের হাতে ক্লাবস আছে কিনা কে জানে? থাকলেও বেশি ডেকে নিতে পারবে রানা, কিন্তু অতিরিক্ত ডাকিয়ে ডাবল দেবে না তো আবার?

'নো বিড,' বিরস কণ্ঠে বলল গোলাম হায়দার।

'চারটে স্পেডস,' বলল রানা।

'নো।'

'নো বিড।'

'নো,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল গোলাম হায়দার।

অন্যায়সে পাঁচটা স্পেডসের গেম করল রানা। গোলাম হায়দারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন মৈজর জেনারেল রাহাত খান। বাঁকা পাইপটা ধরালেন তিনি। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে গোলাম হায়দারের কপালে। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে সিগারেট ধরাল সে। রুমানা নির্বিকার।

'রিগেডিয়ারের গেস্ট দেখছি চমৎকার কপাল নিয়ে জন্মেছেন!' বলল রেমান।

রিগেডিয়ার চেয়ে দেখলেন রানার ডান হাতে একটা সাদা সিল্কের রুমাল দেখা যাচ্ছে। মুখ মুছল সে রুমাল দিয়ে, চোখ দুটো দ্রুত ঘুরে এল গোলাম হায়দার এবং রুমানার মুখের উপর দিয়ে, তারপর চলে গেল রুমালটা আবার কোটের পকেটে।

রানার ডিন এবার। যত্নের সঙ্গে নীল এক প্যাকেট তাস বেঁটে, দিল সে। তারপর তুলে নিল নিজেরগুলো টেবিল থেকে। পাঁচটা ক্লাবস পেয়েছে সে—টেক্সা, কুইন, দশ, আট, চার; আর ছোট ছোট আটটা ডায়মন্ড—কুইন, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই।

ঠিক আছে। ফাঁদ পাতায় ডুল হয়নি কোন।

গোলাম হায়দারের অভিব্যক্তি লক্ষ করল রানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে হাতের অবিশ্বাস্য কার্ডগুলোর দিকে। এমন কপালও মানুষের হয়? রানা জানে, দুর্দান্ত কার্ড পেয়েছে গোলাম হায়দার। দশটা নিশ্চিত ট্রিক।

এইবার! এইবার পিষে ফেলবে সে ওই উদ্ধত ছোকরাকে।

চেয়ারম্যানের অফিসে বসেই ওর জন্যে এই তাস তৈরি করে রেখেছে রানা। কাছেই চারদিকে চাইল সে এবার নিশ্চিন্তে। রুমানা ও ব্রিগেডিয়ার নির্বিকার। সুবিধার তাস পায়নি ওরা কেউ। রাহাত খান এক রেমানের চোখে বিশ্বাস। গোলাম হায়দারের অসাধারণ হাত দেখতে পেয়েছে ওরা। এবার আবার চাইল রানা গোলাম হায়দারের দিকে।

যেন নিতান্তই বাজে কার্ড পেয়েছে এমনি ভাবে ভাঁজ করে তাসগুলো রাখল গোলাম হায়দার টেবিলের উপর। সিগারেট ধরাল একটা।

‘হ্যা, কপালটা ওর ভালই বলতে হবে,’ এতক্ষণে উত্তর দিল সে রেমানের কথার, ‘কিন্তু এর চেয়েও অনেক ভাগ্যবান লোককেও কপাল ঠুকে কান্দতে দেখেছি আমি। যাক,’ রানার দিকে চাইল সে চতুর দৃষ্টিতে। তাসগুলো তুলে দুটো টোকা দিল তার উপর। ‘কিন্তু ভাল তাস আছে আমার হাতে। সরলভাবে স্বীকার করছি। কিন্তু আপনার হাতেও ভাল কার্ড থাকে অসম্ভব নয়। (ওরে পাঞ্জি হতচ্ছাড়া, ডাবল রানা, সব টোকা, কিং-কুইন তোর হাতে—আমি ভাল কার্ড পাব কোথায়?) এই দানে কিছু একটা বেট হয়ে যাক না, মিস্টার মাসুদ রানা? কি বলেন?’

নিজের কার্ডগুলো পরীক্ষা করবার ভান করল রানা। তারপর বলল, ‘আমার হাতেও কিছু কার্ড যে একেবারে নেই তা নয়। তবে পার্টনারের ওপর নির্ভর করতে হবে অনেকটা। তা, কি বেট ধরতে চাইছেন এক্সট্রা?’

‘হাত আমাদের সমানই মনে হচ্ছে,’ ঝাড়া মিথ্যা কথা বলল গোলাম হায়দার। ‘প্রতি পয়েন্টে একশো টাকা ধরলে কেমন হয়?’

‘বাবা! একশো টাকা! খুবই ভাল হাত পেয়েছেন মনে হচ্ছে! তা ঠিক আছে, যা থাকে কপালে। কপালের লিখন খতায় কে? রাজি আছি আমি,’ ব্রিগেডিয়ারের দিকে চেয়ে বলল রানা, ‘ব্রিস্ক একটু নিষিদ্ধ ব্রিগেডিয়ার, হারলে টাকাটা আমিই দেব। হ্যা, কল্ ওরু করা যাক। আমার কল্। সেডেন ক্লাবস।’

বোমা পড়ল যেন কার্ডরুমের ভিতর। মেজর জেনারেল রাহাত খান পরিষ্কার দেখেছেন গোলাম হায়দারের হাত। মুখটা হাঁ হয়ে যেতেই পাইপটা পড়ে গেল মেঝেতে। সেটা তুলবার চেষ্টা না করেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করলেন তিনি রানার দিকে। নিশ্চয়ই মাথা ঝাড়াপ হয়ে গিয়েছে রানার।

‘কি বললেন!’ আঁতকে উঠল গোলাম হায়দার। দ্রুত একবার পরীক্ষা করল সে নিজের কার্ডগুলো তুলে নিয়ে। ‘জি. এস.—মানে গ্যাং গ্রাম ডেকেছেন আপনি ক্লাবসের?’ বিচি্র এক টুকরো বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোটে।

‘নো বিড,’ বলল মিস্ রুমানা।

‘নো,’ বললেন ব্রিগেডিয়ার অবিচলিত কণ্ঠে। এই লার্জহার্টেড ইয়ংম্যানের ওপর ভক্তি এসে গেছে তাঁর ইতিমধ্যেই। আত্মহত্যা ভো করতে

তিনি যাচ্ছিলেনই—কোন কিছুতেই ভয় নেই তাঁর এখন।

‘ডাবল,’ চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করল গোলাম হায়দার।

‘তার মানে সাইড বেটেও ডাবল দিচ্ছে আপনি?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘নিশ্চয়ই!’ নোভাতুর গোলাম হায়দারের কণ্ঠস্বর।

‘ঠিক আছে,’ বলল রানা। সোজাসুজি চাইল গোলাম হায়দারের চোখের দিকে। ‘রিডাবল্। সাইড বেটেও রিডাবল্। তার মানে সাইড বেটের প্রতি পয়েন্টের জন্য দাঁড়াল চারশো টাকা।’

বিস্মিত নো বিড আউড়ে গেল বাকি তিনজন। টেবিলের চারপাশে একপাক ঘুরে প্রত্যেকের হাত পরীক্ষা করলেন মেজ্বর জেনারেল রাহাত খান।

মেজ্বর জেনারেল দেখতে পেলেন:

রুমানা

স্পেড্‌স: ৬, ৫, ৪, ৩, ২

হার্ট্‌স: ১০, ৯, ৮, ৭, ৬

ডায়মন্ড: গোলাম, ১০, ৯

ব্রিগেডিয়ার

স্পেড্‌স: ১০, ৯, ৮, ৭

হার্ট্‌স: ৬, ৫, ৪, ৩

ক্লাব্‌স: ৭, ৬, ৫, ৩, ২

রানা

ডায়মন্ড: কুইন, ৮, ৭, ৬,

৫, ৪, ৩, ২

ক্লাব্‌স: টেকা, কুইন, ১০, ৮, ৪

গোলাম হায়দার

স্পেড্‌স: টেকা, কিং, কুইন,

গোলাম

হার্ট্‌স: টেকা, কিং, কুইন, গোলাম

ডায়মন্ড: টেকা, কিং

ক্লাব্‌স: কিং, গোলাম, ৯

হঠাৎ বুঝতে পারলেন রাহাত খান। রানার গ্যাভ ড্রাম ঠেকাবার সাধ্য নেই কারও। রুমানা যাই লিড দিক না কেন ট্রাম্প করছে রানা নিচে বা ওপরের হাতে। নিচ থেকে রং খেললেই কিং, গোলাম, নয় মারা পড়ছে ক্লাবসের, ওপর থেকে দুই দান ডায়মন্ড খেলে ট্রাম্প করলেই উড়ে যাচ্ছে গোলাম হায়দারের ডায়মন্ডের টেকা, কিং—তারপর রানার হাতে ডায়মন্ডের ছয় পিঠ স্ট্যান্ডিং। পাঁচ দানের মধ্যেই স্ট্যান্ডিং ডায়মন্ড আর রং থাকছে রানার হাতে অবশিষ্ট। গোলাম হায়দারের টেকা, কিং-কুইন সব বিলকুল বেকার।

খুন করছে রানা গোলাম হায়দারকে। সরে গিয়ে দাঁড়ালেন রাহাত খান একটু দূরে বেষ্টান থেকে পরিস্কার দেখা যায় গোলাম হায়দারের চেহারাটা। জু জোড়া কুঁচকে আছে ওঁর। রানা বুঝল, ওর এই ঠকবাজি কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না ন্যায়পরায়ণ বৃদ্ধ।

‘আরে খেলো, খেলো। খেলে দাও কিছু একটা, রুমানা,’ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল গোলাম হায়দার। ‘সারা রাত বসে থাকলে তো চলবে না।’

বেচারী! ভাবলেন রাহাত খান। বেচারী জানেও না পাঁচ মিনিটের মধ্যে

কি আকস্মিক তীব্র আঘাত আসছে ওর ওপর।

এই দানের গুরুত্ব বুঝে নিয়েছে রুমানা। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ডায়মন্ডের গোলাম ফেলল।

নিচের হাতে দেখা গেল একটাও ডায়মন্ড নেই। দুই দিয়ে ট্রাম্প করল রানা। কিং নেমে এল গোলাম হায়দারের হাত থেকে। এবার ক্লাবসের তিন লিড দিল রানা, নয় দিল গোলাম হায়দার, দশ দিয়ে ধরল রানা। এবার ওপরের হাত থেকে ডায়মন্ডের তিন ফেলল রানা, নয় ফেলল রুমানা, পাঁচ দিয়ে ট্রাম্প করল রানা। দড়াম করে টেক্সা পড়ল গোলাম হায়দারের হাত থেকে খসে। একটু অবাক হলো গোলাম হায়দার। এবার ক্লাবসের ছয় লিড দিল রানা নিচের হাত থেকে, গোলাম ফেলল গোলাম হায়দার, কুইন দিয়ে নিয়েই টেক্সা ফেলল রানা ক্লাবসের। কিং বেরিয়ে গেল গোলাম হায়দারের হাতের মুঠো থেকে।

এইবার হঠাৎ ভয় পেল গোলাম হায়দার। এবার কি খেলবে রানা? ডায়মন্ড কি সব রানার হাতে? রুমানার হাতে ওর চেক আছে তো? রানার মুখের দিকে চেয়ে বুঝবার চেষ্টা করল সে। কিছুই বোঝা গেল না। ঘামে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেল ওর হাতের কার্ড।

এতক্ষণ পর চোখ তুলে চাইল রানা গোলাম হায়দারের ভীত চোখের দিকে। অনাবিল মধুর হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ। ধীরে সুস্থে বের করল সে ডায়মন্ডের কুইন। তারপর এক এক করে নামিয়ে দিল ডায়মন্ডের আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, সব শেষে দুটো ক্লাবস।

‘বাস খতম,’ বলে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল সে চেয়ারে এতক্ষণ পর।

প্রথমেই সামনের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে রুমানার কার্ডগুলো টেবিলের উপর টেনে নামাল গোলাম হায়দার। কম্পিত হাতে পাগলের মত হাতড়ে দেখল জেতার মত একটা কার্ড পাওয়া যায় কিনা।

মড়ার মত ক্যাকাসে হরে গেল ওর মুখ। পরমহুর্তে দপ করে একটা লাল বাতি জ্বলে উঠল যেন ওর মুখের ভিতর। আশ্চর্য হয়ে দেখল রানা লাল হয়ে গিয়েছে গোলাম হায়দারের ফর্সা মুখ। গলা থেকে উপরের অংশটুকুতে দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমা হয়েছে যেন। ফাঁসের মত গলার গোল দাগটা শুধু সাদা। থরথর করে কাঁপল ওর দেহটা কয়েক সেকেন্ড। লাল ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে চাইল সে রানার চোখের দিকে। ধাঁই করে একটা কিল বসাল সে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা নিজের অসহায় টেক্সা, কিং কুইনের ওপর। বুঝতে পেরেছে সে ব্যাপারটা।

অন্তরের সমস্ত ঘৃণা, বিদ্বেষ আর ক্রোধ ফুটে বেরোল ওর কণ্ঠে। ‘তুমি...তুমি একটা জো...’

‘হয়েছে!’ চাবুকের মত রমানের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ‘ক্লাবের মধ্যে একটাও বেহুদা কথা বলবে না, গোলাম হায়দার। আমি পুরা খেল দেখেছি। পেমেন্ট করে দাও। কুনো শিকায়ের থাকলে কমিটিকে লিখে

জানাবে।’

দপ্ করে নিভে গেল গোলাম হায়দার। ভয়ে নয়। সংযত করল সে নিজেকে। ওর ভিতরের দুর্দান্ত ক্ষমতা টের পেল রানা। যেমন আকস্মিকভাবে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি আকস্মিকভাবে সংযত করল সে নিজেকে। ক্রমালে মুখে ফেনল ঘেমে ওঠা কপালটা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লাগছে ওকে দেখতে। চেক বইটা বের করল সে কোটের ভিতরের পকেট থেকে। বিনা দ্বিধায় রানা ও ব্রিগেডিয়ারের নামে নব্বই হাজারের দুটো চেক লিখে দিল সে। একটুও কঁাপল না হাত। উঠে দাঁড়াল এবার। সিগারেট-কেস লাইটার পকেটে রাখল সে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে। মুখে বিচিত্র এক টুকরো রহস্যময় হাসি। নষ্ট হয়ে যাওয়া লাল চোখটা তেমনি জ্বলছে রানার দিকে চেয়ে। বাঁ হাতে চেক দুটো বাড়িয়ে দিল সে।

‘টাকাগুলো তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলো, মাসুদ রানা।’

কথা তো নয়, ফাঁস ফাঁস করে উঠল যেন গোন্ধুর সাপ। তারপর হঠাৎ ঘুরে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। পিছন পিছন চলে গেল ক্রমান্বয়ে। দরজার কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখল সে রানাকে।

সাত

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় পৌছল রানা অফিসে। আজকাল অফিস এগারোটা থেকে ছয়টা। সোজা এসে নিজের কামরায় ঢুকল সে। আগেই পৌছে গিয়েছে নাসরীন রেহানা। রানার ডেস্কের বাঁ ধারে ফাইলের একটা বিরাট স্তুপ বানিয়ে ফেলেছে সে। ইতিমধ্যেই। দেখে মনটা দমে গেল রানার। উহ্! এর থেকে কি নিস্তার নেই?’

রানার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল রেহানা। বলল, ‘চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ফোন করেছিলেন এইমাত্র। বড় সাহেব দেখা করবেন তোমার সঙ্গে। অত্যন্ত জরুরী দরকার। এখন ব্যস্ত আছেন, সময় হলে নিজেই ডেকে পাঠাবেন, তুমি যেন কোথাও বেরিয়ে না যাও।’

‘সেরেছে!’ কল রানা, ‘রেহানা, চাকরিটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গেল!’

‘কেন, কি হয়েছে?’

‘কাল ভয়ানক ঝেপে গেছে বুড়ো আমার ওপর। তুমি এক কাজ কর। চটপট একটা রেজিগনেশন লেটার টাইপ করে দাও আমাকে।’

‘রেজিগনেশন লেটার!’ চোখ কপালে উঠল রেহানার। ‘ঝেপেছ নাকি? কি হয়েছে তোমার?’

‘কাল রমনা ক্রাবে জুরাচুরি করেছে। ধরে ফেলেছে বুড়ো। ধাতানি দিতে ডাকছে আজ আমাকে। আমিও পোড়াই কেয়ার করি। আমাকে কান ধরে বের করে দেয়ার আগে আমিই রিজাইন দেব—টাইপ করা রেজিগনেশন

লেটার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসব বুড়োর সামনে। কি পেয়েছে বুড়ো আনন্দ? 'কী আবোল-তাবোল বকছ, রানা!' এগিয়ে এসে রানার ডান বাহুতে হাত রাখল রেহানা। সত্যিই ভয় পেয়েছে সে। হঠাৎ রানাও এই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠার কারণ কিছুই আঁচ করতে পারল না। উত্তরোত্তর আরও চটে উঠছে রানা।

'ঠিকই বলছি। তুমি চিঠিটা টাইপ করে আনো, তারপর সব বলব তোমাকে। অসহ্য! দিন-রাত বকা-ঝকা করবে, যখন তখন চোখ গরম করবে, ভারি আমার গুরু মশাই এসেছেন! আমি কচি খোকা নই, নাক টিপলে দুধ পড়বার বয়স আমার পার হয়ে গিয়েছে। কেন আমি সহ্য করব এসব অত্যাচার? লিখবে, বিশেষ কারণবশত এ চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি আমি। বিশেষ কারণটা কি তা আমি মুখের ওপর তনিয়ে দিয়ে আসব। যাও, কুইক।'

রেহানা পাশের ঘরে চলে যেতেই নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল রানা। সমস্ত ফাইলগুলো একসাথে তুলে আউট ট্রেতে ফেলল সে ঝপাৎ করে। আশ্চর্য! অর্ধেক রাগ কমে গেল রানার।

এবার খানিকটা সুস্থ মস্তিষ্কে গঠনমূলক চিন্তায় মনোনিবেশ করল সে।

নম্বই হাজার টাকা এখন নিশ্চিন্তে বিগ্রাম নিচ্ছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের তোপখানা ব্যাঙ্কে ওর কারেন্ট অ্যাকাউন্টে। ব্যাঙ্কের সদানাপী ম্যানেজার মিস্টার চৌধুরী রানাকে বুদ্ধি দিয়েছেন টাকাটা ফিল্ড ডিপোজিটে রেখে দিতে, কিন্তু রানা কান দেয়নি সে পরামর্শে। কখন দরকার হয়ে পড়ে ঠিক আছে কিছু? এখন দেখছে, ভালই করেছে টাকাটা ফিল্ড ডিপোজিটে আটকে না দিয়ে। মুরগীর স্বার্থ করবে সে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বজ্রতেই হাজার হাজার কুৎসিত মুরগীছানা কিম্বিল করে বেড়াতে লাগল ওর চিন্তার মধ্যে। শিউরে উঠল রানা। অসম্ভব। মুরগীর কারবার করতে পারবে না সে—একবার মড়ক লাগলেই ঝাড়কে ঝাড় খতম। তার চেয়ে ইরি ধানের চাষই ভাল। কিংবা বোট ম্যানুফ্যাকচারিং—এ গেলো কেমন হয়? স্টার পার্টিকেল বোর্ড মিল থেকে রেসিন কোটেড ওয়াটারপ্রুফ প্লাস্ট বানিয়ে নিয়ে হাজার হাজার বোট তৈরি করবে সে। আউট বোর্ড এঞ্জিন ফিট করে দেবে তাতে। রাতারাতি বদলে দেবে সে এদেশের মাফ্যাতার আমল থেকে প্রচলিত সেই একঘেয়ে দৃষ্টিভঙ্গি। দিনের পর দিন দাঁড় বাওয়া আর গুণ টানার অমানুষিক পণ্ডরম, আর সময়ের অন্যায় অপব্যয় দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে। নদীমাতৃক দেশ। এই নদীতেই যদি সে এনে দিতে পারে প্রাণের জোয়ার আর গতির মুক্তি, তাহলে সম্পূর্ণ বদলে যাবে এদেশের চেহারা। বাহ চমৎকার আইডিয়া! কিছুক্ষণ দেশ-প্রেমিকের ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে পুলকিত চিন্তে বৃন্দ হয়ে বসে রইল রানা। তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কোনও চিন্তা নেই। যা হয় একটা কিছু হবে, কাজের কি অভাব আছে? সব পথ খোলা আছে ওর সামনে।

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। নিচে পিচ-ঢালা চওড়া সড়ক দিয়ে

বাস্তবমুখভাবে চলে যাচ্ছে অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়া। স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলে টলটল করছে স্বচ্ছ জল। কয়েকটা ল্যাণ্ডোট-পরা ছোকরা ব্যাক স্ট্রোক, ফ্রী স্টাইল, ব্রেস্ট স্ট্রোক, বাটারফ্লাই প্রাকটিস করছে। ক্রাস এইট-নাইনে পড়ে খুব সম্ভব। এই উদ্দেশ্যের সময় এদের কাছে জীবনটা কি অদ্ভুত রহস্যময়! বিচিত্র মায়ায় টানছে ওদের জীবনের মধ্যাহ্ন। বলছে, তোমাদের জন্য কত রূপ, কত রঙ্গ, কত জাদু নিয়ে বসে আছি— বড় হও, এসো আমার কাছে। অথচ বড় হয়ে কি দেখবে ওরা? সব রূপ, সব জাদু যেন কোন্ ভোজবাজির বলে চলে গিয়েছে ওদের কৈশোরে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওখান থেকে, আর হাসছে মিটিমিটি। কোন দিন আর পারবে না ওরা সেখানে ফিরে যেতে। দীর্ঘশ্বাস ফেলবে আর দিনের পর দিন আরও দূরে সরে যাবে কালের অমোঘ টানে। ধীরে ধীরে মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে ছবিটা। এই তো জীবন!

একটা কালো গাড়ির চক্চকে ছাতে সূর্যটা প্রতিকলিত হয়ে চোখে পড়তেই হঠাৎ কেন যেন গোলাম হাফসারের মষ্ট হয়ে যাওয়া লাল চোখটার কথা মনে পড়ল রানার। আচ্ছা, কেন? একজন কোটিপতি লোক, যে কিনা দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে এত সম্মানের আসন পেয়েছে—সেই অসাধারণ লোকটা কেন জোচ্ছুরি করে সামান্য তাস খেলতে গিয়ে? নাকি হারতে ভয় পায় বলেই কাজটা করে সে? নাকি প্রমাণ করতে চায় যে, যে-কোন লোকের চেয়ে যে-কোন ব্যাপারে সে বড়? নিজের ক্ষমতার অতি মাত্রায় বিশ্বাসী বলেই কি এত উদ্ধত, কর্কশ ওর ব্যবহার? তাই বলে চুরি করবে কেন? নিশ্চয়ই ওর মনের মধ্যে কোথাও একটা বঁাকা স্রোত আছে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে আঁজ-বাঁজ চিন্তাগুলো সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। কি যেন সে ভাবতে চায়—আশোন-তাবোল কতকগুলো কথা এসে গুলিয়ে দিচ্ছে ওর চিন্তাটা। আজ সকাল থেকেই ওর অবচেতন মনে উঁকি-ঝুঁকি মারছে একটা চিন্তা, কিন্তু কিছুতেই ঢলে ধরতে পারছে না সে ওটাকে পরিষ্কার আলায়। আবার ডুব দিল রানা মনের গভীরে। এবং সাথে সাথেই পেয়ে গেল সূত্রটা। হ্যাঁ। ওই কথাটা বলল কেন গোলাম হাফসার? কি বোঝাতে চায় সে কথাটা দিয়ে? টাকাগুলো তাড়াতাড়ি খরচ করে না ফেললে, ভোগ করবার আর সময় পাবে না রানা? মৃত্যু ঘটবে রানা? পাগল নাকি লোকটা?

আপন মনেই মৃদু হাসল রানা। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে ভাবতে বসল আবার। নব্বই হাজার বড় বিধী একটা অঙ্ক। তার চেয়ে পঁচাত্তর হাজার তনতে অনেক ভাল। লাখ যদি পুরো থাকত তাহলে হাত দিত না রানা ওতে। কিন্তু নব্বই হাজার ভাবতেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে। কেমন অসম্পূর্ণ লাগছে। আচ্ছা, হাজার পনেরো টাকা খরচ করে ফেললে কেমন হয়? তাহলে পঁচাত্তর হাজার থাকবে। পৌনে এক লাখ। কত মিষ্টি লাগছে তনতে।

ক্রিবলিং প্যাডটা টেনে নিল রানা। আট হাজার দিয়ে একটা ফিয়াট

ফাইভ হানড্রেড গাড়ি কিনবে সে। কারণ, চাকরি যখন ছেড়েই দিচ্ছে, করোনাটা ফিরিয়ে দিতে হবে অফিসকে। আর চাকরি ছাড়লে রানার জীবনে অতিরিক্ত স্পীডের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। ফাইভ হানড্রেড ফিয়াটই যথেষ্ট। আর সাত হাজার? ওটা দিয়ে একটা হীরের আংটি কিনে প্রেজেন্ট করবে সে রেহানাকে। হাজার হোক বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছে, কত সময় কত কটু কথা বলেছে, গালমন্দ দিয়েছে—মায়া জন্মে গেছে কেমন যেন। রানার শেষ স্মৃতি হিসেবে আঙটিটা দিয়ে যাবে সে রেহানাকে।

ঘরে এসে ঢুকল নাসরীন রেহানা। হাতে টাইপ করা কাগজ একখানা।

ঠিক সেই সময়ই ইস্টারকমের মাধ্যমে ভেসে এল রাহাত খানের গুরুগভীর কণ্ঠস্বর।

‘রানা। ওপরে এসো।’

‘আসছি, স্যার,’ বলেই উঠে দাঁড়াল রানা। প্রায় খাবলা দিয়ে কেড়ে নিল সে রেজিগনেশন লেটারটা রেহানার হাত থেকে। কাগজটা চার ভাঁজ করে হাতেই রাখল। যেন রাহাত খান বুঝতে পারে ওটা দিতেই এসেছে সে, ধমক খেতে নয়। মন স্থির করে নিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোল সে দরজার দিকে।

‘রানা!’

‘কি?’ ধমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল রানা।

‘সত্যিই ওটা দেবে তুমি বড় সাহেবকে?’ উদ্ভিন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রেহানা।

‘সত্যি না তো ইয়ার্কি মারছি?’

‘এ রকম বস আর পাবে কোথাও তুমি?’

‘কেন?’

‘তুমি জানো না, রানা, কি গভীর স্নেহ করেন বড় সাহেব তোমাকে। তুমি জানো না, যখন দেশের বাইরে থাকো, কি দারুণ দুশ্চিন্তার নির্যাতন ভোগ করেন উনি তোমার জন্যে।’

‘আর কিছু বলবার আছে?’

‘আমরা কেউ চাই না তোমাকে হারাতে। রাগের মাধ্যম কিছু করে বোসো না, রানা। প্রীজ!’ রানার হাতটা ধরে ফেঁসল রেহানা। ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল রানা সাততলার সিঁড়ির কাছে। উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। জানতেও পারল না সে, পিছনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে রেহানা।

পুরু কার্পেট বিছানো লম্বা করিডর দিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল রানা মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঘরের সামনে। মৃদু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। দেখা গেল বাঁকা পাইপটা দাঁতে চেপে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা খোলা ফাইল থেকে কি যেন টুকে নিচ্ছেন তিনি প্যাডের কাগজে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইলেন একবার মেজর জেনারেল, রানার হাতের কাগজটার উপর আধ সেকেন্ড ধমকে দাঁড়াল ওর দৃষ্টি, তারপর সামনের চেয়ারটার দিকে ইশারা করেই মন দিলেন নিজের কাজে। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল রানা নির্দিষ্ট চেয়ারে। চূপচাপ কেটে গেল দুই মিনিট।

গতরাতে গোলাম হায়দার বেরিয়ে যাওয়ার পর চেয়ারম্যানের অফিস কামরায় জড়ো হয়েছিল ওরা চারজন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল রেমান ও ব্রিগেডিয়ার। গম্ভীর মুখে আগাগোড়া সব ঘটনা শুনেছেন রাহাত খান।

কোটের দুই পকেট থেকে দু'প্যাকেট তাস বের করে দিল রানা রেমানকে। লাল এবং নীল। নীল প্যাকেটটা কেটে দিয়েছিল গোলাম হায়দার রানাকে শেষ দানে, সবার অনন্য পকেটস্থ করেছিল সেটা রানা, নিজের সাজানো প্যাকেট বের করে এনেছিল। আর বাম পকেটের লাল প্যাকেটটা তৈরি ছিল, যদি লাল প্যাকেট কেটে দিত গোলাম হায়দার, তাহলে ওটা বের করত সে। ঠিক একই ভাবে সাজানো ছিল ওই প্যাকেটটাও।

'চমৎকার, মেজর মাসুদ রানা। আপনি গোটা ক্লাবের ইচ্ছাকৃত রক্ষা করেছেন,' বলল রেমান।

'কিন্তু কাজটা বড় অন্যায় হয়ে গেল,' ফস্ করে বলে বসলেন রাহাত খান।

'আর কি উপায়ে দোনো কূল রক্ষা হতো? সাবধান হয়ে গেল গোলাম হায়দার—হয় সে ছেড়েই দেবে খেলা, নয় বেইমানী ছেড়ে দেবে ভবিষ্যতে। মুখে কাছুরি বাত হলো না, কানাঘুসা কাছুরি না, সমঝে লিলো সে সব। তার উপর কান পাকাড়কে ডবল টাকা আদাই হয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ারের নম্বই হাজ্জার, আর বাকি নম্বই হাজ্জার ফাইন। ফাস-কেলাস! আপনার কি প্ল্যান ছিল?'

উত্তর দিলেন না রাহাত খান। মনে মনে বুঝলেন, আর কোন উপায়েই সর্বস্বান্ত ব্রিগেডিয়ারকে রক্ষা করার রাস্তা ছিল না। কিন্তু তবু আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই অন্তর থেকে স্বীকার করে নিতে বাধ্যল ওর। উত্তর দিতে না পেরে কটমট করে রানার দিকে একবার চেয়ে রেমান এবং ব্রিগেডিয়ারের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তিনি অপ্রসন্ন মুখে। কিন্তু আজকের এই শাস্ত সমাহিত মুখে তো কালকের বিরক্তির কোন ছাপ নেই!

হঠাৎ দেখতে পেল রানা রাহাত খানের কপালের ডানধারে একটা শিরা টিপটিপ করছে। ব্যাপার কি! এত উত্তেজিত কেন মেজর জেনারেল? অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোন অ্যাসাইনমেন্টে জড়িত হয়ে পড়লে এবং মারাত্মক দুর্ভাবনার মধ্যে থাকলে ওর কপালের ওই শিরাটাকে লাফাতে দেখেছে রানা আগে। কি হয়েছে? নতুন কোন ব্যাপার পাকিয়ে উঠল নাকি? শুড়শুড় করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। ক্রুদ্ধভাবে অপেক্ষা করতে থাকল সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে।

ছাত্র করে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতেই চমকে চাইল রানা রাহাত খানের মুখের দিকে। পাইপটা ধরিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করলেন বৃদ্ধ, তারপর বললেন, 'ভয়ঙ্কর একটা দুঃসংবাদ আছে, রানা। শুনে তুমি খুবই দুঃখ পাবে। আবদুল হাইকে মনে আছে? আমাদের চিটাগাং এজেন্ট? কাল রাতে মারা গেছে সে।'

'আবদুল হাই মারা গেছে!' চমকে উঠল রানা। কিছু ভাবতে পারল না

সে কয়েক সেকেন্ড।

‘হ্যাঁ! ভোর রাতে পাওয়া গেছে নাশটা সাগর-সঙ্গমে,’ শান্ত কণ্ঠে বললেন রাহাত খান।

‘কিভাবে মারা গেছে আবদুল হাই?’

‘সেটা নিশ্চিত করে কলা যাচ্ছে না। সারা দেহ থেকে মাংস খাবলে তোলা। এক-আধজন অভিজ্ঞ লোক বলছে হাঙ্গরের কামড়ের দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে হাঙ্গর এল কি করে বোঝা যাচ্ছে না। মুখটা অবিকৃত আছে অ্যাকুয়া লাং-এর মুখ-ঢাকা মাঝ পুরা ছিল বলে।’

‘অ্যাকুয়া লাং-এর মাঝ...’

‘হ্যাঁ। খুব সম্ভব সাগরে নৈমেছিল সে কাল রাতে অ্যাকুয়া লাং পরে।’

‘কারণ?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘কেন, কি উদ্দেশ্যে যে ও সাগরে নৈমেছিল বোঝা যাচ্ছে না। কাউকে কিছু জানিয়েও যায়নি। ওর ফ্ল্যাটের চাকর বলছে রাত আড়াইটার সময় গাড়ির এঞ্জিন স্টার্টের শব্দ শুনে পেয়ে জানালা দিয়ে আবদুল হাইকে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। গাড়িটা পাওয়া গেছে সাগরের ধারে। যে জায়গায় গাড়িটা পাওয়া গেছে তার আশপাশে মাইল খানেকের মধ্যে নোঙর করা একটা ইয়ট ছাড়া আর কিছুই নেই।’

‘তার মানে ওই ইয়টেই যেতে চেয়েছিল হাই পানির নিচ দিয়ে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘খুব সম্ভব। সন্ধ্যা খানেক হলো এসেছে ইয়টটা খুলনার দিক থেকে।’

‘কাদের ইয়ট ওটা?’

‘গোলাম হায়দারের।’

চমকে চাইল রানা রাহাত খানের চোখের দিকে। কিছুই বোঝা গেল না বৃদ্ধের মুখ দেখে। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে পাইপ টানছেন মেজর জেনারেল। টিপটিপ করছে কপালের শিরাটা।

‘গোলাম হায়দারের ইয়ট!’ নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে গেল রানার মুখ থেকে।

‘হ্যাঁ। বছর খানেক হলো বহু টাকা ব্যয় করে ইটালী থেকে তৈরি করিয়ে এনেছে সে এই ইয়টটা। হাইড্রোফয়েল ক্র্যাফট। টপ স্পীড সিগ্নিটি নটস। কিন্তু কেউ ওকে পঁচিশের বেশি স্পীড তুলতে দেখেনি।’

‘কিন্তু এই ইয়টের সঙ্গে আবদুল হাইয়ের মৃত্যুর কি সম্পর্ক, স্যার?’

‘ওই ইয়টের কাছেই সাগর-সঙ্গমে পাওয়া গেছে ওর মৃতদেহ—আপাতত এটুকু ছাড়া আর কোন সম্পর্কের কথা জানা নেই। তোমাকে বের করতে হবে বাকিটুকু। আজই সন্ধ্যার ফ্লাইটে চিটাগাং যাচ্ছ তুমি।’

আচ্ছা! তাহলে এই ব্যাপার! এটা আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট! আবার সেই চিটাগাং। দ্রুততর হলো রানার হার্ট বিট। গোলাম হায়দারের চেহারাটা মনে পড়ল ওর। আসছি আমি গোলাম হায়দার, দাঁড়াও তুমি। হয়তো ওর সাথে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্কই নেই, কিন্তু গতরাত্রির উত্তেজনাপূর্ণ কেলার পর

যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ওর কথাই মনে পড়ল রানার বারবার করে। ওর শেষ কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ল ওর—টাকাগুলো তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলো, মাসুদ রানা। কথাগুলোর মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা ইঙ্গিত আছে, শাসানি আছে।

‘চিটাগাং-এ আবদুল হাইয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি, স্যার?’

‘বিশেষ কিছুই না। ইদানীং চিটাগাং-এ ভারতীয় গুপ্তচরদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ওর একটা রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। তাদের নিয়েই ছিল আবদুল হাই। কোথাও ইয়টের উল্লেখ নেই।’ আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ পাইপ টেনে বললেন, ‘ইয়টের কাছে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে বলেই যে গোলাম হায়দারই এর জন্যে দায়ী, এমন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। আর লোকটার ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির কথাও এই সাথে স্মরণ রাখা দরকার। অথবা ওকে জ্বালাতন করলে আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্টকেই অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিতে পারে ও। হৈ-টচ পড়ে যাবে সারা দেশে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার আরম্ভ করে দেবে পত্রিকাগুলো। কাজেই, খুব সাবধানে এগোতে হবে তোমাকে। রীতিমত প্রমাণ সংগ্রহ না করে, সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত না হয়ে ওর বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না।’

‘আপনার কথায় কিন্তু মনে হচ্ছে, স্যার, এ ব্যাপারে ও-ই যে দায়ী তাতে আপনার নিজের কোন সন্দেহ নেই।’

‘আমার সন্দেহে কিছুই এসে যায় না,’ বললেন রাহাত খান। ‘প্রমাণ চাই। কিন্তু খুব সাবধান, রানা। টাকাগুলো খরচ করবার জন্যে খুব বেশি সময় দেবে না তোমাকে গোলাম হায়দার।’

রানা বুঝল, সেই কথাটা স্মরণ রেখেছেন মেজর জেনারেল। ওঁর মনেও দাগ কেটেছে কথাটা।

‘ভাল কথা,’ আবার কথা বলে উঠলেন বুদ্ধ, ‘আমি অনেক ভেবে দেখলাম, কাল ওই ভাবে ওকে শাস্তি দেওয়া করে ঠিকই করেছে তুমি, রানা। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। খুব সম্ভব এ-ই ওর জীবনের প্রথম পরাজয়। সহজে ভুলতে পারবে না ও এই পরাজয়ের গ্লানি। ভালই হলো, জয় দিয়ে ওর হলো আমাদের। যাও, রেডি হয়ে নাও তুমি। বিকেলেই টিকেট পৌছে যাবে তোমার বাসায়।’

‘গোলাম হায়দার এতক্ষণে নিশ্চয়ই চিটাগাং...’

‘না,’ বাধা দিয়ে বললেন রাহাত খান। ‘ও যাতে তোমার আগে গিয়ে পৌছতে না পারে সেজন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আমরা। কাল সে টিকেট বুক করেছিল আজ সকালের ফ্লাইটের। সীটও ছিল, কিন্তু ওটা ক্যান্সেল করিয়ে দেয়া হয়েছে কায়দা করে। বিকেলের ফ্লাইটে সীট পাওয়া যাবে বলে ভরসা দেয়া হয়েছে—আসলে শেষ মুহূর্তে জানানো হবে ওকে, অনিবার্য কারণবশত...ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর ও যদি আগেই টের পেয়ে গিয়ে ট্রেনে কিংবা স্ট্রেক্টরে রওনা হয়ে যায়, তবু সন্দের আগে পৌছতে পারবে না। আমরা চাই না, ও আগে থেকে চিটাগাং পৌছে গিয়ে তোমার জন্যে ফাঁদ

পেতে বসে থাকুক।' কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে আবার বললেন, 'খুব সাবধানে এগোতে হবে তোমাকে, রানা। আপন নিরাপত্তার দিকে সবসময় খেয়াল রাখবে। গোলাম হায়দারের ক্ষমতাকে ভুলেও আভার-এস্টিমেট করবে না। প্রয়োজন বোধ করলেই স্বাধায প্রোটেকশন নেবে। আর রোজ বিকেলে রিপোর্ট করবে অফিসে। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

'না, স্যার।'

উঠে দাঁড়াল রানা। আবার রাহাত খানের চোখ পড়ল রানার হাতে ধরা চিঠিটার ওপর। লুকোবার চেষ্টা করল রানা চিঠিটা। কায়দা করে আলগোছে পকেটে ফেলবার চেষ্টা করল ওটাকে।

'ওটা কিসের চিঠি, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'কিছু না, স্যার। এই একটা রেজিষ্...মানে, এমনি একটা বাজে কাগজ, স্যার।'

'টাইপ করা মনে হচ্ছে?' আবার প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

মনে মনে অভিসম্পাৎ দিল রানা বৃদ্ধকে। বুড়ো একটা জিনিস ধরলে আর ছাড়ো না কিছুতেই, সব কিছুই জানা চাই তার। বলল, 'না, স্যার...মানে, হ্যাঁ, স্যার। ওটা কিছুই নয়। আমি এখন যাই, স্যার...'

'দেখি?' হাত বাড়ালেন বৃদ্ধ।

প্রমাদ গুনল রানা। সেরেছে! এখন ওটা ওঁর হাতে না দিয়েও উপায় নেই। কম্পিত হাতে বাড়িয়ে দিল সে রেজিগনেশন্ লেটারটা মেজর জেনারেলের দিকে। ভাঁজ খুলে চিঠিতে মনোনিবেশ করলেন তিনি। কাঁচা-পাকা ডুক্ক জোড়া কুঁচকে গেল ওঁর। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা ওঁর মুখের দিকে। বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কাগজের ওপর থেকে এসে স্থির হলো রানার অপরাধী চোখে।

'কি ব্যাপার, রানা? এ চিঠি তোমার কাছে!'

'মানে, আমি...আসলে, স্যার...'

'নাসরীন রেহানার ছুটির দরখাস্ত তোমার হাতে কেন?'

'ছুটির দরখাস্ত? নাসরীনের!' এইবার বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। 'ওটা কি ছুটির দরখাস্ত নাকি, স্যার?'

'কেন, তুমি জানতে না?'

'না, স্যার।' সামনে নিয়েছে রানা ততক্ষণে। 'টেবিলের ওপর ছিল, না দেখেই হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম।'

'ও। তাই বলো। তা দিয়ে দাও ছুটি। তুমি তো চিটাগাং যাচ্ছ, তোমাদের সেকশনেরও কেউ নেই ঢাকায়।' কাজেই এই সুযোগে ছুটি দিয়ে দাও। আমি সই করে দিচ্ছি— সারওয়ারকে দিয়ে সীল করিয়ে নিয়ো।

'কিন্তু, স্যার, ওকে এখন ছুটি দিলে...'

'ওসব কিছু ভেবো না তুমি। যাও, সব গুছিয়ে রেডি হয়ে নাওগে।'

খশখশ করে সই করে দিলেন রাহাত খান দরখাস্তের ওপর। নীরবে বেরিয়ে গেল রানা চিঠি হাতে নিয়ে। ফাইলে মনোনিবেশ করলেন বৃদ্ধ।

ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল রানা। তারপর সোজা চলে এল নিজেই অফিস-কামরায়। বসে আছে রেহানা। চিন্তাশ্রিত রানার চেহারা দেখে এগিয়ে এল সে। সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'মেরেছে?'

কোন জবাব না দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ব্রিফকেসটা তুলে নিল রানা। তারপর ফিরল রেহানার দিকে।

'তোমাকে কি ছুটির দরখাস্ত টাইপ করতে বলেছিলাম?'

'ওহ-হো। ভুলে আমার দরখাস্তটা চলে গিয়েছিল বুঝি? এই যে তোমার রেকর্জিংনেশন লেটার। সরি ফর দ্য মিস্টেক।' রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে আরেকটা কাগজ।

'ওটার আর দরকার নেই। ছিঁড়ে ফেল। বড়ো আসলে বকতে ডাকেনি, ডেকেছিল আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে। ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে তোমার। আমিও যাচ্ছি...'

'চিটাগাং-এ তো? ও তো আমি আগেই জানতাম।' খুশি হয়ে হাত বাড়িয়ে নিল রেহানা ওর ছুটির দরখাস্তটা।

চিঠিটা রেহানার হাতে দিয়েই একটা সর্নেহ হলো রানার। 'তুমি আগেই জানতে মানে? তুমি জানতে যে বকা দেবার জন্যে আসলে ডাকছে না বড়ো আমাকে?'

'হ্যা, জানতাম।'

'তার মানে, জেনেগুনেই আমার হাতে নিজের দরখাস্তটা গুঁজে দিয়েছিলে?'

এই কথার উত্তর দিল না রেহানা। চট করে ঘুরে হাসি চাপল। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে কল, 'চা খাবে, না কফি?'

এগিয়ে এসে রেহানার দুই কাঁধ চেপে ধরল রানা।

'বলো। ইচ্ছে করেই বোকা বানিয়েছ আমাকে?'

'উহ! লাগছে, ছাড়া। কতবার তো অনুন্নয়-বিনয় করে দেখেছি তোমার কাছে, কল হয়নি। এছাড়া আর কি করবে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেলে?'

বুজির খেলায় হেরে গেছে রানা। তীব্র দৃষ্টিতে রেহানার প্রতি কয়েক সেকেন্ড অগ্নিবর্ষণ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

আট

সাগরেই ল্যান্ড করবে নাকিরে, বাবা! না, আরেকটু এগিয়ে গোটা কয়েক নারকেল গাছ উপকে ফকার-ফ্লেগশিপ ল্যান্ড করল পতেঙ্গা এয়ার-পোর্টে। ঠেলে এনে সিঁড়ি লাগিয়ে দেয়া হলো উড়োজাহাজের গায়ে। নেমে এল যাত্রীরা সব একে একে সুন্দরী এয়ার হোস্টেসের নকল মিষ্টি হাসিতে আপ্যায়িত হতে হতে। একটা আটাচি কেস হাতে রানাও নামল সবার সঙ্গে। এগোল ওয়েটিং

রুমের দিকে। লাগেজের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে বিশ মিনিট।

একটা ফাঁটার বোতল হাতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। মেঘের গায়ে অন্তরাগ মাখা। ঠিক এইখানটায় দাঁড়িয়ে প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করেছিল সে অনেক, অনেক দিন আগে। নিজেকে কি নিঃশব্দ রিফ্লেক্স লেগেছিল রানার সেদিন। সূলতাকে কাণ্ডাই রিজার্ভয়েরের সলিল সমাধিতে রেখে ফিরে গিয়েছিল সে ঢাকায়। জীবনটা অর্থহীন মনে হয়েছিল ওর সেদিন। তারপর কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা বয়ে গেল ওর ওপর দিয়ে, কত নারী এল-গেল, জীবনের সর্পিলা অমসৃণ পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে সে নিরুদ্ধশেষের পথে, কত দেশ কত মানুষ দেখে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে, তবু সেই সরল মেয়েটিকে ভুলতে পারল কই? সেদিন ছালা করেছিল চোখ দুটো। আজ ছালা নেই; স্বপ্ন হয়ে রয়েছে সূলতা রানার চোখে।

ট্যাগের নাম্বার মিলিয়ে কাঁধে তুলে নিল একজন পোর্টার রানার সূটকেসটা। বেরিয়ে এল রানা বাইরে। ট্যাগ্নি কি পাওয়া যাবে?

স্টাশ করে শব্দ হলো রানার ডান পাশে। ঘাড় ফিরিয়েই অবাক হয়ে গেল রানা। ইদু মিঞা! স্যালিউট করে দাঁড়িয়ে আছে সে আকর্ষণবিশ্বস্ত হাসি হেসে।

‘হজুর, ঢাকা খেইকা আইলেন বৃজি? ও মিঞা, ঐদিক কই যাও, আমার গাড়িটা পসন্দ অইলো না?’

অবাক হয়ে একবার ইদু মিঞা আর একবার রানার মুখের দিকে চাইল পোর্টার। রানার ইস্তিত পেয়ে ইদু মিঞার গাড়ির দিকেই এগোল সে। মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। এমন একটা রঙচটা ট্যাগ্নিতে উঠছে যখন, বক্শিশ তেমন সুবিধের হবে না।

‘কি ব্যাপার, ইদু মিঞা? তুমি এখানে যে? ঢাকা ছেড়ে চিটাগাং এলে কবে?’

‘আইজই আইছি, হজুর। পাগলের পান্নায় পরছিলাম। উরায় লোইয়া আইছে চিটাগাং। উক্! নন, হজুর, উইঠা পরেন।’

গাড়িতে উঠে বসল রানা। পাঁচ টাকার নোট বক্শিশ পেয়ে খুশি মনে সালাম দিল পোর্টার। বানরের মত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে বসল ইদু মিঞা ড্রাইভিং সীটে। চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। সম্ভারর কাঁটার মত খাড়া চুল ইটালিয়ান স্যানুনে (রাস্তার পাশে ইটের ওপর বসা নাপিতের কাছে) কদম ছাঁট দেয়া, ঢিলা খাকি কোর্তা, বুক পকেট দুটো ফুলে আছে হরেক রকম হাবিজাবি জিনিস ভর্তি হয়ে, ময়লা পাজামা আর পায়ে খাবড়া নাকের লেস-হীন বাটার নটি-বয় শ—রঙটা কালো ছিল না ডার্কট্যান বুঝবার উপায় নেই এখন আর। গাড়ি স্টার্ট দিয়েই মুখ ছুটাল। গাড়িও চলেছে, কিন্তু মুখের চেয়ে কম স্পীডে।

‘আইজ কার মুখ দেইখা যে উঠছিলাম, দিনটা একেরে ছিত্তিছান হোইয়া গেল। ঢাকায় যে কেঁমতে ফিরুম তাই ডাবতছি, হজুর।’

‘কেন, কি হয়েছে?’

‘খুন হইয়া গেছি গা, হজুর। ঠাইট জবো করব আমারে মতির মায়ে। এউগা খবর বি দিয়া আইবার পারি নাই। নয়টার সময় খায়া লোইয়া বাইর আইছি গাড়ি নইয়া খাপ মারবার, ইন্সটানের মোড়ে পরলাম হালায় পাগনের পান্নায়। জিগায়, চিটাগাং যাইবা? সিদা না কইরা দিলাম। কইলে বিস্মাস করবেন না হজুর, পাচটা জিন্না সাবের ফোটু বাইর কইরা দ্যাহাইল।’

‘তার মানে?’ সাগর-সঙ্গমে দাঁড়ানো আবছা হয়ে আসা ইয়টটার দিকে চেয়ে আনমনে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আরে, এইটা বি বুঝলেন না? একসো ট্যাকার লোট। পাস্‌সো ট্যাকা। লালচুটা সামলায়া লইলাম, হজুর। না করলাম। আরও পাচটা লোট বাইর করল হালায়। খামোস খায়া গেলাম। দেমাকটা একেরে গুইরা গেল গা, হজুর, নিজেরে চেক দিবার পারলাম না আর, আয়া পড়লাম।’

রানা একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘খুব দরকার ছিল বোধহয় লোকটার চিটাগাং আসা?’

‘আর কোয়েন না, হজুর। কইলাম মতির মায়েরে এউগা খবর দিয়া যাই, কয় টাইম নাই। জোহর অক্টে বাইত না। গেলে তামাম দুনিয়া খুইজা বেড়াইব, মিটফোট-মেডিকল তেলেসমাং কইরা ফালাইব আমার বিবি। আর কারও মুখে যদি হুনে মায়ালোক পাসিজ্জার লোইয়া চিটাগাং গেছি—তাইলেই তেরটা বাজছে আমার!’ হেড লাইট অন করে দিল ইদু মিঞা।

‘মেয়েলোক নিয়ে এসেছ নাকি তুমি ঢাকা থেকে?’

‘হ হজুর, একেরে সুবাইয়াব মখন খাবসুরাত। আপনের লগে খুব মানাইত, এ কানা হালার লগে মানায় না। বড় খেইল দেখাইছে আইজ্ঞ এ ব্যাটা। ট্যাকা দিছে ঠিকই, মাগার ইঞ্জিনটা একেরে ফিনিস কইরা দিছে। ঢাকায় গিয়াই গুস্তাদের কাছে লৌর পারবার লাগব সাতদিন। পয়লা ফেরি তক্ বড় দিগদারী করছে আমারে— জন্নি চালাও, জন্নি চালাও। ফেরী পারোইতেই আমারে মেম সাবের লগে বইবার কইয়া নিজে ধরল ইশ্টিয়ারিন।’

‘তাই তুমি দিনে?’ তৃতীয় বার পিছন দিকে চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘মানা করছিলাম, মাগার ইমুন চোখ গরম কইরা তাকাইল যে কইলজাটা হগায়া গেল গা, হজুর। কিছু কইবার পারলাম না। আরিস্বাপরে বাপ, কি চালান চালাইল, হজুর, সাত ঘণ্টার রাস্তা উড়াইয়া লোয়া আইল চাইর ঘণ্টায়!’

হঠাৎ একটা কথা মনে এল রানার। গোলাম হায়দার আর রুমানা নয় তো? ইন্সটানেই তো গোলাম হায়দারের বাড়ি। কানা বলছে, সেটাও মিলে যাচ্ছে অনেকটা। স্রুত চিটাগাং পৌছানো অত্যন্ত দরকার—তাও মিলছে। তাইতো! নিজের গাড়ি ছেড়ে গোলাম হায়দার যে ট্যাক্সিতে করে চিটাগাং চলে আসতে পারে একথা তো একবারও ভাবেনি ওরা! ওর প্রকাণ্ড ডজ্জ গাড়িটা বিকেল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে ওর গাড়ি বারান্দায়—কোন

করে জানা গেছে সাহেব বাথরুমে আছেন, সাহেব খাওয়া-দাওয়া করছেন, সাহেব মেমসাহেবের ঘরে, সাহেব ঘুমোচ্ছেন! অথচ বেলা দুটোর মধ্যেই পৌছে গেছে সে চিটাগাং। চতুর্থবার পিছন দিকে চাইল রানা। প্রকাণ্ড কালো শেড্রোলে গাড়িটা সেই একই দূরত্ব বজায় রেখে আসছে পিছন পিছন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তাই হেডলাইট অনু করে দিয়েছে।

‘তুমি আজ যে লোকটাকে নিয়ে এসেছ তার ডান চোখটা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, আর গলায় একটা গোল দাগ আছে, তাই না, ইন্দু মিঞা?’

বিস্মিত চোখে চাইল ইন্দু মিঞা রানার দিকে। ‘আপনে কেমনতে জানলেন, হজুর?’

‘বলছি। তার আগে তোমার একটু কেরামতি দেখাতে হবে, ইন্দু মিঞা। পেছনের ওই কালো গাড়িটা লেগেছে আমাদের পেছনে। সামনের মোড়টা ঘুরেই ফুলস্পীড দেবে। কিছুদূর গিয়েই রাস্তাটা আবার ডাইনে মোড় নিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম মোড়টা ঘুরে কয়েকটা বাড়ি পরেই বাঁয়ে একটা গলি আছে। চট করে ঢুকে পড়বে গলির মধ্যে। ঢুকেই লাইট অফ করে দেবে। ফুলস্পীড দাও এখন।’

মুখের থেকে কথা শেষ হবার আগেই কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। তিন সেকেন্ডে পঁয়ষট্টি ডিগ্রিতে গেল মাইল-মিটারের কাঁটা। মোড়টা দশ গজ থাকতেই ডাবল-ডিক্রাচ করে সেকেন্ড গিয়ার দিল ইন্দু মিঞা। গর্জন করে উঠে আপত্তি জ্ঞানাল এঞ্জিনটা। তারপর ব্রেক পা না ঠেকিয়েই স্টিয়ারিং কাটল সে। রাস্তার ওপর চাকা স্কিড করার একটা বিপী শব্দ কানে এল। কিন্তু এঞ্জিনারোটোরে আরও চাপ দিল সে। সোজা হয়ে গেল গাড়িটা। তিন সেকেন্ড পরেই বাঁয়ে কাটল সে আবার। ফুলবেক চেপে লাইট নিভিয়ে দিয়ে থেমে গেল সে একটা বাড়ির অন্ধকার ছায়ায়। পিছন ফিরে অপেক্ষা করতে থাকল রানা। একটু পরেই পিছনের গাড়িটার এঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল সে—দেখাদেখি স্পীড দিয়েছে শেড্রোলেও। চারটে হেডলাইট জ্বলে ঝুঞ্জছে ওদের। এক সেকেন্ডে পেরিয়ে গেল গাড়িটা গলি-মুখ। শুধু এক ফলক দেখতে পেল রানা। তাতেই পরিষ্কার দেখা গেল শুধু একজন লোক বসে আছে গাড়িটার ড্রাইভিং সীটে, আর কেউ নেই গাড়িতে।

পাঁচ মিনিট চূপচাপ বসে রইল ওরা। তারপর যেন রানার কথাকেই সমর্থন করছে এমনভাবে বলে উঠল ইন্দু মিঞা, ‘হ হজুর, আপনার পিছেই লাগছিল এই হালায়। উই কানা হালায়ে যেই বাড়িতে নামায়া দিছিলাম, উই বাড়িত খারোয়া থাকতে দেখছিলাম এই গাড়িটারে। আপনার লগে দুশমনী আছে নিকি, হজুর, এগো?’

‘না, দুশমনী নেই। তবে এদের কাছ থেকে গোপনে থাকতে চাই আমি।’

এইবার প্রশ্ন করে করে অনেক কথা জেনে নিল রানা ইন্দু মিঞার কাছ থেকে। মেয়েটাকে প্রথমে নামিয়ে দেয়া হয়েছে আঘাবাদে, তারপর আন্দরকিল্লার একটা বাড়িতে গিয়েছিল গোলাম হাফিজার—কয়েক মিনিট পরেই

বেরিয়ে এসে নিয়ে গেছে ওকে চিটাগাং কলেজের কাছে টিলার উপরে একটা বাড়িতে। সেইখানেই টাকা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে সে ইদু মিঞাকে। দুটোর সময় ছেড়েছে গোলাম হায়দার ইদু মিঞাকে। হোটেলের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়েছে ইদু মিঞা গাড়ির পিছন-সীটে। ঘুম থেকে উঠতে বিকেল গড়িয়ে যাওয়ায় কাল সকালে টাকা রওনা দেবে মনে করে শহর দেখতে বেরিয়েছিল। নিজের গাড়ি চড়ে যে একটু বৈড়াবে তার উপায় নেই, গাড়ির ছাতের হলুদ রং দেখেই ডেকে বসল একজন। প্যাসেঞ্জার ছুটে গেল পতেঙ্গা এয়ারপোর্টের। ওকে নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল সে শহরগামী কোন প্যাসেঞ্জারের আশায়। পেয়ে গেল রানাকে।

কাগজের ওপর ম্যাপ এঁকে প্রত্যেকটা বাড়ি ভালমত চিনে নিয়ে গাড়ি ঘুরাতে বলল সে ইদু মিঞাকে। ওর বিবি সাহেবের কাছে আজই সংবাদ পাঠিয়ে দেবে সে ঢাকায় টেলিফোন করে, কথা দিল। মেয়ে লোক প্যাসেঞ্জারের কথা ঘণাক্ষরেও টের পাবে না মতির মা, আশ্বাস দিল।

অনেকটা নিশ্চিত মনে রানাকে পৌঁছে দিল ইদু মিঞা মিস্থা হোটেল। পাঁচতলার দশ নম্বর রুমটা বুক করল রানা। এয়ারকুলার ফিট করা আছে ওই ঘরে।

নয়

এয়ারকুলারের হাই কুল লেখা সাদা বোতামটা টিপে দিয়ে ইঞ্জি-চেষ্টারের ওয়ে পড়ল রানা। এই ঘরের সাথে রানার অনেক পুরানো স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কিন্তু সেগুলোকে মনের পর্দায় ভেসে উঠবার সুযোগ দিল না সে। বর্তমান পরিস্থিতিটা চিন্তা করে দেখতে হবে।

আবদুল হাইয়ের মৃত্যু-সংবাদটা পেয়েই এমন বাস্তবসম্মত হয়ে পাগলের মত গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছে গোলাম হায়দার চিটাগাং-এ। সকালে ওর বুকিং ক্যান্সেল হয়ে যেতে দেবেই বুঝে ফেলেছে সে ব্যাপারটা। ওকেই যে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়েছে তা ও জানে। চিটাগাং-এ পৌঁছে সমস্ত ব্যাপারটা আগে ভাগেই আয়ত্তে আনতে চায় ও। নাকি আরও কোন কারণ আছে এই ভাড়াহাড়ের? আবদুল হাইয়ের সঙ্গে রাহাত খানের যোগাযোগ আছে এটা ওর অজানা নেই, কিন্তু রানার সঙ্গে রাহাত খান বা পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর কি সম্পর্ক তা কি আন্দাজ করে নিয়েছে সে?

আজ রাতেই হোটেলটা পরিবর্তন করতে হবে। কারণ গাড়ি থেকে নেমেই দেখতে পেয়েছে রানা ধীর গতিতে সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দুশো গজ দূরে দাঁড়াল সেই কালো শেড্রোলে গাড়িটা। সামনে ইদু মিঞার গাড়িটা দেখতে না পেয়ে সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল কোথাও,

শহরে ঢোকান পর অনেকটা দূরত্ব বজায় বেখে অনুসরণ করতে হবে তা ওকে শিখিয়ে দিল কে? জেনে ফেলেছে ওরা রানার সত্যিকার পরিচয়? ওদের ডিপার্টমেন্টেই কোন ডাক্তার এজেন্ট নেই তো? ডোমিস্টিক সার্ভিসে তো প্যাসেঞ্জার লিস্ট পাঠায় না—ঢাকা থেকে কেউ লিস্টটা দেখে জানায়নি তো টেলিফোনে? অনেক কিছুই হতে পারে, কাজেই ও-সব চিন্তা বাদ দিয়ে এখন আপাতত কিছু নাস্তা করে বেরিয়ে পড়া দরকার। কিচেনের পাশ দিয়ে নামলে সরু রাস্তা পাবে, চেনাই আছে ওর—সামান্য মেক-আপ করে নিলে টের পাবে না কেউ।

সুটকেসটা খুলে গোটা কতক প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে নিয়ে এগিয়ে গেল রানা ড্রেসিং টেবিলের দিকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যত্নের সঙ্গে পাল্টে নিল সে মুখের চেহারাটা। কানচে রঙের ট্রেটনের স্যুটটা পরে নিয়ে এবার দ্রুত কয়েকবার শোলডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করা প্র্যাকটিস করল। সংক্ষিপ্তভাবে পরীক্ষা করল সে যন্ত্রটা, তারপর নিশ্চিত মনে ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে। এবার চারটে বালিশ আর দুটো কব্জকে বিছানার ওপর মানুষের মত করে শুইয়ে ঢেকে দিল সে চাদর দিয়ে। মাথার কাছে ট্রানজিস্টরটা খুলে দিতেই আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল কোন মহিলা। রানা বুঝল, রেডিও চিটাগাং থেকে আধুনিক বাংলা গান হচ্ছে। মৃদু হেসে সুটকেসের তালার ওপর ট্যালকম পাউডার ছিটিয়ে দিল সে খানিকটা, তারপর সন্তুষ্ট চিন্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছোট একটুকরো কাগজ চার ভাঁজ করে কজার কাছে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল রানা। একবার খুলে পরীক্ষা করে দেখল দরজাটা খুলতেই সত্যি সত্যি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, দরজা খুললেই পড়ে যাচ্ছে টুকরোটা। এবার তাল লাগিয়ে দিয়ে লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল সে। না। সিঁড়ি দিয়ে নামাই ভাল, লিফট-ম্যান সন্দেহ করতে পারে।

দোতলার নেমে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে। দোতলাতেই মিস্টার ডাইনিং-রুম ও রেস্টোরাঁ। প্রশস্ত হল ঘরটায় এখন থেকেই লোকজন জমতে শুরু করেছে। অনেকগুলো টেবিল ঘিরে জমে উঠেছে গল্প-গুজব আর চা-স্ম্যাকসের আসর। ওয়েটাররা ছুটোছুটি করছে ব্যস্ত পায়ে। একটা ছোট টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল রানা। হাফডজন সামুসা আর এককাপ কফির অর্ডার দিয়ে ঘরের প্রত্যেকটি লোককে পরীক্ষা করল সে একে একে। সন্দেহজনক একটি চেহারাও চোখে পড়ল না ওর। কফি খেতে খেতেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলল সে। প্রথমই যাবে সে আঘাবাদের সেই বাড়িটাতে। ওখান থেকে যাবে আবদুল হাইয়ের ফ্ল্যাটে। তারপর চিন্তা করা যাবে কি করা যায়।

বিল ঢুকিয়ে দিয়েই জেন্টল্ লেখা পর্দা টাঙানো ছোট একটা বাথরুমের দিকে এগোল রানা। কিন্তু ওর ভিতর না ঢুকে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ছোট বারান্দায়। সরু একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। কয়েক সেকেন্ডেই রান্নাঘরের পাশে চলে এল রানা। একটা সরু গলি দিয়ে বিশ গজ এগোলেই পড়বে গিয়ে বড় রাস্তায়।

প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল রানা গলিমুখ দিয়ে—ভাবটা, যেন অন্য কাজ করতে ঢুকেছিল সে ওই গলিতে।

অসংখ্য লোক হেঁটে যাচ্ছে ফুটপাথ দিয়ে। মিশে গেল রানা জনারণ্যে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সোজা বিপণী বিতানের সামনে। কেউ অনুসরণ করছে না তো? রাস্তা উপকণ্ঠে বিপণী বিতানে ঢুকে পড়ল রানা নিঃসন্দেহ হবার জন্যে। উজালা বুকস্টলে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটির ছলে দেখে নিল চারিটা পাশ ভাল করে। না কেউ অনুসরণ করেনি। নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এসে হাঁটতে থাকল সে ফুটপাথ ধরে। প্রায় দুশো গজ হাঁটবার পর একটা বেবি-ট্যাক্সি ডাকল রানা। রেডিও অফিসের দিকে চালাতে বলল ওকে।

প্রকাণ্ড ছয়তলা বাড়িটা। গোলাম চেষ্টার। পাঁচশো গজ থাকতেই ভাড়া চুকিয়ে বিদায় দিয়ে দিল রানা বেবি-ট্যাক্সিটাকে। তারপর হাঁটতে থাকল মন্থর পায়ে। রাত পোনে আটটাতেই বেশ নির্জন হয়ে এসেছে এলাকাটা। বাড়িটা গোলাম হায়দারের। একতলায় ব্যাঙ্ক আছে একটা—গেট লাগিয়ে দিয়ে ভেতরে বাতি জ্বলে হিসাব-কিতাব মেলাতো হচ্ছে। দোতলা এবং তেতলাটা অন্ধকার—ইনশিওরেন্স কোম্পানির অফিস—বন্ধ করে চলে গেছে সবাই সাড়ে পাঁচটাতেই। চারতলাটা ভাগাভাগি করে ভাড়া নিয়েছে নামজাদা এক ট্র্যাভেল এজেন্ট আর ট্যুরিস্ট ব্যুরো। সব ক’টা বাতি জ্বালা। রানা জানে পাঁচতলায় গোলাম হায়দারের নানা মোটরসের অফিস—জাপানী কয়েকটা গাড়ির এজেন্সী নিয়ে অফিস খুলেছে সে এখানে। আর ছয়তলার ওপর বারোটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করেছে সে আধুনিক ফ্যাশানে। গগনচুম্বী ভাড়া। সাতদিনে পাঁচ হাজার। কিন্তু সাধারণত খালি থাকে না একটা ঘরও। বিরাট বিরাট সব পরসায়োয়াল লোক আসে এখানে হপ্তাখানেক এজায় করবার জন্যে। মন্দ লোকে বলে, তুলনাহীন লাঞ্চ এবং ডিনার তো আছেই, সাত দিনে সাত রকমের মদ এবং আরও নানা রকম আনন্দ সাপ্রাই দেওয়া হয় এখানে বিনা পরসায়—একটা কস্ট নেই। এখানেই নামিয়ে দিয়েছে সে রুমানাকে।

গেটের দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সানাম করল।

‘সীট আছে নাকি হে?’ মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল রানা উপর দিহক ইঙ্গিত করে।

‘হামকো মালুম ন্যহি, হাজুর,’ গভীর মুখে বলল বন্দুকধারী দারোয়ান।

এগিয়ে গিয়ে সেন্স অপারেটেড লিফটে উঠল রানা। সিঁথ লেখা বোতামটা টিপে দিল। জায়গাটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিতে চায় সে। এছাড়া করবারও কিছু নেই আজ। কাল সকাল থেকে আরম্ভ হবে ওর সত্যিকার ইন্ভেস্টিগেশন।

লিফট থেকে বেরিয়েই চণ্ডা করিডর। করিডরের শেষ মাথায় উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে একটা ঘরে। অ্যাংলো একজন মহিলা বসে আছে একটা ডেস্ক সামনে নিয়ে এইদিকে মুখ করে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। একটু মাংসল বাড়ন্ত দেহ। ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না, কিন্তু রংটা পেয়েছে বাপের, রীতিমত ফর্সা।

এগিয়ে গেল রানা।

‘সরি। এ মাসে আমাদের একটা সীটও খালি নেই। মে-র ফাস্ট উইকের জন্যে ফুল অ্যাডভান্স দিয়ে বুক করতে পারেন,’ রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল মেয়েটা।

‘বসতে পারি?’ জিজ্ঞেস করল রানা মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে।

‘ওহ, শিওর। টেক এ সীট।’ লাল ঠোটে চেপে ধরল সিগারেটটা।

চেয়ারে বসে ভুবন ভোলানো হাসি হাসল রানা। ‘দেখুন, মে মাসের পয়লা সপ্তাহে আমি থাকব কেপটাউনে। আমার জাহাজ চিটাগাং পোর্ট ছেড়ে যাচ্ছে বাইশ তারিখে। আর কোনদিন হয়তো এখানে ফিরব না। আজই কোন ব্যবস্থা করা যায় না? টোকিও থেকে খুবই সুনাম শুনেছি আপনার এই অ্যাপার্টমেন্টের।’

‘আমার কোথায়?’ আর একটু গোলাপী দেখাল যুবতীর রক্ত মাথা গাল। ‘আমি চাকরি করি এখানে। তুমি তাহলে নাবিক একজন—সেইলার? দেশ কোথায় তোমার?’

‘রিও ডি জেনারিও। ব্রাজিল। তোমার?’

‘আমি এদেশী। অ্যাংলো। কিন্তু তোমাকে চেনা-চেনা লাগছে কেন বলতে পারো?’

‘হয়তো পূর্ব জন্মে চেনাজানা ছিল—কে জানে!’

হাসল মেয়েটা। বলল, ‘আমি দুঃখিত—সীট নেই। ভাল কথা, এখানকার রেন্ট জুনো তো? ফাইভ থাউজ্যান্ড আ উইক।’

‘বলো কি! আমার পুরো পাঁচ মাসের বেতন! যাহ, ঠাট্টা করছ।’

‘তোমার কাছে তাই মনে হচ্ছে? তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে, সাতদিনে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হবে?’

‘না, অত কম না। ভেবেছিলাম বড় জোর চার-পাঁচশো টাকা। বাপ.রে, পা...চ হাজার! তাহলে মানে মানে কেটে পড়তে হয়। ওদিকে গর্ব করে বন্ধু-বান্ধবদের বলে এসেছি... ছি-ছি।’

‘কি বলে এসেছ?’ মৃদু হাসি ফুটে উঠল যুবতীর মুখে।

‘জাহাজের সবাই মুখ টিপে হেসেছিল, তখন বুঝিনি। ছি-ছি, বড় লজ্জার মধ্যে...’

‘শোনো, যুবক। লজ্জার কিছু নেই। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো গিয়ে, জাহাজের প্রত্যেকটি লোকই হয়তো একবার করে ঘুরে গেছে এখান থেকে বিফল হয়ে।’

‘সন্তব,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘তুমি কি এখানেই থাকো?’

‘আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে এখানে। আমরা দুই বোন থাকি।’

‘কি নাম তোমার?’ জিজ্ঞেস করল রানা নরম কণ্ঠে।

‘আইভরী গিলবার্ট। তোমার?’

‘আমার নাম স্যামুয়েল। আজ আমাকে ন’টার মধ্যেই জাহাজে রিপোর্ট করতে হবে। উঠি তাহলে, কেমন?’ উঠে দাঁড়াল রানা। ‘তোমাকে ধন্যবাদ। শুভবাই।’

‘শুভবাই।’

সিড়ি বেয়ে নামতে আরম্ভ করল রানা। পঞ্চম তলাটা দেখেই চলে যাবে সে আবদুল হাইয়ের ফ্ল্যাটে। সিড়ি দিয়ে নেমে এসে পঞ্চম তলায় কিছু দেখতে পেল না রানা। তাল মেরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে গেছে ওরা। অন্ধকারে অচেনা বাড়িতে চোর হিসাবে ধরা পড়বার কোন আশই দেখা গেল না রানার মধ্যে। মিছেমিছি সিড়ি ডাঙতেও আর ইচ্ছে হলো না ওর। লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ওপরে উঠছিল লিফট, চলে গেল ছয়তলায়। কেউ উঠল কিংবা নামল লিফট থেকে। বোতাম টিপে দিল রানা। দরজা খুলতেই ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে লিফটের কোণে। লম্বায় বড়জোর চার ফুট তিন ইঞ্চি। যেমন বেঁটে তেমনি গুনকনো, আর তেমনি মিশমিশে কালো। খোঁচা খোঁচা গোপ-দাঁড়ি সারা মুখে। চার পাচদিন ক্ষুর পড়েনি গালে। ঝাড়ুদার হবে বোধহয়। গোপনে লিফট ব্যবহার করছিল—এখন রানা উঠতেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। গলায় কালো একটা কমফোর্টার প্যাচানো।

গাউন্ড-ফ্লোরের বোতাম টিপে দিয়ে ফিরল সে সহযাত্রীটির দিকে। জড়সড় হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা আর অজুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে। হঠাৎ লম্বা করল রানা কাঁপছে লোকটা টেনে ছেড়ে দেয়া তানপুরার তারের মত। ছুটে এসে রানার একটা হাত ধরল সে।

‘খো-খো-খোদার কসম লাগে, আমাকে... দোহাই লাগে আপনার...’

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া রক্তশূন্য মুখে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। কথাটা শেষ করতে পারল না, আটকে গেল মাঝপথেই। পড়ে যাচ্ছে লোকটা।

‘ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ করছে?’ চট করে লাল বোতামটা টিপে দিল রানা। থেমে গেল লিফট মাঝপথে।

এবার মুখের চেহারাটা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেল লোকটার। দুই হাত মাথার ওপর তুলে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সে।

‘শুয়ে পড়ে!’ বলল রানা উত্তেজিত কণ্ঠে। অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে লোকটা। গৌ-গৌ আওয়াজ বেরুচ্ছে ওর গলা দিয়ে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। কমফোর্টারটা আলগা করে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল রানা। কিন্তু গলার কাছে হাত নিয়ে যেতেই তীব্র বিকৃত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। এক ঝাকিতে সরিয়ে নিল মাথাটা।

‘মা-না-মা!! মেরো না!! পায়ে পড়ি তোমার—ছেড়ে দাও আমাকে। আর কোনদিন করব না! কসম খোদার...’

‘কী যা-তা বলছ তুমি? কি হয়েছে তোমার?’ কথাটা বলেই আবার গাউন্ড-ফ্লোরের বোতাম টিপে দিল রানা। খোলা বাতাস দরকার এখন এই

লোকটার। পকেট থেকে ক্রমাল বের করে বাতাস করতে থাকল ওর মুখে। লিফট থেমে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল আপনা-আপনি। বলল, 'তুমি বরং এখানেই থাকো। দারোয়ানটাকে ডেকে আনছি আমি। দেখি, আশপাশে কোনও ডাক্তার থাকলে...'

কথা শেষ হবার আগেই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে রানার কজি চেপে ধরল লোকটা। এক হাতে ওর পিঠটা জড়িয়ে ধরল রানা যেন পড়ে না যায়। পরপর করে সর্বশরীর কাঁপছে লোকটার।

'না, না কাউকে ডাকবেন না, স্যার। আমি ঠিক আছি। কিছু হোই নিকো আমার,' একটু সামলে নিয়ে বলল সে।

'তোমাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।'

'একুনি...একুনি ঠিক হয়ে যাবে, স্যার।' রানার হাতের ওপর ভর দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকল লোকটা। এতক্ষণে কাছ থেকে ওর মুখটা দেখতে পেল রানা।

হঠাৎ রানা বুঝতে পারল। ভয়ঙ্কর ভয় পেয়েছে লোকটা। মৃত্যুভয়। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে ওর কপালে। দেহের কাঁপুনিটা ধামাতে পারছে না সে চেষ্টা করেও। আতঙ্কিত দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করছে সে এদিক-ওদিক। ব্যাপার কি? কে এই লোকটা? এই বাড়িতেই বা ঢুকল কেন? ভয়ই বা পেল কেন? চোর-টোর নয়তো? যাই হোক, একে নিয়ে সময় নষ্ট করলে চলবে না। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে রানার।

'আমাকে একা ছেড়ে যাবেন না, স্যার। দয়া করে আপনার সাথে নিয়ে চলুন,' কথার মধ্যে ক্যালকেশিয়ান টান।

'বেশ, তাই চলো। কিন্তু কি করে বুঝলে যে আমাকে বিশ্বাস করা যায়?'

গোল গোল চোখ করে চাইল লোকটা রানার দিকে। 'একই লিফটে নামলুম অতছ বেঁচে আছি এখনও, আপনাকে কি করে শত্রু ভাবি, বলুন?'

'শত্রু? কিসের শত্রু?'

'আমি মনে করেছিলুম, আপনি বুঝি ওদের...' থমকে থামল লোকটা কথার মাঝখানে। মৃদু গুঞ্জন তুলে ওপরে রওনা হলো খালি লিফট। 'চলুন, স্যার। আসচে ওরা। বাঁচান, স্যার, আমাকে!' কঁপে উঠল ওর কণ্ঠস্বর শেষের দিকে।

বিরক্ত হয়ে উঠল রানা লোকটার ওপর। হয় পাগল, নয়তো নেশাখোর! আচ্ছা ফিলোপন-এ আসক্ত নয় তো লোকটা? কোথায় যেন একটা লম্বা আটিকেল পড়েছিল সে একবার এই জাপানী ওষুধ সম্পর্কে। এই নেশাখোররা সবসময় সামনে-পিছনে শত্রু কল্পনা করে। এদের বিশ্বাস, প্রত্যেকটা লোক সব সময় সুযোগ খুঁজছে, সবসময় মতলব আঁটিছে ওদের খুন করবার। রাত্তায় চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে ফুর, রেড বা ছুরি হাতে রুখে দাঁড়ায় ওরা পিছনের নিরীহ পথচারীর বিরুদ্ধে। এই লোকটাও সে রকম কিছু

একটা নয় তো?

যাই হোক, বেরোনো' ওরও দরকার। এগোল রানা গেটের দিকে। ভয়ে ভয়ে রানার গায়ের সাথে প্রায় সঁটে বেরিয়ে এল লোকটা বাড়ির বাইরে। রানা লক্ষ্য করল উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করল ঠিকই, কিন্তু দারোয়ানের চোখ দুটোতে তীব্র একটা কৌতূহল ফুটে উঠেই গিলিয়ে গেল। আরও লক্ষ্য করল তিনজন লোক বেরোল লিফটের দরজা দিয়ে। দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ওরা গেটের দিকে।

চঞ্চল হয়ে উঠল রানার সঙ্গীটি। ফুটপাথে পৌছেই জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি আছে, স্যার, আপনার?'

'না। কি হয়েছে, এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

দমে গেল লোকটা গাড়ি নেই শুনে। চঞ্চল পায়ে এগোল সে রানার গায়ের সাথে সঁটে। বাম পা-টা একটু ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে হাঁটছে লোকটা। মাঝে মাঝে ঝট করে পিছনে ঘুরে চাইছে সে। পিছনে একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হতেই রানার কোটের আন্তিনটা খামচে ধরল। রানাও পিছনে ফিরে চাইল একবার। দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে তিনজন লোক ওদের দিকে। বেশ অনেক কাছে চলে এসেছে ওরা। এই লোকটার পিছনেই যে ওরা লেগেছে তাতে সন্দেহ রইল না রানার। বিপদ টের পেল রানা। পিছনের তিনজন লোকই সশস্ত্র। আচ্ছা, 'এটা ওকে সুদ্ধ কিডন্যাপ করবার পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান নয়তো? লোকটা অভিনয় করছে না তো? না। অতি বড় অভিনেতার পক্ষেও কপালের ওই ঘাম আর মুখের ওই ফ্যাকাসে ভাব আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটখাট স্কীপ দুর্বল এই লোকটা কি করেছে ওদের?'

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একটা কালো ইস্যু বেল্টেট চলে গেল ওদের পাশ কাটিয়ে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে লোকটা বলল, 'গিগ্... গিগ্... গিলটি মিঞা। এসে গেল, স্যার, কি করব এখন, মেরে ফেলবে আমাকে ওরা...' কাছে চলে এসেছে পিছনের পদশব্দ। ককিয়ে উঠল গিলটি মিঞা। দুই হাঁটু ঠকাঠক বাড়ি ঝাচ্ছে ওর।

'শোনো, গিলটি মিঞা। তোমার কোন ভয় নেই। আরেকটু কাছে এলেই আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে আচমকা আক্রমণ করে বসব। তুমি লাইট পোস্টটার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে। বুঝলে? ভয় পেয়ো না।'

'পৈস্তল আছে, স্যার, ওদের কাছে।'

'আছে, কিন্তু বের করবার সময় পাবে না। আর ও-জিনিস আমার কাছেও আছে একটা। দরকারের সময় ওদেরগুলো বেরোবার অনেক আগেই বেরিয়ে যাবে আমারটা। আহা, আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে কেন? হাত ছেড়ে দাও...'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! তিন গজের মধ্যে এসে গেছে পিছনের লোকগুলো। হঠাৎ লাফিয়ে রানার সামনে চলে গিয়ে নিজেদের আড়াল করল

গিলটি মিঞা ওদের থেকে। আর এগোনো অসম্ভব। আর চিন্তা করবারও সময় নেই। হঠাৎ ঝট করে ঘুরেই ঝাপিয়ে পড়ল রানা মাঝের লোকটার ওপর। আচমকা ঘুসি খেয়েই চিং হয়ে পড়ে গেল লোকটা সিমেন্ট করা ফুটপাথের ওপর। দ্বিতীয় জন হাঁটুর উপর খেলো প্রচণ্ড এক লাথি। ওখানটায় পয়ষাটি পাউন্ড ওজনের একটা লাথি পড়লেই হাঁটু ডিজলোকেট হয়ে যায়—রানার লাথির ওজন হলো কমপক্ষে একশো পঁষাটি পাউন্ড, ফলে তীক্ষ্ণ একটা আত্ননাদ করে বসে পড়ল এই লোকটাও। তৃতীয়জন বিশ্বয়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ঝাপিয়ে পড়ল রানার ওপর। লোকটা প্রকাণ্ড। পড়ে গেল রানা ওর ধাক্কায়। বুকের ওপর ডাইড দিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, রানা গড়িয়ে সরে যেতেই পড়ল শানের ওপর। সাথে সাথেই ঘাড়ের পিছনে পড়ল কারাতের এক রন্দা। মুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমজনের কজির ওপর লাথি মারল রানা। বিশ গজ দূরে ছিটকে পড়ল ওর হাতে ধরা রিভলভারটা। বাকি দু'জনের শোলডার হোলস্টার থেকে দ্রুত বের করে নিল রানা দুটো রিভলভার। দুই হাতে দুটো রিভলভার ধরে সোজা তাক করল দু'জনের বুকের দিকে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লোকটাকে ধর্তব্যের বাইরে রাখল সে আপাতত।

‘গিলটি মিঞা! ওই রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে এসো। তারপর ব্যবস্থা করছি ব্যাটারদের।’

কিন্তু কোথায় গিলটি মিঞা! পিছন ফিরে চেয়ে দেখল রানা প্রায় চল্লিশ গজ দূরে প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে গিলটি মিঞা। বাম পায়ে ঝোঁড়াচ্ছে বলে দৃশ্যটা করুণ হলো হাস্যকর দেখাচ্ছে ওর এই পলায়ন। হঠাৎ জ্বলে উঠল দুটো হেডলাইট গিলটি মিঞার ঠিক দশ গজ সামনে। থমকে টাঁড়াল সে দুই হাত ওপর দিকে তুলে। অসহায় দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল সে একবার পিছন ফিরে। তারপর আবার ডান ধারে দৌড় লিতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে। রানা বুকল দেরি হয়ে গুগছে। এখন আর ছুটে গিয়েও কিছু করতে পারবে না সে। দু'পাশ থেকে দু'জন চেপে ধরল গিলটি মিঞার দুই হাত, তারপর শূন্যে তুলে বুলাতে বুলাতে নিয়ে গিয়ে ভরল ওকে গাড়ির ভিতর। রানার সামনে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ভোজবাজির মত ঘটে গেল ব্যাপারটা। কিছু বলতে পারল না সে। দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ এল। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা রানার নাকের ডগা দিয়ে। এক বলক দেখতে পেল সে, ছটফট করছে গিলটি মিঞার অপরিস্ফুট দেহটা অন্যান্য আরোহীদের মদু পীড়নে। চোখ ফিরাল রানা ফুটপাথের ওপর পড়ে থাকা তিনজন গুটার দিকে। আপাতত কিছু করবার নেই রানার। বিশ গজ তফাতে মাটিতে পড়ে থাকা রিভলভারটা তুলে নিল সে। হাঁটু মচকে যাওয়া লোকটা কিছুই করতে পারবে না, আর তৃতীয় লোকটা এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাস্তায়ও লোকজন নেই। কাজেই এখন নিরাপদে সরে যাওয়ার একমাত্র উপায় প্রথম লোকটাকে অচল করে রেখে যাওয়া। পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল রানা লোকটাকে দশ বারো হাত তফাতে। তারপর জুজুংসুর একটা সহজ পাঁচ

দিয়ে এমন ভাবে আটকে দিল ওর হাত-পা যে অন্য কেউ এসে সাহায্য না করলে ছুটবার ক্ষমতা রইল না আর। কেউ এসে ওকে মুক্ত করবার অনেক আগেই পগার পার হয়ে যাবে সে।

আবদুল হাইয়ের লাল ওপেল রেকর্ডটা নিয়ে রাত সাড়ে দশটায় ফিরে এল রানা হোটেল মিস্থায়।

দশ

পরদিন সন্ধ্যায় চিটাগাং সেইলারস্ ক্লাবে একা বসে ডিনার খাচ্ছে রানা। ক্লাবঘর ছোট, কিন্তু মেসার অনেক। বিরাট প্রাক্ষণটা তাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে নেয়া হয়েছে। মস্ত তিরপল দিয়ে তাঁবুর মত করে সামিয়ানা টাঙানো। জায়গায় জায়গায় হরেক রকম ফুলের কেয়ারী—তাছাড়া নিচে ঘাসের কার্পেট। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে টেবিল পাতা। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ—নানান রঙের বালব জ্বলছে। কোথাও আলো, কোথাও ছায়া, সবটা মিলে এক স্বপ্নিল পরিবেশ। এক কোণে একা বসে ডিনার খাচ্ছে রানা। নানান রকম জুয়ের আড্ডা বসবে এই তিরপলের নিচে রাত নটার পর। এখন থেকেই টেবিল রেডি করছে জনাকয়েক ওয়েটার। রানা শুনেছে এখানে আসে গোলাম হায়দার। অপেক্ষা করছে সে তার জন্যে।

কয়েকটা ব্যাপারে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে রানা। গত রাতে হোটеле ফিরেই টের পেয়েছিল সে যে ওর অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে প্রবেশ করেছিল একাধিক লোক। বিশেষ সাবধানতাও অবলম্বন করেনি তারা। চার ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা হয়তো লক্ষ্যই করেনি—পড়ে ছিল সেটা চৌকাঠের উপর, কিন্তু সুটকেসের তালার কাছে এবং মেঝেতে ট্যালকম পাউডার নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিল ওদের, কেয়ার করেনি। সুটকেসের ভিতর জিনিসপত্র সব লুণ্ঠও হয়ে আছে—কিন্তু ঝোয়া যায়নি কিছুই।

সুটকেসের মধ্যে জিনিসপত্র ওছিয়ে নিয়ে পোর্টারের অপেক্ষা না রেখেই হাতে তুলে নিয়ে চলে এসেছিল রানা লিফটের কাছে। বোতাম টিপতেই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ লেখা নম্বরগুলোয় হলুদ বাতি জ্বালতে জ্বালতে উঠে এসেছিল লিফট উপরে। দরজা খুলে যেতেই পা বাড়িয়ে লিফটে উঠতে গিয়ে আঁতকে ওঠা ঘোড়ার মত লাফিয়ে সরে এসেছিল রানা। ফাঁকা! তলা খসিয়ে রাখা হয়েছে লিফটের! কোনমতে বাম হাতে দেয়াল ধরে টাল সামলে নিয়েছে রানা, নইলে ছাতু হয়ে যেত নিচে পড়ে। ধূপিশুণ্ডের ক্রিম্যাটা আবার স্বাভাবিক হতেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বিল চুকিয়ে চলে গিয়েছিল সে আবদুল হাইয়ের ফ্ল্যাটে। আজ সকালে পেপার খুলেই চোখে পড়েছে ওর খবরটা। হেডিং—‘মিস্থা হোটেল টাইম বম্ব।’ তারপর সবিস্তারে লেখা হয়েছে, রাত

বারোটা পঁচতলার ওপর দশ নম্বর রুমে এক প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের কথা। কপাল ভাল, পালিয়ে এসেছিল রানা।

হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল টেবিলের ওপর। ঝট করে ঘুরেই দেখল রানা তিন হাত তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোলাম হায়দার। জুলজুল করছে ওর নষ্ট চোখটা রানার দিকে চেয়ে।

‘চমকে দিয়ে খাওয়াটা নষ্ট করে দিলাম না তো? বসতে পারি?’ রানার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সামনের চেয়ারে বসে পড়ল গোলাম হায়দার। মচমচ করে উঠল চেয়ারটা। ‘তারপর? চিটাগাং বেড়াতে এলেন বুঝি?’

‘জি, না। একটু কাজে এসেছি। তা আপনি হঠাৎ কোথেকে?’ এক টেবিল স্পুন-ফুল বিরিয়ানি পুরে দিল রানা মুখের ভিতর, সেই সাথে গেল বড় সাইজের এক টুকরো খাসীর মাংস। সেগুলোকে একটু বাগে এনে আবার বলল, ‘ভাল কথা, আপনার সেদিনকার চেকটা ডিজ-অনার হয়নি, ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট পেয়েছি। ধন্যবাদ সেজন্যে।’

জবাব দিল না গোলাম হায়দার। ফাইভ ফিফটি ফাইভের টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর স্থির নিম্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল রানা। দু’কাপ কফির অর্ডার দিল। তারপর সোজাসুজি চাইল গোলাম হায়দারের নষ্ট চোখের দিকে।

‘কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন জবাব নেই। তেমনি নিম্পলক চোখে চেয়ে রইল সে এক মিনিট। যেন সম্মোহন করছে। মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখটা। অস্বস্তি বোধ করল রানা। হঠাৎ যেন ধ্যানভঙ্গ হলো এমনি ভাবে মাথা ঝাকাল গোলাম হায়দার, ফিরে এল মুখের স্বাভাবিক রং। এতক্ষণ পর দ্বিতীয় টান দিল সে সিগারেটে।

‘এপ্রিলের নয়, আঠারো বা সাতাশ তারিখে ঠিক বেনা বারোটা আপনার জন্ম। তাই না, মিস্টার মাসুল রানা?’

মুদু হাসল রানা। ‘ঠিক বারোটা কিনা জানি না, অত আগের কথা মনে নেই। তবে তারিখটা ঠিকই আন্দাজ করেছেন—এপ্রিলের নয়। কেন, কি ব্যাপার? জ্যোতিষ-বিদ্যা জামা আছে নাকি আপনার?’

‘আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না বুঝি আপনি?’ জিজ্ঞেস করল গোলাম হায়দার।

‘বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করি না। এ-নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও।’

‘সেটাই স্বাভাবিক। মেঘ-এর জাতকের বৈশিষ্ট্যই এই। কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যে এই শাস্ত্রে আপনার বিশ্বাস এনে দিতে পারি আমি।’ তাঁর দৃষ্টিতে চাইল সে রানার মুখের দিকে।

‘চেষ্টা করে দেখুন,’ মুদু হাসল রানা।

‘নয় বছর বয়সে প্রথম মানুষ খুন করেছেন আপনি।’ চমকে উঠল যেন

একটা নয় তো?

যাই হোক, বেরোনো ওরও দরকার। এগোল রানা গেটের দিকে। ভয়ে ভয়ে রানার গায়ের সাথে প্রায় সঁটে বেরিয়ে এল লোকটা বাড়ির বাইরে। রানা লক্ষ্য করল উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করল ঠিকই, কিন্তু দারোয়ানের চোখ দুটোতে তীব্র একটা কৌতূহল ফুটে উঠেই গিলিয়ে গেল। আরও লক্ষ্য করল তিনজন লোক বেরোল লিফটের দরজা দিয়ে। দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ওরা গেটের দিকে।

চঞ্চল হয়ে উঠল রানার সঙ্গীটি। ফুটপাথে পৌছেই জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি আছে, স্যার, আপনার?'

'না। কি হয়েছে, এও ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

দমে গেল লোকটা গাড়ি নেই শুনে। চঞ্চল পায়ে এগোল সে রানার গায়ের সাথে সঁটে। বাম পা-টা একটু ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে হাঁটছে লোকটা। মাঝে মাঝে ঝট করে পিছনে ঘুরে চাইছে সে। পিছনে একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হতেই রানার কোটের আঙ্গিনটা খামচে ধরল। রানাও পিছনে ফিরে চাইল একবার। দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে তিনজন লোক ওদের দিকে। বেশ অনেক কাছে চলে এসেছে ওরা। এই লোকটার পিছনেই যে ওরা লেগেছে তাতে সন্দেহ রইল না রানার। বিপদ টের পেল রানা। পিছনের তিনজন লোকই সশস্ত্র। আচ্ছা, 'এটা ওকে সুদ্ধ কিডন্যাপ করবার পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান নয়তো? লোকটা অভিনয় করছে না তো? না। অতি বড় অভিনেতার পক্ষেও কপালের ওই ঘাম আর মুখের ওই ফ্যাকাসে ভাব আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটখাট স্কীপ দুর্বল এই লোকটা কি করেছে ওদের?'

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

একটা কালো ইস্যু বেলোট চলে গেল ওদের পাশ কাটিয়ে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সৈ দিকে চেয়ে লোকটা বলল, 'গিগু... গিগু... গিলটি মিঞা। এসে গেল, স্যার, কি করব এখন, মেরে ফেলবে আমাকে ওরা...' কাছে চলে এসেছে পিছনের পদশব্দ। ককিয়ে উঠল গিলটি মিঞা। দুই হাঁটু ঠকাঠক বাড়ি ঝাচ্ছে ওর।

'শোনো, গিলটি মিঞা। তোমার কোন ভয় নেই। আরেকটু কাছে এলেই আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে আচম্কা আক্রমণ করে বসব। তুমি লাইট পোস্টটার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে। বুঝলে? ভয় পেয়ো না।'

'পেন্ডুল আছে, স্যার, ওদের কাছে!'

'আছে, কিন্তু বের করবার সময় পাবে না। আর ও-জিনিস আমার কাছেও আছে একটা। দরকারের সময় ওদেরগুলো বেরোবার অনেক আগেই বেরিয়ে যাবে আমারটা। আহা, আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে কেন? হাত ছেড়ে দাও...'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! তিন গজের মধ্যে এসে গেছে পিছনের লোকগুলো। ইঠাৎ লাফিয়ে রানার সামনে চলে গিয়ে নিজেকে আড়াল করল

গিলটি মিঞা ওদের থেকে। আর এগোনো অসম্ভব। আর চিন্তা করবারও সময় নেই। হঠাৎ ঝট করে ঘুরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা মাকের লোকটার ওপর। আচমকা ঘুসি খেয়েই চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা সিমেন্ট করা ফুটপাথের ওপর। দ্বিতীয় জন হাঁটুর উপর খেলো প্রচণ্ড এক লাথি। ওখানটায় পয়ষটি পাউন্ড ওজনের একটা লাথি পড়লেই হাঁটু ডিজলোকেট হয়ে যায়—রানার লাথির ওজন হলো কমপক্ষে একশো পঁষটি পাউন্ড, ফলে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে বসে পড়ল এই লোকটাও। তৃতীয়জন বিশ্বয়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। লোকটা প্রকাণ্ড। পড়ে গেল রানা ওর ধাক্কা। বুকের ওপর ডাইড দিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, রানা গড়িয়ে সরে যেতেই পড়ল শানের ওপর। সাথে সাথেই ঘাড়ের পিছনে পড়ল কারাতের এক রন্দা। মুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমজনের কজির ওপর লাথি মারল রানা। বিশ গজ দূরে ছিটকে পড়ল ওর হাতে ধরা রিডলভারটা। বাকি দু'জনের শোলভার হোলস্টার থেকে দ্রুত বের করে নিল রানা দুটো রিডলভার। দুই হাতে দুটো রিডলভার ধরে সোজা তাক করল দু'জনের বুকের দিকে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লোকটাকে ধর্তব্যের বাইরে রাখল সে আপাতত।

‘গিলটি মিঞা! ওই রিডলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে এসো। তারপর ব্যবস্থা করছি ব্যাটাদের।’

কিন্তু কোথায় গিলটি মিঞা! পিছন ফিরে চেয়ে দেখল রানা প্রায় চল্লিশ গজ দূরে প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে গিলটি মিঞা। বাম পায়ে খোঁড়াচ্ছে বলে দৃশ্যটা কৰুণ হলেও হাস্যকর দেখাচ্ছে ওর এই পলায়ন। হঠাৎ জ্বলে উঠল দুটো হেডলাইট গিলটি মিঞার ঠিক দশ গজ সামনে। থমকে দাঁড়াল সে দুই হাত ওপর দিকে তুলে। অসহায় দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল সে একবার পিছন ফিরে। তারপর আবার ডান ধারে দৌড় দিতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে। রানা বুকল দেরি হয়ে গেছে। এখন আর ছুটে গিয়েও কিছু করতে পারবে না সে। দু'পাশ থেকে দু'জন চেপে ধরল গিলটি মিঞার দুই হাত, তারপর শূন্যে তুলে ঝুলাতে ঝুলাতে নিয়ে গিয়ে ডরল ওকে গাড়ির ভিতর। রানার সামনে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ভোজবাজির মত ঘটে গেল ব্যাপারটা। কিছু বলতে পারল না সে। দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ এল। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা রানার নাকের ডগা দিয়ে। এক ঝলক দেখতে পেল সে, ছটফট করছে গিলটি মিঞার অপরিস্ফুট দেহটা অন্যান্য আরোহীদের মৃদু গীড়নে। চোখ ফিরাল রানা ফুটপাথের ওপর পড়ে থাকা তিনজন ওতার দিকে। আপাতত কিছু করবার নেই রানার। বিশ গজ তফাতে মাটিতে পড়ে থাকা রিডলভারটা তুলে নিল সে। হাঁটু মচকে যাওয়া লোকটা কিছুই করতে পারবে না, আর তৃতীয় লোকটা এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাস্তায়ও লোকজন নেই। কাজেই এখন নিরাপদে সরে যাওয়ার একমাত্র উপায় প্রথম লোকটাকে অচল করে রেখে যাওয়া। পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল রানা লোকটাকে দশ বারো হাত তফাতে। তারপর জুজুংসুর একটা সহজ পাঁচ

দিয়ে এমন ভাবে আটকে দিল ওর হাত-পা যে অন্য কেউ এসে সাহায্য না করলে ছুটবার ক্ষমতা রইল না আর। কেউ এসে ওকে মুক্ত করবার অনেক আগেই পগার পার হয়ে যাবে সে।

আবদুল হাইয়ের লাল ওপেল রেকর্ডটা নিয়ে রাত সাড়ে দশটায় ফিরে এল রানা হোটেল মিস্থায়।

দশ

পরদিন সন্ধ্যায় চিটাগাং সেইলারস্ ক্লাবে একা বসে ডিনার খাচ্ছে রানা। ক্লাবঘর ছোট, কিন্তু মেসার অনেক। বিরাট প্রাঙ্গণটা তাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে নেয়া হয়েছে। মত্ত তিরপল দিয়ে তাঁবুর মত করে সামিয়ানা টাঙানো। জায়গায় জায়গায় হরেক রকম ফুলের কেয়ারী—ভাছাড়া নিচে ঘাসের কার্পেট। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে টেবিল পাতা। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ—নানান রঙের বালব জ্বলছে। কোথাও আলো, কোথাও ছায়া, সবটা মিলে এক স্পিল পরিবেশ। এক কোণে একা বসে ডিনার খাচ্ছে রানা। নানান রকম জুয়ের আড্ডা বসবে এই তিরপলের নিচে রাত ন'টার পর। এখন থেকেই টেবিল রেডি করছে জনাকয়েক ওয়েটার। রানা শুনেছে এখানে আসে গোলাম হায়দার। অপেক্ষা করছে সে তার জন্যে।

কয়েকটা ব্যাপারে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে রানা। গত রাতে হোটеле ফিরেই টের পেয়েছিল সে যে ওর অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে প্রবেশ করেছিল একাধিক লোক। বিশেষ সাবধানতাও অবলম্বন করেনি তারা। চার ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা হয়তো লক্ষ্যই করেনি—পড়ে ছিল সেটা চৌকাঠের উপর, কিন্তু সুটকেসের তালার কাছে এবং মেঝেতে ট্যালকম পাউডার নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিল ওদের, কেয়ার করেনি। সুটকেসের ভিতর জিনিসপত্র সব লুণ্ঠও হয়ে আছে—কিন্তু ধোয়া যায়নি কিছুই।

সুটকেসের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পোর্টারের অপেক্ষা না রেখেই হাতে তুলে নিয়ে চলে এসেছিল রানা লিফটের কাছে। বোতাম টিপতেই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ লেখা নম্বরগুলোয় হলুদ বাতি জ্বালতে জানতে উঠে এসেছিল লিফট উপরে। দরজা খুলে যেতেই পা বাড়িয়ে লিফটে উঠতে গিয়ে আঁতকে ওঠা ঘোড়ার মত লাফিয়ে সরে এসেছিল রানা। ফাঁকা! তলা খসিয়ে রাখা হয়েছে লিফটের! কোনমতে বাম হাতে দেয়াল ধরে ডাল সামলে নিয়েছে রানা, নইলে ছাতু হয়ে যেত নিচে পড়ে। দরজা খুলে ত্রিমাটা আবাস স্বাভাবিক হতেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে বিল চুকিয়ে চলে গিয়েছিল সে আবদুল হাইয়ের ফ্ল্যাটে। আজ সকালে পেপার খুলেই চোখে পড়েছে ওর খবরটা। হেভি—‘মিস্থা হোটেল টাইম বন্ড।’ তারপর সবিস্তারে লেখা হয়েছে, রাত

বারোটায় পাঁচতলার ওপর দশ নম্বর রুমে এক প্রচণ্ড ডয়ঙ্কর বিশ্ফোরণের কথা। কপাল ভাল, পালিয়ে এসেছিল রানা।

হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল টেবিলের ওপর। ঝট করে ঘুরেই দেখল রানা তিন হাত তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোলাম হায়দার। জুলজুল করছে ওর নষ্ট চোখটা রানার দিকে চেয়ে।

‘চমকে দিয়ে খাওয়াটা নষ্ট করে দিলাম না তো? বসতে পারি?’ রানার উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই সামনের চেয়ারে বসে পড়ল গোলাম হায়দার। মচমচ করে উঠল চেয়ারটা। ‘তারপর? চিটাগাং বেড়াতে এলেন বুঝি?’

‘জি, না। একটু কাজে এসেছি। তা আপনি হঠাৎ কোথেকে?’ এক টেবিল স্পুন-ফুল বিরিয়ানি পুরে দিল রানা মুখের ভিতর, সেই সাথে গেল বড় সাইজের এক টুকরো খাসীর মাংস। সেগুলোকে একটু বাগে এনে আবার কল্ল, ‘ভাল কথা, আপনার সেদিনকার চেকটা ডিজ-অনার হয়নি, ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট পেয়েছি। ধন্যবাদ সেজন্যে।’

জবাব দিল না গোলাম হায়দার। ফাইভ ফিফটি ফাইভের টিন থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল রানা। দু’কাপ কফির অর্ডার দিল। তারপর সোজাসুজি চাইল গোলাম হায়দারের নষ্ট চোখের দিকে।

‘কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন জবাব নেই। তেমনি নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল সে এক মিনিট। যেন সম্মোহন করছে। মড়ার নত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখটা। অস্বস্তি বোধ করল রানা। হঠাৎ যেন ধ্যানভঙ্গ হলো এমনি ভাবে মাথা ঝাঁকাল গোলাম হায়দার, ফিরে এল মুখের স্বাভাবিক রং। এতক্ষণ পর দ্বিতীয় টান দিল সে সিগারেটে।

‘এপ্রিলের নয়, আঠারো বা সাতাশ তারিখে ঠিক বেলা বারোটায় আপনার জন্ম। তাই না, মিস্টার মাসুল রানা?’

মৃদু হাসল রানা। ‘ঠিক বারোটায় কিনা জানি না, অত আগের কথা মনে নেই। তবে তারিখটা ঠিকই আন্দাজ করেছেন—এপ্রিলের নয়। কেন, কি ব্যাপার? জ্যোতিষ-বিদ্যা জানা আছে নাকি আপনার?’

‘আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না বুঝি আপনি?’ জিজ্ঞেস করল গোলাম হায়দার।

‘বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করি না। এ-নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও।’

‘সেটাই স্বাভাবিক। মেষ-এর জাতকের বৈশিষ্ট্যই এই। কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যে এই শাস্ত্রে আপনার বিশ্বাস এনে দিতে পারি আমি।’ তাঁর দৃষ্টিতে চাইল সে রানার মুখের দিকে।

‘চেষ্টা করে দেখুন,’ মৃদু হাসল রানা।

‘নয় বছর বয়সে প্রথম মানুষ খুন করেছেন আপনি।’ চমকে উঠল যেন

রানা। 'তারপর বারো থেকে আঠারোর মধ্যে নয়টা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে আপনার জীবনে। তিনবার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে, তিনবার সড়ক দুর্ঘটনা আর তিনবার আশুন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা। প্রতিবারই একটুর জন্যে প্রাণ রক্ষা পেয়েছে আপনার।' মুখ দেখে মনে হচ্ছে তাজ্জব বনে গেছে রানা। 'উনিশ বছর বয়সে আপনি বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছেন একই সঙ্গে। আরও আগের কথা বলি—নইলে ভাববেন কোন কৌশলে এসব তথ্য যোগাড় করেছি আমি। আপনি জীবনে কখনও মায়ের দুধ খেতে পাননি। আপনার জন্মের পরই যে কোন কারণেই হোক, হয় আপনি খোয়া গিয়েছিলেন, নয়তো আপনার মা এক বছরের জন্যে আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলুন? বিশ্বাস এসেছে আমার জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপর?'

সত্যিই হাঁ হয়ে গিয়েছে রানার মুখটা। আশ্চর্য! একটি কথাও কিন্তু মিলল না! অথচ গড়গড় করে এতগুলো মিথ্যেকথা বলে গেল গোলাম হায়দার—যেন প্রত্যেকটি কথা রানার জীবনের সাথে মিলে গিয়ে অবাক করে দেবে রানাকে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ব্যাপার কি? কি মতলব ব্যাটার? কি বোঝাতে চাইছে এসব বলে? উত্তর দিল না।

খনখনে গলায় হেসে উঠল গোলাম হায়দার।

'অতীত যখন অন্ধরে অন্ধরে মিলিয়ে দিয়েছি, ভবিষ্যৎও বলতে পারব, তাই না?'

'বলুন দেখি?'

ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল গোলাম হায়দারের মুখ। নষ্ট চোখটা জ্বলজ্বল করছে রানার চোখের দিকে চেয়ে।

'এই মুহূর্তে আপনার মাপার ওপর এক মহা বিপদ উপস্থিত, মিস্টার মানুদ রানা। আপনি করনাও করতে পারবেন না এই বিপদের ভয়ঙ্করত্ব। পজিটিভ মার্স আপনাব গভার্নিং প্র্যানেট: সান এক্সক্লাটেড। ফার্স্ট হাউস অফ ফায়ার ট্রিপলিসিটি'র মানুষ আপনি, বর্ন ফাইটার, অবস্টিনেট। এই রাশির লোকেরা আর্মিতে গেলে ভাল করে। মার্স আপনাকে করেছে দুর্দান্ত সাহসী; এই সম্ভবলের মানেই হচ্ছে ওঅর, অ্যাকশন্ অ্যাড পাওয়ার। আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ইমপালসিভ অ্যাকশন্। এরই ফলে মৃত্যু ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আপনার।'

'কিভাবে এড়ানো যাবে এই নিশ্চিত মৃত্যু?'

'পাথর পরলে।'

'পাথর পরলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। স্টোনস্। অদ্ভুত এর ক্ষমতা। কোরান শরীফেও এর গুণকীর্তন আছে। কেমিক্যাল রি অ্যাকশন্ তো আছেই, মহাজাগতিক রশ্মি এর ভিতর দিয়ে মানুষের দেহে যখন প্রবেশ করে তখন তার মধ্যে আশ্চর্য ক্ষমতা সঞ্চর করতে পারে। কোন দুষ্ট গ্রহের কু-নজর এড়াতে হলে পাথর ছাড়া আর কোন গতি নেই। পার্সোনাল ম্যাগনেটিজম্ বাড়াতে হলেও এই পাথর।'

‘কি পাথর লাগবে আমার?’

‘ওটা অত সহজে বলা যায় না, অনেক ক্যালকুলেশন দরকার। কিরোর মতে আপনার লাগবে রুবি, গার্নেট, রেড স্টোনস্, ডায়মন্ড, টোপায এবং অ্যান্ডার। অত্যন্ত হান্যকর ব্যাপার। স্টোন সাজেস্ট করা কি এতোই সহজ?’ ঝেড়ে ছ’টা নাম বলে গেলেনই হ’লো? আমি কাউকে একটার বেশি স্টোন দিই না। সত্যিই, একজন লোকের অন্য এত পাথর হতেই পারে না। বহু চিন্তা-ভাবনার পর সব দিক বিচার-বিবেচনা করে সেই লাকি স্টোনটা বেঁধে করতে হয়।’

‘তাহলে তো আজ আর করতে পারছেন না। তাই না?’

‘না। আজ স্টোন সিলেকশন সম্ভব নয়, কিন্তু অন্য কোন প্রগ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।’

কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে রানা বলল, ‘বলুন দেখি, টাকা পয়সা কি রকম হবে?’

‘প্রচুর আয়, প্রচুর ব্যয়। স্পেশালি লাকি ইন্ গ্যাম্বলিং। কিন্তু টাকা থাকবে না।’

‘বিয়ে শাদী?’

‘নৈই। বিয়ের আগেই মৃত্যু ঘটবে আপনার। যদি কপালগুণে বেঁচে যান তাহলে মেষ রাশি দেখে বিয়ে করবেন।’

‘স্বাস্থ্য?’

‘আগুন, আমেয়ান্ন, সড়ক দুর্ঘটনা থেকে সাবধান থাকবেন। আরও দু’একটা জিনিস বলে দিচ্ছি—নাইন এবং ওয়ান হচ্ছে আপনার সবচেয়ে ইম্পরটেন্ট নম্বর, মনে রাখবেন। আপনার ম্যাগনেটিক ভাইব্রেশন বাড়ার জন্যে সবসময় রেড, ক্রিমশন, রোয এবং গোল্ড, ইয়েলো, অরেন্জ, বোজ্জ অথবা গোল্ডেন ব্রাউন—এইসব রঙের জামা, কাপড়, জুতা আর টুপী পরবেন। আপনার জীবনের বেশির ভাগ স্বক্ৰীয় ঘটনা ঘটবে নয়, আঠারো, সাতাশ, ছত্রিশ, পঁয়তাল্লিশ, চুয়ান্ন, তেষট্টি এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে।’

‘অত বছর পর্যন্ত তো বাঁচবই না।’

‘বাঁচতে পারেন, যদি আমার উপদেশ মত পাথর ব্যবহার করেন।’

‘আচ্ছা বলুন দেখি, হঠাৎ পাঁচতলা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে কিংবা টাইম বম্ব বিস্ফোরণে মৃত্যু আছে কিনা আমার কপালে?’ আরেক চুমুক দিল রানা কফিতে।

‘না। এই বৎসর ওতে আপনার মৃত্যু হবে না,’ যেন কিছুই বোঝেনি এমন ভাবে বলল গোলাম হায়দার।

‘তাহলে নিতান্ত গর্ভস্ত ছাড়া এই ধরনের অপচেষ্টা করবে না কেউ, কি বলেন?’

গালিটা হজম করে নিল গোলাম হায়দার। সিগারেট ধরাল আরেকটা। রানা লক্ষ করল কফির কাপটা নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু এক চুমুকও খাচ্ছে না।

লোকটা।

‘অপনি নিজে কোন্‌ রাশির লোক, মিস্টার গোলাম হায়দার?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আমি? আমি ক্যান্সারের জাতক। ফার্স্ট হাউজ অড ওয়াটার ট্রিপলিসিটি। সেই জন্যেই বোধহয় আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে না কোনদিন। ওয়াটার এবং ফায়ার চিরকাল পরস্পর বিরোধী। চিরকাল-পানির কাছে মাথা নত করতে হয়েছে আগুনকে। আপনার অনেক ক্ষমতা আছে, মিস্টার মাসুদ রানা। কিন্তু কোনদিন যদি ওয়াটার ট্রিপলিসিটির কোন লোকের সাথে যুদ্ধ বাধে, তাহলে?’ প্রশ্ন করেই সিগারেটের আগুনটা ভরা কফির কাপে ডুবাল গোলাম হায়দার। ছ্যাং করে নিভে গেল আগুনটা। হেসে উঠল সে। তারপর নিজেই উত্তর দিল, ‘নিভে যাবে।’

তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে রানার চোখের দিকে।

‘অনেক ধন্যবাদ। বিনা পয়সায় অনেক মূল্যবান উপদেশ পাওয়া গেল,’ বলল রানা।

‘আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?’

‘না।’

‘কেন? কি পাথর পরলে আপনার মাথার ওপর থেকে বিপদ কেটে যাবে জানতে ইচ্ছে করছে না আপনার?’

‘ইচ্ছে করছে। কিন্তু আপনি কি তা বলবেন?’

হোঃ হোঃ করে বীভৎস হাসি হেসে উঠল গোলাম হায়দার, তারপর বলল, ‘না বলাই উচিত। বিশেষ করে ব্রিজ খেলায় হারিয়ে দেয়ার পর তো নয়ই। কিন্তু তবু বলব। আমার উপদেশ মত একটা পাথর আংটি বানিয়ে পরলে কেটে যাবে আপনার সমস্ত বিপদ। অলৌকিক এর ক্ষমতা।’

‘নাম তো বলছেন না।’

‘কি করে বলব বলুন? হরেক রকমের পাথর আছে। ঠিক কোনটা আপনার ন্যূত করবে তা বের করতে হলে সময় দরকার। অন্তত তিনটে ঘণ্টা লাগবে আপনার হাতের রেখার সাথে জন্মের সাল তারিখ মিলিয়ে প্রচুর অঙ্ক কষে প্রত্যেকটা গ্রহ-তারার অবস্থান নির্ণয় করে ঠিক পাথরটা সিলেক্ট করতে।’

‘তাহলে তো আর হলো না।’

‘হতে পারে এক কাজ করলে। কিন্তু ছ’দিন সময় লাগবে তাতে। আমি প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্যে আমার ইয়টে যাই। আপনি যদি হুগা খানেক ছুটি নিয়ে ওই ইয়টে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন তাহলে রোজ আধঘণ্টা করে আপনার পেছনে সময় দিতে পারি আমি। চালভিনের নিউমারোলজি আর কিরোর পামিস্ট্রির সাথে আমি ইন্ডিয়ান এবং টিবেটান অ্যাস্ট্রোলজি যোগ করে নতুন এক জ্যোতিষ-শাস্ত্র তৈরি করেছি। শেষ বয়সে এর ওপর একটা বই লেখারও ইচ্ছে আছে। আপনি তাচ্ছব্ব হয়ে যাবেন আমার জ্ঞানের বহর দেখে। আসবেন?’

রানা বুকল, এতক্ষণ মিথ্যে ভণিতার পর এবার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছে গোলাম হায়দার। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ইয়টে নিতে চায় ও রানাকে। সাতদিনের জন্যে। কিন্তু কেন? খুন করবে না যত্নর সম্ভব—কারণ ও জানে, গেলে রানা অটচাট বেঁধে সবাইকে জানিয়েই যাবে। তাহলে? সাতদিন রানাকে নজরবন্দী রেখে লাভ কি ওর? এমন কী কাজ করতে যাচ্ছে ও এই সাতদিনে, যার থেকে রানাকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার? নিষেধ করে দেবে ও? কিন্তু তাহলে ইয়টে যাবার সুযোগ যদি আর না আসে? ভালমত ভেবে-চিন্তেই টোপ ফেলেছে গোলাম হায়দার। ও জানে, যে কোন ছুতোয় ইয়টে যাবার সুযোগ পেলেই নুফে নেবে রানা আনন্দের সঙ্গে। মন স্থির করে ফেলল ও।

‘এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব।’ তা কবে থেকে স্টাডি আরম্ভ করতে চাইছেন?’

‘কানই আসুন না। এই ধরুন এগারোটার দিকে?’

‘বেশ। রাজি আছি আমি।’

‘ঠিক আছে। আপনার ঠিকানা লিখে দিন, আমার শোফার আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে সাগর-সঙ্গমে। ওখানে স্পীড বোট থাকবে আপনার অপেক্ষায়। এগারোটায় রেডি থাকবেন, পজিটিভলি। ওকে?’

‘ওকে।’

একটা ভিজিটিং কার্ডের উল্টোপাশে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে বাংলায় ঠিকানা লিখল রানা—জাহাঙ্গীর।

এক নজর দেখে নিয়ে কার্ডটা পকেটে ফেলল গোলাম হায়দার।

‘তাহলে এই ঠিকানাতেই পাঠিয়ে দেব আমার শোফারকে। শুভ বাই।’

এগারো

এগারোটার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিল রানা। কালো শেড্রোলে গাড়ি এসে দাঁড়ান আবদুল হাইয়ের বাংলোর সামনে। ইউনিফর্ম পরা শোফার নেমে দাঁড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে ধরল। বিসমিল্লা বলে উঠে পড়ল রানা গাড়িতে। পেটের মধ্যে সুড়সুড়ি জাতীয় একটা অনুভূতি হলো ওর কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। রানা জানে, এটা অজ্ঞানার রোমাঞ্চ। অনিশ্চিত এখন ওর ভবিষ্যৎ। বাঘের খাঁচার ঢুকতে চলেছে সে।

সেইলার্স ক্লাব ছাড়িয়ে ঝাড়া তিন মাইল গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় থামল কালো শেড্রোলে। ঝকঝকে সুন্দর একটা স্পীড বোট দাঁড়িয়ে আছে তীরে, রানার অপেক্ষায়। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় লাল আর সাদা পেইন্ট করা ছোট

বোটটা দেখতে চমৎকার লাগল রানার। মৃদুমন্দ ঢেউয়ে দুলছে সেটা। সানগ্রাস পরা একজন কালো লোক বসে আছে স্টিয়ারিং ধরে। রানা উঠে বসতেই সোজা ছুটল নোঙর ফেনা ইয়টের দিকে। একটিও বাক্য বিনিময় হলো না রানার ড্রাইভারের সঙ্গে। রানা চেয়ে রইল সুদৃশ্য ইয়টটার দিকে। সূর্যের আলোয় এক-আধটা ব্রাস ফিটিং থ্রিক করে উঠছে। লক্ষ করল, ইয়টের পিছন দিকে বাঁধা রয়েছে আরেকটা স্পীড বোট।

রেলিং-এর ওপর কনইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে স্পীড বোটের দিকে চেয়ে ছিল তিনজন লোক। প্লেনের সিঁড়ির মত দেখতে অ্যালুমিনিয়াম সিঁড়ি নামিয়ে দিল ওরা নিচে। 'রানা ওপরে উঠে আসতেই স্যানুট করল কোয়ার্টার-মাস্টার ও একজন স্টুয়ার্ড—তৃতীয় ব্যক্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেছে ততক্ষণে।

'এইদিকে চলুন, স্যার,' বিনীত কণ্ঠে বলল স্টুয়ার্ড। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে রানাকে। এক ডেক ওপরে গিয়ে একটা দরজা খুলে ধরল। 'এইটাই আপনার সুইট, স্যার।'

দরজা দিয়ে ঢুকেই সিটিংরুম, তার ওপাশে বেডরুম এবং ড্রেসিংরুম। অ্যাটাচড বাথও আছে। সিটিং আর বেডরুম অত্যন্ত দামী আসবাবে সুসজ্জিত। এক নজরেই বোঝা যায়, এখানে নিজের বিলাসপ্রিয় মনটাকে অতিমাত্রায় প্রণয় দিয়েছে গোলাম হায়দার। দুর্ভাগ্য, দুঃপ্রাপ্য সব বিলাস সামগ্রী যোগাড় করে সাজিয়েছে সে এই ইয়ট। কিন্তু কোথাও কুকটির পরিচয় নেই। কোথাও আড়ম্বর নেই, হঠাৎ-আভিজাত্যের জগাখিঁড়ি নেই। হিমছাম পরিচ্ছন্ন, অথচ সুন্দর। চমৎকার দুটো অয়েল পেইন্টিং মুলানো আছে বেডরুমে।

'জ্ঞানব গোলাম হায়দার নিজে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারছেন না বলে তিনি দুঃখিত। সাধারণত অতিথিদের তিথি নিজেই উপস্থিত থেকে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু জরুরী কাজে আজ ওঁকে কঙ্গবাজার যেতে হয়েছে বলে ওঁর পক্ষে নেটা কিছুতেই সম্ভব হলো না। উনি আশা করেন, আপনি নিজগুণে এই ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।'

আহা, বিনয়ের অবতার একেবারে!—ভাবল রানা। মুখে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তো আজ ওধু ওধুই নষ্ট হলো দিনটা? কবে আসছেন উনি?'

'উনি আজই রাতে এসে পড়তে পারেন। ওঁর অনুপস্থিতিতে আপনার সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। আসুন, স্যার, এই সুইটের ব্যবস্থাপনা সব বুঝিয়ে দিই আপনাকে।' দেয়ালের খাঁজ কাটা একটা জায়গায় হাত দিয়ে চাপ দিতেই কাঠের টুকরো সরে গেল একটা। 'এই যে বোতামগুলো দেখছেন প্রত্যেকটার ওপর লেখা দেখলেই বুঝতে পারবেন। যাকে ইচ্ছে ডাকতে পারেন: রুম সার্ভিস, নাপিত, বয়, শটহ্যান্ড-জানা সেক্রেটারি—যা চাই। বেডরুমে এর ডুপ্লিকেট বোতাম আছে।'

'চমৎকার।'

'শরীর মেসেজ দরকার হলে এই বোতাম—পুরুষ-নারী যে কোন রকম পেতে পারেন।' আরেকখানে একই উপায়ে চাপ দিতেই সরে গেল সামনের

কাঠ। 'আর এখানে আছে রেডিও, স্টিরিও টেপ-রেকর্ডার, রেডিও-টেলিফোন, আর ইন্টারনাল-টেলিফোন। আর এই যে...'

কস করে জিন্কেস করে বসল রানা, 'কতজন প্যাসেঞ্জার নেয়া যায় এই ইয়টে?'

'সেটা একেক অবস্থায় একেক রকম হতে পারে, স্যার।'

'যেমন?'

'যেমন, কোথায় এবং কতদূরে যাচ্ছি আমরা তার ওপর নির্ভর করবে প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা।' রানা বুকল স্পষ্ট কথা বলছে না লোকটা। বোকা-বোকা দেখানেও আসলে পাকা ঘোড়ল। চট করে অন্য কথায় চলে গেল স্টুয়ার্ড। 'আসুন, স্যার, বেডরুমে আরও কিছু কৌশল আছে। এই যে লিভারটা দেখতে পাচ্ছেন খাটের সাথে, এটা নিচু করে দিলেই দুলবে না খাট। সমুদ্র যত মাতামাতিই করুক নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমাতে পারবেন।'

চট করে লোকটার মুখের দিকে চাইল রানা। তার মানে কি? সমুদ্রের কথা আসছে কেন? ইয়ট ছেড়ে দেবে নাকি আবার? ফুল-স্পীডে যদি চলতে আরম্ভ করে তাহলে প্লেন ছাড়া ঠেকাবার সাধ্য নেই একে কারও।

'আর এই যে এয়ার কন্ডিশনের বোতাম। এছাড়াও টার্কিশ বাথের ব্যবস্থা আছে এই ইয়টে, জিমনেশিয়াম আছে, ছবির গ্যালারি আছে, ডাক্তার আছে।' সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বলে চলল লোকটা। 'আর এই যে বোতামটা দেখছেন, কিছুই লেখা নেই এতে। এটা টিপলে একজন হোস্টেস আসবে। দু'জন সী-হোস্টেস আছে আমাদের।'

'বাহ! চমৎকার ব্যবস্থা!'

'অতিথির সব রকম প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রাখাই তাদের কাজ।'

'ক'টা থেকে 'ক'টার মধ্যে পাওয়া যাবে তাদের? মানে, ওয়ার্কিং আওয়ারটা কি?'

'দিনে-রাতে যখন খুশি ডাকতে পারেন আপনি তাদের। আপনার সেবা করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে তারা।'

'প্রায়ই অতিথি আসেন বোধহয় তোমাদের এখানে?' জিন্কেস করল রানা।

'সেটা মালিকের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আমি চলি, আপনি বিশ্রাম করুন, স্যার। যে-কোন সুখ-সুবিধা আদায় করে নিতে দ্বিধা করবেন না, স্যার। মনে করবেন, সবকিছু আপনারই জন্যে।'

'আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ।'

লোকটা বেরিয়ে যেতেই দরজা দিয়ে ঢুকল একজন লোক রানার স্টুকেসটা হাতে নিয়ে। রানা আঁচ করল, এতক্ষণে ভিতরের জিনিসপত্র নিচয়ই পরীক্ষা হয়ে গেছে একবার। আদেশের অপেক্ষা না রেখেই স্টুকেস খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করে ওছিয়ে দিল লোকটা নিপুণ হাতে। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে তিনটে ঘরই

ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। কোন স্পাইহোল বা মাইক্রোফোন পাওয়া গেল না। খানিকটা নিশ্চিত হয়ে ড্রেসিংরুমে জামা-কাপড় খুলে রেখে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল সে। অল্প খোঁজাখুঁজির পরই পিস্তলটা লুকিয়ে রাখার একটা জায়গা পেয়ে গেল সে। ভেন্টিলেটর ছিলটা তুলে ফেলতেই খানিকটা গর্ত পাওয়া গেল, যন্ত্রটা লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। হোলস্টারসুদ্ধ ওর একান্ত প্রিয় অটোমেটিক ডাবল অ্যাকশন ওয়ালথার পি. পি. কে. রেখে দিল সে গর্তটার মধ্যে, তারপর নামিয়ে দিল ছিলটা। এইবার ঠাণ্ডা পানিতে তৃষ্ণার সঙ্গে স্নান সেরে নিল রানা। দেহের সমস্ত বাড়তি উত্তাপ চলে যেতেই অপূর্ব এক স্নিগ্ধতায় ভরে গেল ওর মন। সাবানটা অর্ধেক ক্ষয় করে ফেলল সে গায়ে মেখে। বাথ-রোব জড়িয়ে পরিতৃপ্ত রানা ফিরে এল বেডরুমে। এয়ার-কন্ডিশনটা চালু করে দিয়েই রুম-সার্ভিসে টেলিফোন করে একটা ডাবল মার্টিনি আনতে বলল। এছাড়া সারাদিন কি করবে সে? হাজার অনুরোধ করলেও যে ওকে শহরে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হবে না তা ওর ভাল করেই জানা আছে। কাজেই সময় কাটাবার এছাড়া উপায় কি?

এসে গেল মার্টিনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ঘরটা ইতিমধ্যেই। আরাম করে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসল রানা। সারা দেহে শিরশিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পরস্পর জড়িয়ে থাকা ভেজা লোমগুলো একে অপরের কাছ থেকে মুক্ত করছে নিজেকে। ঘুম ঘুম একটা আলস্য ভর করতে চাইছে ওর দেহ মনে। ছোট ছোট চুমুকে আধ-ফটা ধরে উপভোগ করল রানা তবল পদার্থটুকু। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। জামা-কাপড় পরে নিয়ে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। বেরিয়েই ফ্লেক্স পনেরো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্টুয়ার্ড। পাহারা দিচ্ছে নাকি ওকে? এত প্রকট ভাবে?

‘দুই ডেক নিচেই আমাদের বার। লাক্সের আগে যদি কিছু ড্রিন করতে চান তাহলে যেতে পারেন, স্যার। এই যে লিফট এইখানটায়।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ।’ কঠোর কণ্ঠে ধন্যবাদ জানিয়ে লিফটের দিকে এগোল রানা।

সবুজ অপ্রশস্ত লিফট। ঠেসে-ঠুসে তিনজন দাঁড়ানো যায়। নিচে নেমে কাউকে দেখতে না পেয়ে একটু বিস্মিত হলো রানা। লিফট থেকে বেরোতেই ওপরে উঠে গেল সেটা। এগিয়ে গেল রানা সামনে। বড়সড় গোল একটা ঘর। চমৎকার করে সাজানো। ধবধবে সাদা দেয়াল, তিন ফিট উঁচুতে চার ইঞ্চি চওড়া নীল বর্ডার সারাটা ঘরে, এক পাশে চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাকা একটা ডিভান, দু’পাশে তেপায়ার ওপর প্রকাণ্ড দুটো ফ্লাওয়ার-ভাসে প্লাস্টিকের ফুল, কয়েকটা নরম গদি আঁটা আরমচেয়ার, আর মিষ্টি সবুজ আলো। মিষ্টি একটা পাঁচাত্ত সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে আবছা ভাবে। বার আছে, কিন্তু বারমান্য নেই। কেউ নেই ঘরের ভিতর।

মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে নিজেই খানিকটা মার্টিনি ঢেলে নিল সে, কাগজি লেবুর খানিকটা চামড়া কেটে নিয়ে চিমটি দিল তার ওপর, তারপর ফেলল

টুকরোটা ঘাসের ভিতর। আশপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে নিজেরই স্বাস্থ্য কামনা করে খেলো এক চোক।

হঠাৎ চমকে উঠল রানা। একটা ফর্সা হাত উপরে উঠল উল্টোদিকে ফিয়ানো একখানা আরম-চেয়ারের ওপাশ থেকে। ধীরে ধীরে আরেকটা হাত উঠে ধরল সেই হাতটা। আড়মোড়া ভাঙল যেন কেউ। হাত দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার ধীরে ধীরে দেখা গেল একটি স্ত্রীলোকের মাথা, কাঁধ। সোজা হয়ে বসল সে আরমচেয়ারে, তারপর পিছন ফিরে চাইল রানার দিকে স্থির ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে। রুমানা।

বারো

‘তুমি? তুমি এখানে কেন?’ প্রশ্ন করল রুমানা। অস্পষ্ট ফ্যাশফেঁশে ওর কণ্ঠস্বর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রুমানা। বিশ্বয় ফুটে উঠল ওর ভ্রমর কালো সুন্দর দুই চোখে। সুন্দরী সন্দেহ নেই, কিন্তু কতখানি সুন্দরী, এই প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করল রানা। নাক, চোখ, কপাল, ঠোঁট, পুতনি শিল্পীর সমস্ত প্রেম আর আবেগ ঢেলে বহু যত্নে টিপেটিপে তৈরি করা প্রতিমার মত। মেয়ে তো নয়, সোনালী স্বপ্ন যেন একটা—ভাবল রানা। সুন্দর গলাটা নেমে এসে মিলিয়ে গেছে চমৎকার একটা কাঁধে। সরু দুটো শোলডার স্ট্র্যাপ ছাড়া কাঁধটা খোলা। গোলাপী রঙের একটা ইভনিং ড্রেস পরেছে রুমানা।

‘বলো, কেন তুমি এখানে?’ চিৎকার করে উঠল রুমানা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। সোনালী স্বপ্ন ভেঙে গেল রানার। ‘আই, ভদ্রলোক! জবাব দিচ্ছ না কেন? বোবা নাকি তুমি? কে তোমাকে আসতে দিয়েছে আমার বারে?’ দু’পা এগিয়েই হঠাৎ মেঝে থেকে একটা বোতল তুলে ছুঁড়ে মারল সে রানার দিকে। চট করে মাথা নিচু করল রানা। পিছনের একটা র্যাকে গিয়ে লাগতেই ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে গেল কয়েকটা মদের বোতল।

‘আই, কদমাইশ! মরবার আর জায়গা পাওনি? কে পাঠিয়েছে তোমাকে এখানে?’

‘দেখুন...’ কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা। ত্রুষ্ণ গর্জন করে উঠল রুমানা।

‘বেরোও, বেরোও বলছি! কাউকে চাই না আমি। কোন কথা শুনতে চাই না। একা থাকব! গোলাম হায়দার যদি তোমাকে পাঠিয়ে থাকে তাহলে ওকে জাহান্নামে যেতে বলো গে যাও। কাউকে পরোয়া করি না আমি আর।’

‘আপনি হঠাৎ একি...’

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ ঘুরল রুমানা। সোজা গিয়ে দাঁড়াল লিফটের দরজার সামনে। দমাদম পিটাল সে দরজাটা কিছুক্ষণ।

অনর্গল গালি বকে যাচ্ছে সে দুর্বোধ্য এক ভাষায়। খুব সম্ভব এগুলো বর্ষণ হচ্ছে স্ট্রয়ার্ডের উদ্দেশ্যে। কড়া নাড়ল সে কিছুক্ষণ মুখ চালাতে চালাতে। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না উপর থেকে। বোঝা গেল, প্রাণে ভয়-ভর আছে স্ট্রয়ার্ডের।

আবার ঘুরল রুমানা। সোজা এসে দাঁড়াল রানার থেকে ছয় ইঞ্চি দূরে। যেন পরীক্ষা করছে সে রানার মুখটা। জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল সে একবার, তারপর কামড়ে ধরল ঠোঁট।

‘তুমি ঢাকার সেই স্মার্ট, হ্যান্ডসাম জুয়াড়ী না? কি যেন নাম তোমার?’

‘মাসুদ রানা। আমি দুঃখিত। এঘরে আর কেউ আছে আমি জানতাম না।’

‘আর কেউ? আর কেউ মানে? তুমি জানো না এটা আমার বার? জানো না আমার অনুমতি ছাড়া গোলাম হায়দারেরও ক্ষমতা নেই এ ঘরে ঢোকার?’

‘না। আমার জানা ছিল না কথাটা।’

‘তাহলে জেনে রাখো। আর এ-ও জেনে রাখো, বিচ্ছিরি সব টেডি ছুঁড়িদের নিয়ে যতই ঘুরুক, ফিরে আসতে হবে ওকে আমার কাছে। কান্দতে হবে ওকে আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। যাক, আমার জন্যে একগ্লাস বানাও; হ্যাঁ, হুইস্কি।’

একটা গ্লাসে ব্ল্যাক সেবেল স্কচ আর সোভা ঢেলে এগিয়ে দিল রানা মেয়েটির নিকে। ঢকঢক করে মদটুকু নিঃশেষ করে নামিয়ে রাখল সে গ্লাসটা। সোনালী চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে দিল একবার। তারপর বলল, ‘এখানে কি করতে এসেছ তুমি?’

‘চিটাগাং এসেছিলাম একটু ব্যবসার কাজে। গোলাম হায়দারের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় নিমন্ত্রণ করে বসল। বলল, হাত দেখে দেবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে তখনই সে নাকি কল্লবাজার গিয়েছে, আজ আসতে পারবে না।’

‘নিশ্চয়ই ওই ছুঁড়িকে নিয়ে গেছে। তা যাক, কিন্তু তোমার তো এখানে আসা উচিত হয়নি, মাসুদ রানা। নিমন্ত্রণ করল আর তুমি সরল বিশ্বাসে চলে এলে? তুমি বোকা নাকি একটা? যাক, এসেই যখন পড়েছ তখন আরেক গ্লাস বানাও আমার জন্যে। আচ্ছ ক’দিন এখানে?’

‘সাতদিন।’ আবার একগ্লাস হুইস্কি তৈরি করতে আরম্ভ করল রানা। ‘কিন্তু মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? অনেকক্ষণ ধরেই খাচ্ছ মনে হচ্ছে?’

হাসি কুটে উঠল রুমানার ঠোঁটে। বিচিত্র এক জগৎ দেখতে পেল রানা সে হাসিতে। চুসক আছে মেয়েটির মধ্যে। এর অমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করা অতি বড় সংযমীর পক্ষেও অসম্ভব।

‘পৃথিবীতে এক-আধজনের মাত্রা-জ্ঞান একটু কম থাকাই তো ভাল। তাতে অনেকে অনেক রকমের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। তবে তো মাত্র দু’বোতল হয়েছে, আরও অন্তত তিন বোতল তো লাগবেই। উহ্! অসহ্য!’ হঠাৎ খেপে উঠল সে মিষ্টি বাজনাটার ওপর। ‘প্যানর প্যানর আর ভাল লাগে

না। জ্যায় চাই, হৈ-টৈ, হট্টগোল।' কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বোতাম টিপতেই বন্ধ হয়ে গেল বাজনা। ফিরে এসে রানার হাত থেকে গ্রাসটা নিয়ে ঢক ঢক করে সবটুকু তিন ঢোকে শেষ করল রুমানা। তারপর বলল, 'চলো, তোমাকে পাতালে নিয়ে যাব। ওই যে সাদা বোতামটা দেখা যাচ্ছে, টিপে দাও ওটা।'

বোতাম টিপতেই সড়াং করে একটুকরো ছয়ফুট বাই চারফুট কাঠের প্যানেল সরে গেল একপাশে। প্লেট-গ্রাসের জানালা দেখা গেল একটা। সী-লেভেল থেকে বারো ফুট নিচে। প্রথম সূর্যের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বেশ অনেক দূর পর্যন্ত। একটা মাছ কাঁচের গায়ে নাক ঘষতে ঘষতে ওপরে চলে গেল। সত্যিই, রূপকথার অদ্ভুত সেই পাতালপুরীতে নেমে গিয়েছে যেন রানা।

খিলখিল করে হেসে উঠল রুমানা, 'অবাক হয়ে গিয়েছ, না? গভীর সমুদ্রে যখন থাকি তখন রাতের বেলায় অদ্ভুত এক জগৎ দেখতে পাই আমরা এই জানালা দিয়ে। বিনে পরসার টেনিভিশন। বাঁতি জ্বলেনে দিলেই কৌতূহলী জায়ান্ট স্কুইড, প্রকাণ্ড স্টিং-রে, ম্যান্টা-রে, হাসর, ব্যারাকুডা আরও কত কি জীবজন্তু এসে হাজির হয়। আধহাত তফাতে দাঁড়িয়ে এইসব জীবজন্তু দেখতে পছন্দ করে গোলাম হায়দার। আর তখন আমি নাচি।'

হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে নাচের ভঙ্গিমায়ে দুইহাত ছড়িয়ে রানার দিকে চাইল রুমানা। বলল, 'স্টেরিওটা চালিয়ে দাও, নাচব আমি!'

গোপন স্পীকার থেকে ভেসে এল উদ্দাম জ্যায়। ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রুমানা। জুতো জোড়া ছুঁড়ে দিল একটা চেয়ারের দিকে, তারপর আরম্ভ করল স্নেড ডান্স। সারা জগৎটা যেন দুলতে আরম্ভ করল রানার চোখের সামনে।

'আরও জোরে।' চিৎকার করে উঠল রুমানা। অর্ধ নিম্নলিখিত ওর চোখ। ভলিউম বাড়িয়ে দিল রানা। সারা ঘর ভরে গেল ড্রামের প্রচণ্ড শব্দে। লয় বাড়ছে ক্রমে ক্রমে, সেই সঙ্গে বাড়ছে উদ্দাম স্টেপিং। সামনের দিকে খানিকটা ভাঁজ হয়ে গিয়েছে হাঁটু। পেটের পেশীগুলো একবার সামনে যাচ্ছে, একবার পিছনে।

'আরও!' আরও বাড়াল রানা ভলিউম। কানে তাল লাগার যোগাড়।

চোখ বন্ধ করে নাচছে এখন রুমানা। ঠোট দুটো ফাঁক হয়ে আছে। ঘাম দেখা দিল ওর কপালে। মাথাটা হেললে আছে পিছন দিকে। ক্যারিওনেটের এক একটা লম্বা টানে রক্ত উঠে আসতে চাইছে রানার মাথায়।

রানা বুঝল, এইবার অ্যালকোহলে ধরেছে ওকে। তাল রাখতে পারছে না সে আর বাজনার সঙ্গে। দুই হাত মাথার উপর তুলে নাচছে সে এখন, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে, বেতলা পা পড়তে আরম্ভ করেছে ওর। টলছে দেহটা। বোর্ক সামলাতে না পেরে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল সে সামনের দিকে।

হাত ধরে তুলে দাঁড় করাল ওকে রানা। মাথাটা ঝুঁকে আছে নিচের

দিকে। শুইয়ে দিল সে ওকে ডিভানের উপর। চূপচাপ পড়ে রইল রুমানা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

রানা বুকল, এখানে জমবে না। ঘড়ি দেখল—ঠিক বারোটা বাজে। লিফটের দিকে ঘুরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

ইঠাৎ চোখ পড়েছে কাঁচের জানালাটার দিকে। কি ব্যাপার! লাল হয়ে গেছে কেন পানি? দীর্ঘ পদক্ষেপে কাছে এসে দাঁড়াল রানা। দেখল লালচে পানিতে হটোপটি আছে তিনটে প্রকাণ্ড হাসর। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক ছুটোছুটি করছে ওরা। অত্যন্ত সুবাস কখন খাবারের গন্ধ পেয়েছে যেন ওরা।

ঝিক্ করে বিদ্যুৎ চমকে উঠল যেন রানার মনের মাধ্যে এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে আবদুল হাইয়ের মৃত্যু-রহস্য। যেন কোনও ফগম্যান পানির নিচ দিয়ে গোপনে ইয়টের কাছে আসতে না পারে সেজন্যে এই সহজ এবং ভয়ঙ্কর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছে গোলাম হায়দার। কিছুক্ষণ পরপর ইয়ট থেকে রক্তের গুঁড়ো স্প্রে করা হচ্ছে পানিতে। ফলে প্রতিমুহূর্তে ঘিরে রেখেছে এটাকে একদল হাসর। রক্তের নেশায় পাগল হয়ে আছে ভয়াল জন্তুগুলো। এই হাসরের হাতেই মারা গেছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আবদুল হাই।

কিন্তু কেন এই সাবধানতা? কি এমন গোপন জিনিস আছে এই ইয়টে? জানতেই হবে ওকে সেটা।

তেরো

পরদিন সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল রানার। আড়মোড়া ভেঙে প্রকাণ্ড এক হাই তুলল সে। দমটা ছাড়ার সময় কুকুরের কান্নার মত বিকট আওয়াজ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। নিজেই হেসে ফেলল রানা বিচিত্র শব্দটা শুনে। পাশ কিরে একটা বালিশ টেনে নিল।

কাল বেড়াবার ছলে ইয়টের অনেকখানি দেখে নিয়েছে সে। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি ওর। ঠিক ছ'টার সময় আশপাশের পানি লাল হয়ে উঠেছিল আবার। আনন্দাজ করে নিয়েছে, রানা, প্রতি ছ'ঘণ্টা পর পর এই ব্লাড-পাউডার ছড়ানো হয় পানিতে, হয়তো কোন যন্ত্রের সাহায্যে। আশ্চর্য উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করছে গোলাম হায়দার নিজের কাজে।

রুমানার ঘরে আর যায়নি সে কাল। দুপুরের সেই মাতলামি কাটিয়ে উঠে প্রকৃতিস্থ হবার পর কয়েকবার ফোন করে ডেকেছিল রুমানা বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাতে। নানান ছুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে রানা। দু'জন হোস্টেসের একজন যে রুমানা নয় এটা বুঝে নিয়েছে সে। আলাদা দু'জন ড্যানিশ যুবতী

আছে ইয়টে। রুমানা খুব সম্ভব গোলাম হায়দারের উপপত্নী গোছের কিছু একটা হবে। প্রচণ্ড এক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েটির মধ্যে গোলাম হায়দারের অন্য নারীতে আসক্তি দেখে। এই বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে কিছু তথ্য বের করতে হবে ওর কাছ থেকে।

বিকেনে ফোর এবং অ্যাফ্ট ডেকে ফাঁটা দু'য়েক কাটিয়ে ঘরে ঢুকেই একটা কথা মনে পড়ায় ছুটে গিয়েছিল রানা বাথরুমে। ভেস্টিলেটার যিনটা তুলে ভেতরে হাত দিয়েই নিশ্চিত হয়েছিল সে। আছে। কিন্তু কি ভেবে হোলস্টারটা বের করে এনেই বোকা হয়ে গিয়েছিল। ভিতরের বস্তুটি নেই, খোয়া গেছে।

আবার একবার আড়মোড়া ভেঙে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। একেবারে সান সেরে বেরোল সে বাইরে। দরজায় টোকা পড়ল। বাথ-রোব পরে খুলে দিল সে দরজাটা। ঘরে ঢুকল স্টুয়ার্ড।

'আপনার নাস্তা আঁকটার ডেকে দেয়া হবে, স্যার। জনাব গোলাম হায়দার অপেক্ষা করছেন সেখানে আপনার জন্যে।'

'আচ্ছা! গোলাম হায়দার এসে গেছেন তাহলে?'

'জি।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি।'

তিন মিনিটেই তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। দূর থেকেই দেখতে পেল খাওয়া শুরু করে দিয়েছে গোলাম হায়দার। একটা কম্প্যানিয়ন-ওয়ে পেরিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পাতা। রানাকে দেখে সৌজন্যের আতিশয্যে উঠে দাঁড়াল গোলাম হায়দার।

'আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কাল আসতে পারিনি। নিন বসুন।'

টেবিলের দিকে চেয়েই এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল রানার চোখ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে রানার ওয়ালথার পি. পি. কে.। মুখের ভাব পরিবর্তন হলো না রানার একবিম্বুও। ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'কোন কষ্ট হয়নি তো ইয়টে?' রানার 'না' বলবার আগেই বলল, 'বলেছিলাম না, আনন্দেই কাটবে আপনার সাতটা দিন।'

স্টুয়ার্ড কাছে ঘেঁষে দাঁড়াতেই অর্ডার দিল রানা অ্যাপল জুস, বাটার টোস্ট, ডিম পোচ, কলা আর চা।

'আপনি কিসের ব্যবসা করেন, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'ব্যবসাটা আমি করি না, করে আমার কোম্পানি। ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট, ইনভেনটিং। আমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। "অলরাউন্ড ট্রেডার্স লিমিটেড" আমাদের কোম্পানির নাম।'

অল্পদিন হলো জানাজানির ভয়ে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন নামটা বদলে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের বাহ্যিক নাম রাখা হয়েছে

অলরাউন্ড ট্রেডার্স লিমিটেড।

‘কিসের ইন্ডেন্ট করেন?’

ট্রাক, ক্রেন, বুলডোজার, রোলার, ট্রাকটর, ড্রিলিং রিগ—নানান বস্তু
আইটেম।’

এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়ে গেল। নাস্তা খেতে খেতে রানাকে
পিস্তলটার দিকে চাইতে দেখে মুচকি হেসে গোলাম হায়দার বলল, ‘এটা
একটা খেলনা পিস্তল। গুললাম আপনার ঘরে পাওয়া গেছে। কোন-অতিথি
হয়তো ফেলে গেছে ভুলে। ভাবলাম আপনারও হতে পারে। কিন্তু ব্যবসার
কাজে তো এ জিনিস দরকার হয় না, তাই সন্দেহ হচ্ছে অন্য কারও হবে
হয়তো। আপনার তো নয় এটা, তাই না?’ পাপড়িবিহীন নষ্ট চোখটা
ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে।

‘জিনিসটা আমারই। মাঝে মাঝেই টাকা-পয়সা নিয়ে চলাফেরা করতে
হয়; তাই সঙ্গে রাখি আমি পিস্তলটা।’

‘ও, তাই বলুন।’ পিস্তলটা এগিয়ে দিল গোলাম হায়দার। ‘তাহলে
আপনারই জিনিস। ওর কলকজা কিছুই বুঝি না আমি। চেষ্টা করেও একটা
গুলি ফুটাতে পারলাম না। মনে করুন, ওই সী-গালটা আপনার টাকা কেড়ে
নিতে চায়—দেখি তো লাগাতে পারেন কিনা?’

বিশ গজ ওপরে একটা খুঁটির মাথায় বসে বিধাম নিচ্ছে একটা সীগাল।
রানা একবার চাইল ওরটার দিকে। মৃদু হাসল। অতি সহজ টার্গেট। পিস্তলটা
তুলল সে। কিন্তু ট্রিগার চাপতেই বসে গেল সেটা নিচু হয়ে—গুলি বেরোল
না।

ভেঙে দিয়েছে গোলাম হায়দার। ক্ষুণ্ণ একবার পরীক্ষা করেই বুঝল রানা
এক্সপার্টের হাতের কাজ। টরশন পিনগুলো ভেঙে দেয়া হয়েছে। ম্যাগাজিন ও
চেম্বারে গুলি আছে, কিন্তু ট্রিগার আর হ্যামার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাওয়ায়
কারখানা থেকে ঠিক না করলে একটি গুলিও বেরোবে না আর ওই পিস্তল
থেকে। রানা চেয়ে দেখল নিঃশব্দে হাসছে গোলাম হায়দার।

‘ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলিনি তো?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘নষ্টই করে ফেলেছেন,’ মৃদু হাসল রানা। ‘কিন্তু তাতে এত লজ্জা
পাওয়ার কিছুই নেই, স্পেরার আরেকটা আছে আমার কাছে। যাক, এখন
জ্যোতিষ-বিদ্যা নিয়ে আলাপ করা যাক, হাতটা দেখবেন নাকি?’

‘আজ আর হাত দেখব না। আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা কেলে এসেছি।
কাল সকাল থেকে শুরু হবে আমার স্টাডি। ভেতর ভেতর স্টাডি অবশ্য
আরম্ভ হয়ে গেছে আগেই। যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। নামটাই
ধরুন না কেন। মাসুদ এর ভাইব্রেশন ৪১৩৬৪ বের করলে দেখা যায়
বেরোচ্ছে ১৮: আঠারো মানে ১ আর ৮, অর্থাৎ ৯; রানার ভাইব্রেশন
২১৫১—তার মানে ৯। এখন মাসুদ রানা যোগ দেন। ৯ আর ৯ হচ্ছে ১৮,
আর আঠারো মানেই ৯। মেষ এর নাম্বার নাইন পারসন আপনি, আপনার

পক্ষে নামটা কি পরিষ্কার জাস্টিফায়ের্ড হয়েছে কল্পনা করুন। আর আমি হচ্ছি কর্কট রাশির মানুষ। ফার্স্ট হাউস অফ ওয়াটার ট্রিপলিসিটি। আমিও ইনডেসট্রাক্টিবল। চোখের পাপড়ি তুলে নিয়ে একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছে—গলায় রশি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে গাছের ডালে—তবু বেঁচে আছি, এবং থাকবও। একটা মস্ত ঝাঁড়া আছে সামনে, কাটিয়ে উঠতে পারলে চুরাশি বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচব আমি।’

‘কারা অত্যাচার করেছিল আপনার ওপর?’

‘সে অনেক কথা। পরে বলব একসময়। বারবার চোখ আর গলার দিকে চাইছেন বলেই আভাসটা দিয়ে রাখলাম। জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনা আর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সব রকমের প্রতিবন্ধকতা চুরমার করে ভেঙে গুঁড়িয়ে উঠতে হয়েছে আমাকে ওপরে।’

এমনি সময়ে ডেকের উপর এসে হাজির হলো পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটা টেডি মেয়ে। খুব সম্ভব ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। বড়লোকের বখে যাওয়া মেয়ে। রানা বুকল এই মেয়েটির কথা বলতে গিয়েই হিংস্রাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল ক্রমান্বয়ে চোখ।

‘এসো, নাজনীন। পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশন, থুড়ি, অলরাউন্ড ট্রেডার্স লিমিটেডের ম্যানেজার মি. মাসুদ রানা। আর এ হচ্ছে আমার বান্ধবী, নাজনীন লায়লা।’

মিষ্টি করে কৃত্রিম হাসি হাসল নাজনীন। রানাও দাঁত বের করল একটু। একটা চেয়ারে বসে পড়ল নাজনীন গোলাম হায়দারের গা ঘেঁষে। নানান ধরনের হালকা আলাপ চলল বেশ কিছুক্ষণ।

রানা বিশেষ ভাবে লক্ষ করল নাজনীনকে। কার মেয়ে কে জানে। অতিরিক্ত স্মার্টনেস, নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণ আর ইংরেজি ছবির অনুকরণে আন্টো মডার্ন হলেও মেয়েটি যে একেবারে ছেলেমানুষ তা এক নজরেই বোঝা যায়। জীবনের কঠোর দিকটা সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা নেই। গোলাম হায়দারের পরসায় মদ খেয়ে, জুয়া খেলে, নিজেকে মহা ভাগ্যবতী মনে করছে সে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নাজনীন। ‘দেখো, দেখো, হায়দার। কী অদ্ভুত একটা মাছ!’

সবাই ফিরে চাইল পানির দিকে। টর্পেডোর মত কি যেন একটা তীর বেগে ছুটে আসছে ইয়টের দিকে। স্পীড বোটের মত ডেউ উঠে গেছে দুই পাশে। একটু কাছে আসতেই রানা দেখল, আসলে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে একজন লোক। অসম্ভব দ্রুত গতিতে আসছে লোকটা। হাল্লরের কথা মনে হতেই চমকে উঠল রানা ভিতর ভিতর।

‘ও কিছু নয়,’ বলল গোলাম হায়দার। ‘আমাদের লোবাক। সাঁতারে ওর জুড়ি নেই পৃথিবীতে।’

ইয়টের গা থেকে নামানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল লোবাক উপরে। উঠেই

গা ঝাড়া দিল কুকুরের মত । হাতের ইশারায় ওকে ডাকল গোলাম হায়দার ।
এল সে সামনে ।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল রানার । নাজনীনেরও নিশ্চয়ই একই
দশা হলো, কিন্তু সেটা দেখার সুযোগ পেল না রানা । বিস্ফারিত চোখে চেয়ে
রয়েছে সে লোবাকের হাত ও পায়ের দিকে । অবিশ্বাস্য রকমের বড় বড় হাত-
পা । হাতের তালুটাই হবে দশ বাই সাত ইঞ্চি—তার ওপর রয়েছে বিরাট
বিরাট আঙুল । এলিফ্যান্টিয়াসিস! আশ্চর্য! রানার সমান লম্বা আর রানার দ্বিগুণ
চওড়া—কিন্তু হাত-পা দেখলে মনে হয় বিশাল এক মূর্তির হাত-পা দেখছি ।

‘খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তাই না?’ বলল গোলাম হায়দার, ‘এ রকমের
অঙ্গ-বৈকল্য অতি অসাধারণ । দুর্ভত একটা দর্শনীয় বস্তু’ ও আমার । চীন দেশে
গিয়ে কসতি করে খিরগিজ-আমা বলে খিরগিজের এক যাযাবর সম্প্রদায়—
তারাই প্রথম আবিষ্কার করে এই রকম আশ্চর্য অঙ্গ-বৈকল্যের উপায় । এখন
অবশ্য আইন করে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এমন কাজ ।’

‘তার মানে ওকে ইচ্ছে করে এমন করা হয়েছে?’

‘নিশ্চয়ই! ও এক অদ্ভুত সৃষ্টি । প্রচণ্ড শক্তি আছে ওর হাত-পায়ে । ওকে
সাঁতার প্র্যাকটিস করাচ্ছি আমি । সমস্ত ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করে দিয়ে
রাতারাতি পৃথিবী-বিখ্যাত করে দেব ওকে আমি একদিন ।’

কানে কানে কি যেন কল্ল ওকে গোলাম হায়দার । নিঃশব্দ এক ভয়ঙ্কর
হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে । চলে গেল সে নিচে । রানা লক্ষ করল একবিন্দু
পানিও লেগে নেই লোবাকের গায়ে । প্লাস্টিকের জাসিয়া পরে আছে সে ।
সারা গায়ে ডেলডেলে কি যেন মাথা । আন্দাজ করল রানা—শার্ক রিপেল্যান্ট
লোশন মেখে নেমেছিল লোবাক পানিতে ।

‘কিন্তু কি করে এমন দানব তৈরি করা সম্ভব...আর কেনই বা একটা
মানুষের হাত-পা...?’

‘খিরগিজ-আমা সম্প্রদায় সে রহস্যের চাবিকাঠি দেয়নি আমাকে । আর
কাজটা কঠিনও খুব । বিশেষজ্ঞ ছাড়া অসম্ভব’। পিটুইটারী গ্র্যান্ডটাকে বিশেষ
এক প্রক্রিয়ায় উত্তেজিত করে বড় করে তোলা হয় প্রথমে । ফলে
জাইগ্যান্টিজম বলে একরকম রোগের উৎপত্তি হয় । দৈত্যাকার হয়ে যায়
সাধারণ মানুষ । ক্রমাগত বাড়তে থাকে । কিন্তু শ্রেষ্ঠ দানবাকার হলে ততখানি
ভয়ঙ্কর দেখায় না, তাই এরা প্রক্রিয়াটাকে আরও একটু উন্নত করে দেহের লম্বা
হাড়গুলো শক্ত না হওয়া পর্যন্ত গ্র্যান্ডটাকে বেশি না ঘাটিয়ে অ্যাকরোমেগালি
স্টেজ-এ নিয়ে আসে । এরই ফলে প্রকাণ্ড হাত-পা বিশিষ্ট দানবের সৃষ্টি হয় ।
অসম্ভব শক্তি থাকে এদের দৈত্যাকার অঙ্গে । তিন ইঞ্চি ডায়ামিটারের লোহার
রড অক্লেশে বাকিয়ে ফেলতে দেখেছি আমি লোবাককে । একটার ওপর
আরেকটা সাজিয়ে রাখা দশটি মহিষের ঢুকনো চামড়া কাগজের মত ফড়ফড়
করে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে দেখছি । অমূল্য সম্পদ ও আমার । এই যে কমানার
কুকুর এসে গেছে ।’

প্রকাশ একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরকে নিয়ে এল লোবাক চেন ধরে। গোলাম হায়দারকে চিনতে পেরে গম্ভীর গলায় ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা। নিকৃষ্ট জীব—মনের ভাব গোপন রাখতে পারে না। রানা বুঝল যে কারণেই হোক, পছন্দ করে না সে গোলাম হায়দারকে। হঠাৎ রানা বুঝতে পারল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। মাথা ঝাঁকাল গোলাম হায়দার লোবাকের দিকে চেয়ে।

দুই হাতে অ্যালসেশিয়ানের মাথাটা ধরে চাপ দিল লোবাক। ছটফট করে উঠল কুকুরটা। পর মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। মড়মড় করে মাথার হাড় ভাঙার বিলম্বী শব্দ শুনে পেল রানা। শিউরে উঠল সে। যা ঝেঁয়েছিল সব ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল মুখ দিয়ে। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল ডেকের ওপর। পিছিয়ে গেল রানা এক পা।

এবার একে একে চারটে পা ছিড়ে ফেলল লোবাক পানিতে। মহা আন্দোলন শুরু হলো পানির মধ্যে। দেহটাও ছুঁড়ে ফেলল সে পানিতে। আঙুলের রক্তগুলো চটে ঝেঁয়ে নিল। বীভৎস দৃশ্য।

রানার মুখের ভাব লক্ষ করছিল গোলাম হায়দার। হঠাৎ হেসে উঠল সে উচ্চকণ্ঠে।

‘কুকুরটা পছন্দ করত না আমাকে। তেড়ে এসেছিল সেদিন কামড় দিতে। তাই এই পরিণতি।’

চলে গেল গোলাম হায়দার ওর কেবিনে নাজনীনকে একহাতে জড়িয়ে ধরে।

চোদ্দ

চলে গেল গোলাম হায়দার স্পীড বোটে করে নাজনীনকে একহাতে জড়িয়ে ধরে।

এইবার! এইবার নামবে রানা নিচে!

ঘর থেকে বেরিয়ে চারপাশে কাউকে দেখতে পেল না রানা। জিমশেশিয়াম আর সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল সে গোলাম হায়দারের কেবিনের দিকে। একটা লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা। সাবধানে এগোল সে। গোলাম হায়দারের কেবিনে চাবি দেয়া। পাতলা চারকোনা একটা সেন্সরয়েডের টুকরো বের করল সে পকেট থেকে। দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ভিতর থেকে বল্টু তুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গোলাম হায়দারের কেবিনের মধ্যে।

বড়সড় ঘরটা। সাদা চাইনিজ কার্পেট বিছানো। ফোম রাবারের সোফা, আর কয়েকটা হোয়াইট লেদারের চেয়ার, কয়েকটা পেইন্টিং ঝুলছে। তন্নতন্ন

করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না সিটিং-রুমে। এবার বেডরুমে চলে এল রানা। লাইট জ্বালতে সাহস হচ্ছে না, হাতের পেন্সিল-টর্চটা ব্যবহার করতে হচ্ছে ওকে। যে কোন মুহূর্তে কেউ এসে পড়তে পারে, তাই দ্রুত কাজ সারতে হবে ওকে। কিছু একটা পাবেই সে এই ঘরে, কিন্তু কোথায়? গোপন সিন্দুক পেল সে একটা খুঁজে, কিন্তু ওর পিছনে বৃথা সময় নষ্ট করল না সে খুলবার চেষ্টা করে। আরও বিরাট কিছু আছে। অদ্ভুত কিছু আছে এই ইয়টে। সেই আকর্ষণেই এখানে আসতে চেয়েছিল আবদুল হাই—প্রাণ দিয়েছে সে হাসরের মুখে।

ইয়টের ওপর প্রোটেকশনের বিশেষ ইকান ব্যবস্থা দেখতে পায়নি রানা। কেন? এমন হতে পারে যে উপরে সত্যি সত্যিই প্রোটেক্ট করার কিছুই নেই। তাহলে? ইয়টের তলার কোন ব্যাপার নয় তো? হাস্করগুলো গার্ড দিচ্ছে তলাটুকু, অর্থাৎ যেটুকু অংশ পানির নিচে আছে। ইয়টের নিচে নামার উপায়?

ড্রেসিং-রুম থেকে ঘুরে এল রানা একপাক। কিছুই নেই সেখানে। আবার বেডরুমটা ভাল করে দেখতে যাবে এমনি সময় পিছন থেকে একটি তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ডেস্কের ওপর টেলিফোন বাজছে। লাল একটা আলো জ্বলে উঠেছে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। কেউ ডাকছে গোলাম হায়দারকে। বাইরে থেকে শব্দ শুনে পেয়ে কেউ ঢুকতে চাইবে না তো ভিতরে? তার আগেই ভেগে পড়া দরকার। দরজায় গিয়ে কান পাতল রানা আশপাশে কোন সাড়া-শব্দ নেই। আবার ফিরে এল সে বেডরুমে।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার ঘরের কোণে দাঁড়ানো মূর্তিটার ওপর। নারীর ফুল-সাইজ শ্বেত পাখরের মূর্তি। এগিয়ে গেল সে মূর্তিটার কাছে। নাই। এখানেও কিছু নেই। দেহের ওপর একবার আলো বুলিয়ে নিয়ে ফিরতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ পেন্সিল-টর্চের আলো এসে স্থির হলো মূর্তিটার কপালে লাল টিপের উপর। কি ব্যাপার? ওখানে আঙুলের ছাপ কেন? মূর্তির কপালে কে হাত...আচ্ছা! সুইচ নয় তো! তজ্জনী দিয়ে টিপে ধরল রানা লাল বোতামটা। সড় সড় করে সরে গেল দুই হাত তফাতে এক টুকরো কাঠ। লোহার দরজা দেখা গেল একটা। চকচকে নিকেল করা হ্যান্ডেলের পাশেই চাবির ফুটো।

মিনিট দু'য়েক চেষ্টার পর খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে অন্ধকার। টর্চ জ্বলে ভিতরটা দেখে নিল রানা একনজর। খাড়া একটা লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। দরজা ভিড়িয়ে রেখে নিচে নেমে গেল রানা। সরু একটা পথ পাওয়া গেল। কয়েকটা বাঁক ঘুরে মিলেছে গিয়ে আরেকটা পথে। আবছা আলো দেখা গেল সামনের পথটার। পথের দু'পাশে স্টীলের দেয়াল। টর্চটা নিভিয়ে দিল রানা। বুকল ইয়টের তলায় চলে এসেছে সে। কিন্তু এই গোপন পথটা গেছে কোথায়?

সামনের আবছা আলোকিত পথটার কাছে এসে মাথা বাড়িয়ে দুইধার

দেখল রানা সাবধানে। কেউ নেই। হঠাৎ কঁচাচ করে শব্দ তুলে খুলে গেল একটা দরজা দশ গজ তফাতে। ডানদিকে। উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল দেয়ালের গায়ে। স্যাঁৎ করে সরে গেল রানা। সাদা নাবিকের ড্রেস পরা কয়েকজন অফিসার বেরিয়ে আসছে একটা ঘর থেকে। এই দিকেই আসবে মনে হচ্ছে। কোন্ দিকে যাবে ওরা? এই গলিতে ঢুকে পড়বে না তো?

এক ছুটে সরে গেল রানা অন্ধকার গলির ভিতরে বেশ খানিকটা দূরে। না। এই গলিতে ঢুকল না ওরা। অন্ধকার গলি মুখটা পেরিয়ে ছয়জন অফিসার চলে গেল বায়ে। প্রথম দর্শনে চিনতে পারেনি রানা—এইবার পর পর ছয়জন লোককে দুই সেকেন্ড করে দেখবার সুযোগ পেল। চমকে উঠল সে। ইন্ডিয়ান ন্যাভাল ফোর্সের ড্রেস! ব্যাপার কি? এই ইয়টে ইন্ডিয়ান নেভির অফিসার কেন? আশ্চর্য! দ্রুত চলে এল রানা গলি মুখে। মাথা বাড়িয়ে দেখল বায়ে মোড় নিচ্ছে ওরা। ভাইনে চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না সে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এক ছুটে চলে এল রানা বায়ে বাকটার কাছে। ভারতীয় নেভির পোশাক এবং একটা শিখ চেহারা দেখে বুঝল রানা, সন্দেহ নেই, এরা ইন্ডিয়ান নেভির লোক। আশ্চর্য।

পথটা শেষ হয়ে গিয়েছে সামনে। একটা বাল্ব জ্বলছে শেষ মাথায়। ডানধারে দেয়ালের গায়ে হাত ঢুকিয়ে দিল সামনের লোকটা। চাবি বের করে এনে খুলে ফেলল একটা দরজা। চাবিটা রেখে দিল সে আবার কী-বোর্ডে। স্টাং করে বন্ধ করে দিল গর্তের ঢাকনি। এবার একটা নব ঘুরাতেই পথের শেষ মাথায় খুলে গেল দরজা। একরাশ ধোয়া এসে ঢুকল গলিপথে। আবছা হয়ে গেল সব কিছু। ধোয়াটা মিলিয়ে যেতেই আবার বাতি দেখা গেল পরিস্কার। দরজাটাও। লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ছুটে গিয়ে দাঁড়াল রানা দরজার সামনে। নবটা সাবধানে ঘুরিয়ে ধাক্কা দিল, কিন্তু খুলল না দরজা। ভিতর থেকে হুক তুলে বন্ধ করে গেছে ওরা। চাবির ফুটোয় চোখ রেখে কিছুই দেখতে পেল না রানা। কি আছে ওপাশে? আপাতত বুঝবার উপায় নেই। ডান পাশের দেয়ালে চাবি রাখার গর্তটার ঢাকনি দেখতে পেল সে চারকোনা। খানিকক্ষণ টানাটানি করতেই খুলে গেল সেটা। দশ বারোটা চাবি জ্বলছে কী-বোর্ডে। কোন চাবিটা? আট নম্বর চাবি জ্বলছে অল্প অল্প। খুলে আনল রানা সেটা। পকেট থেকে বের করল একটুকরো সাদা কাগজ। চাবিটা এবার কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়ে টিপে টিপে পরিস্কার ছাপ তুলল সে। এখন কি করবে সে? চাবি দিয়ে দরজা খুলে যাবে নাকি ওপাশে? না। আজকের মত ফিরে যেতে হবে। এতক্ষণে বোঝ পড়ে গেছে হয়তো। চাবিটা যথাস্থানে রেখে ঢাকনি লাগিয়ে দিয়ে দ্রুত ফিরে এল রানা গোলাম হায়দারের ঘরে। দরজাটা লাগিয়ে কেবিনের গায়ে সরে যাওয়া কাঠের প্যান্টেলটা আবার যথাস্থানে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে কেবিন থেকে। ফিরতি পথে একজন জু-র সাথে দেখা হলো। গভীরভাবে স্যানিউট করে চলে গেল সে রানার পাশ কাটিয়ে। জিমনেশিয়ামের কাছে আসতেই

দেখা হলো রুমানার সঙ্গে।

‘কোথায় ছিলে তুমি, রানা?’

‘এই তো, একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম।’

‘কোথায় ঘুরছিলে তুমি? সারা ইয়ট তম তম করে খুঁজেও পেনাম না তোমাকে? ঘরে নেই, ডেকে নেই, সুইমিং পুলে নেই...’

‘কি ব্যাপার? হঠাৎ এত কি দরকার হয়ে পড়ল তোমার?’ কথাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইল রানা। বিষয়বস্তুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে হয়তো ভুলে যাবে রুমানা রানার গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা।

‘গোলাম হায়দারকে দেখলাম ওই ছুঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরে চলে যাচ্ছে স্পীড বোটে করে। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেনাম না তোমাকে। সত্যি, কোথায় ছিলে বলো তো?’

‘গোলাম হায়দার কাল কত রাতে এসেছিল ইয়টে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘তা ঠিক বলতে পারব না। আমার সাথে দেখা করেনি ও।’

ডেকের দিকে এগোল ওরা। রানা জিজ্ঞেস করল, ‘গেল কোথায় ওরা?’

‘এই নলী-পথে মাইল তিনেক এগোলে বামে পাহাড়ের মাথায় ওর একটা বাড়ি আছে। গোলাম ভিলা। খুব সম্ভব সেখানেই গেছে। ওটা ওর বাগান বাড়ি। ওই যে লাল বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওরই পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠবার রাস্তা।’

‘কতদিন হলো মেয়েটা জুটেছে ওর সঙ্গে?’

‘সাত-আটদিন। যাক ওদের কথা বাদ দাও। ভুলে যেতে চাই আমি ওদের। চলো, বারের গিয়ে গল্প করা যাক। ভয় নেই—নাচ দেখাব না। শুধু দুই টোক হুইকি খাব।’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়ে গেল রানা। লিফটে করে নেমে এল ওরা বারে। লিফট থেকে বেরিয়ে একপায়ে ভর দিয়ে হাইহিলের গোড়ালির ওপর পাই করে একপাক চক্রর খেলো রুমানা।

‘এই রে! আবার বোধহয় শুরু হলো! শোনো, রুমানা...’

খিলখিল করে হেসে উঠল রুমানা। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে রাখল আহল দী অবাধ্য মেয়ের মত। অপরূপ চোখের লগ্না বাঁকা পাপড়িগুলো বুজে এল ওর।

‘শোনো, রুমানা, আজও যদি আবার নাচের সেশন আরম্ভ হয় তাহলে বলো, একুণি কেটে পড়ি আমি,’ বলল রানা মৃদু হেসে।

‘আচ্ছা, নাচব না। কই, বানিয়েছ আমার হুইকি?’

ডিভানের ওপর পাশাপাশি বসে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে নিল দু’জন। মিষ্টি একটা সেক্ট মেখেছে রুমানা। আর পরেছে রূপালী বর্ডার দেয়া দুধসাদা ড্রেস। অল্পত সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। গুনগুন করছে মিশরীয় সুর।

একে দিয়ে কথা কলাতে হবে। যতটা সম্ভব তথ্য বের করে নিতে হবে

এর কাছে থেকে—ভাবল রানা।

‘সুরটা কেমন লাগছে?’ জিজ্ঞেস করল রুমানা।

‘চমৎকার! ইঞ্জিনিয়ার সুর বুঝি? তা তুমি এই ইয়টে যোগ দিলে কবে?’

রানার পাশে বসে অনেক কথা বলতে আরম্ভ করল রুমানা। কি ভাবে কায়রো থেকে পালিয়ে যায় এক কোটিপতির সঙ্গে, তারপর এখানে সেখানে, এর কাছে ওর কাছে বিচিত্র জীবন যাপন করেছে সে। ছ’মাস হলো পরিচয় হয়েছে ওর গোলাম হায়দারের সঙ্গে। ফ্রান্স থেকে নিয়ে এসেছে ওকে গোলাম হায়দার। ইয়টেই থাকে সে বেশির ভাগ সময়। কল্পবাজার আর টেকনাফের মাঝামাঝি কয়েক বর্গ মাইল জঙ্গল কিনে নিয়েছে গোলাম হায়দার। কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করেছে মাস কয়েক হলো। হাতি শিকার করে সে সেখানে। চমৎকার একটা কাঠের বাংলো আছে ওর। ইয়টটা মাঝে মাঝে যায় ওখানে—একটা জেটি বানিয়েছে সে ওখানে ইয়টের জন্যে পাহাড় খুঁড়ে। আর যায় সুন্দরবনে শিকার করতে। বঙ্গোপসাগর দিয়ে খুলনার দক্ষিণে চলে যায় সে ইয়টে করে। একেবারে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান বর্ডারের কাছে। রাই-মঙ্গলের মোহনার দক্ষিণে ইয়ট নোঙর করে স্পীড বোটে শিকার করতে যায় সে জঙ্গলের মধ্যে। প্রায়ই যায়।

গল্প করতে করতে অনেক সহজ হয়ে উঠল রুমানা।

‘সত্যি বলো তো, সেদিন ঢাকায় তাস খেলতে গিয়ে তুমি আমাদের ঠকালে কি কৌশলে?’

‘তাসগুলো সাজানো ছিল।’

‘বদলালে কি করে?’

‘হাত সাফাই।’

‘গোলাম হায়দারও তাই বলছিল। কিন্তু ওর কথায় এই ইয়টে চলে এলে কোন সাহসে? তোমার কি ভয় বলতে কিছুই নেই? জানো, তোমাকে এখন যা খুশি তাই করতে পারে গোলাম হায়দার?’

‘জানা ছিল না আমার সে কথা।’

‘খুব সাবধান, রানা! গোলাম হায়দারের কোনও কিছু কখনও ভাল হতে পারে না—লোকটা কত খারাপ, বলে বোঝানো যাবে না।’

‘আমি সাবধান থাকব, রুমানা। তোমাকে ধন্যবাদ।’

‘আর, আমাকে বেসামাল অবস্থায় পেয়েও কোন সুযোগ নাওনি বলে তোমাকে ধন্যবাদ।’

পনেরো

বেলা চারটের সময় ঘুম ভাঙল রানার। মাথাটা ধরেছে।

দুটো অ্যালকাসেলযার পানিতে গুলিয়ে খেয়ে নিয়ে রিং করল ক্রম-সার্ভিসে গোটা কয়েক স্যান্ডউইচ আর কড়া দু'কাপ কফির জন্যে। কেবিনের দরজাটা খুলে দিল। বাথরুমের শাওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে রইল তার নিচে ঝাড়া দশ মিনিট। তারপর শুধু মাথা মুছে নিয়ে ব্যাকব্রাশ করে ডেজা শরীরে বাথরোব জড়িয়ে চলে এল বেডরুমে। এয়ারকুলার অন করে দিয়ে ইঞ্জিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল তার সামনে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল দৈহটা। আবার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু জেগে রইল সে—কাজ আছে।

দরজায় টোকা পড়তেই হাঁক ছাড়ল রানা, 'ভেতরে এসো।'

হাফ ডজন চিকেন স্যান্ডউইচ আর বড় এক পট কফি রেখে চলে গেল ওয়েটার। খেয়ে নিল রানা। কফি খেতে খেতে চিন্তা করছে। মাথা ধরাটা ছেড়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তবু মাথার ভিতর কেমন যেন ভার বোধ করল। মগজটা ভোঁতা হয়ে গেছে যেন। কফি শেষ করে ধীরে-সুস্থে তৈরি হয়ে নিল রানা। জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে এল বাইরে। বিকেনলের রোদে ঝিলমিল করছে সাগর-সঙ্গম। আফটার ডেকের রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়াল সে—যেন হাওয়া খাচ্ছে।

লোবাক দাঁড়িয়ে ক্রি যেন বলছিল একজন লোককে, নিরুৎসুক দৃষ্টিতে চাইল একবার রানার দিকে। যেখান দিয়ে ওপরে ওঠার বা নিচে নামার সিঁড়ি, সেখানে কোটের চিহ্নও নেই। রানা জানে দুটো বোট আছে এই ইয়টে। সেদিন ইয়টে উঠবার সময় দেখছিল ঠিক একই রকম দেখতে আরেকটা বোট ইয়টের পিছনে বাঁধা। একটা বোট তো নিয়ে গেছে গোলাম হায়দার, আরেকটা বোট নিশ্চয়ই আছে যথাস্থানে। ধীর পায়ে এগোল রানা। পিছন ফিরে দেখল লোবাক চেয়ে আছে ওর দিকে। স্টার বোর্ড সাইডের দিকে হেঁটে চলে গেল রানা। ঝুঁকে দেখল, আছে বোটটা। ডেক হাউসের সঙ্গে বাঁধা। লোবাকও চলে এসেছে এই ধারে। সন্দেহ করেছে, রানার মতলব আছে কোনও। কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে রইল সে। কয়েকটা সী-গাল চোখে পড়ল ওর। দূরে সবুজ গাছপালা দেখা যাচ্ছে। চোখটা তেরছা করে দেখল নড়বার লক্ষণ নেই লোবাকের দাঁড়াবার ভঙ্গিতে।

লোবাক নিশ্চয়ই আশা করবে পালাতে হলে পানিতে ঝাঁপ দেয়ার চেষ্টা করবে রানা। ইয়ট থেকে পালাতে চাইলে সেটাই স্বাভাবিক। ওর তো জানা নেই হাস্রের রহস্য ভেদ করেছে সে। সেইজন্যেই বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে

কাছাকাছি, ঝাঁপ দেবার আগেই ঠেকাবে। কাজেই রেলিং থেকে দূরে সরে গেলেই চলে যাবে সে নিজের কাছে। একটা রশি দেখতে পেল রানা। ওই রশি বেয়েই নামতে হবে ওকে। খানিকটা সরে এসে একটা ডেক চেয়ারে বসল রানা। স্টুয়ার্ডকে দেখতে পেয়ে লোবাককে ডানিয়ে রুমানাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলল। কিন্তু নড়ল না লোবাক একচুল।

সাড়ে পাচটা বাজে। এখন যদি রুমানা এসে হাজির হয় তাহলে আরও সাড়ে ছয়টা ঘণ্টা বেজে যাবে রানার। আজকের সব প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যাবে তাহলে। স্টুয়ার্ড চলে গেছে রুমানাকে খবর দিতে। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাইল রানা।

এমনি সময় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো রানার প্রতি। কয়েকজন তু ডেকের ওপর দিয়ে একটা তেলের ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে আসছিল এইদিকে, হঠাৎ একটা হিঞ্জে লেগে ফুটো হয়ে গেল। গলগল করে তেল বেরোতে আরম্ভ করল কুটো দিয়ে। হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেল লোবাক সেইদিকে। কিন্তু তার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। খুব সস্তব কারও ফেলে দেয়া সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো ছিল ওখানে।

আর দেরি করল না রানা। একলাফে রেলিং-এর ধারে চলে এল। পিছনে কি ঘটছে ফিরেও দেখল না একবার। অল্পক্ষণেই আগুনটা আয়ত্তে চলে আসবে তাতে ওর কোন সন্দেহ নেই। রেলিং উপকে চেপে ধরল রানা রশি। কয়েকজন লোকের হৈচৈ-হট্টগোলের শব্দ কানে এল। সড়সড় করে নেমে এল সে বারো-চোদ্দ ফিট নিচে। ডেক-হাউসে পৌঁছতে হলে দোলাতে হবে রশিটা। ধীরে ধীরে ঝুল বাড়তে থাকল। ওপরে কি ঘটছে, ওকে দেখতে না পেয়ে কি করবে লোবাক, কিছুই বুঝতে পারল না সে। ছুটে নিচে আসবে, না ডাইভ দিয়ে পড়বে পানিতে? নাকি, কেটে দেবে রশিটা? সোজা পানিতে গিয়ে পড়বে রানা তাহলে।

হাস্তরগুলোর অস্তিত্ব ভুলে যাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু নিচের দিকে চেয়েই অন্তরাঙ্গা শুকিয়ে গেল ওর। আবছা মত প্রকাণ্ড কি যেন দেখা যাচ্ছে পাঁচ-ছয় ফিট পানির নিচে। আর তিনবার ঝুলেই পৌঁছে গেল রানা ডেক-হাউসে। এক দৌড়ে পিছনে চলে গেল সে। একটা দড়ির মই ঝুলছে পিছন দিকে। বোটের মধ্যে শেষ হয়েছে ওটার আরেক মাথা। রেলিং উপকানোর জ্বলন্ত একটা পা উঁচু করতেই পিছন থেকে কেউ চেপে ধরল রানার কাঁধ। পিছনে না চেয়েই কনুই চালাল রানা প্রথমে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। কোয়ার্টার মাস্টার। মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে ওর আচমকা পেটের ওপর প্রচণ্ড এক ঝুতো খেয়ে। সামলে নেয়ার আগেই নক্ আউট পাঞ্চ কষাল রানা ওর নাক বরাবর। আছড়ে পড়ল সে ওপাশের রেলিং-এর উপর। কিন্তু পরমুহর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুরি বের করল লোকটা। শক্তিতে সে রানার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পালাবার পথ নেই। তলোয়ারের মত করে ছুরিটা ধরে এগিয়ে আসছে লোকটা। আঘাত, খেয়ে রানাকে ধরবার চেয়ে

মারবার দিকেই ওর আয়ত্ন বেশি মনে হলো। ত্রুক্ষ গর্জন ছেড়ে বাপিযে পড়ল সে। ছুরিটা চালাবার ঠিক আগের মুহূর্তে শ্রিংয়ের মত লাফিয়ে খানিকটা বায়ে সরে গেল রানা, তারপর বা পা-টা খানিকটা ভাঁজ করে কাৎ হয়ে ডান পায়ে লাখি চালান লোকটার হাঁটু লক্ষ্য করে। বেমক্লা লাখি খেয়ে বেকে গেল কোয়ার্টার মাস্টারের পশ, ধাক্কার চোটে পিছিয়ে গেল খানিকটা। এইবার দুই হাতে কজিটা চেপে ধরে সঁটে গেল রানা লোকটার গায়েব সাথে পিছন ফিরে। ছুরি ধরা হাতটা চিত হয়ে রয়েছে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে। নিচের দিকে হ্যাঁচকা এক টান দিতেই মড়াং করে ভেঙে গেল লোকটার হাত কনুয়ের কাছে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ করে উঠল কোয়ার্টার মাস্টার। উপকে পেরিয়ে গেল রানা রেলিং। চেয়ে দেখল ভাঙা হাতে এখনও ছুরিটা ধরা আছে। ব্যথায় গড়াগড়ি খাচ্ছে লোকটা মেঝেতে। দড়ির মই বেয়ে নেমে গেল বোটের উপর। রশি খুলে দিল বোটের।

চোখ দিয়েই স্টার্টার টানল রানা। এইটিন হর্স পাওয়ার জনসন মোটর গম্ভীর গোছের একটা গর্জন করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে উপরের ডেক থেকে ঝপাং করে পানিতে পড়ল ভারি কিছু। বোট থেকে বারো হাত তফাতে। রানার চোখে সুখে পানির ছিটে লাগল। ক্রাচ চেপেই ফরওয়ার্ড গিয়ার দিল রানা, তারপর টুইস্টগ্রিপ শ্রটলটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিল।

ভুস করে ভেসে উঠল একটা মাথা আট হাত দূরে। লোবাক। ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করেছে বোটটা—আরও অন্তত চার মিনিট লাগবে এটার ফুল স্পীড উঠতে। অয়েল-ট্যাঙ্ক ইভিকেটার কাঁটা প্রায় 'ফুল'-কে স্পর্শ করে রয়েছে, সেন্দিক দিয়ে চিন্তা নেই—কিন্তু এসে পড়েছে লোবাক। ছপাং ছপাং করে প্রকাণ্ড হাত দুটো উঠছে আর পড়ছে, পা দুটো প্রপেন্সারের মত চলছে পিছনে। দূরত্ব কমে আসছে। বোটের গতি যতই বাড়ছে ততই জোর সাঁতার কাটছে লোবাক। কিছু করবার নেই রানার। স্পীড বোটকেও যদি কেউ সাঁতার কেটে ধরে ফেলে তাহলে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয়া ছাড়া করবার আর কি থাকতে পারে?

প্রায় পঁচিশ গজ দূরে সরে এসেছে ওঁরা ইয়ট থেকে। রানা চেয়ে দেখল রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক। রুমানাকেও দেখতে পেল সে ওদের মধ্যে। আশ্র ভিনহাত এগোলেই বোট ধরে ফেন্সবে লোবাক। পিস্তল সম্পূর্ণ অকেজো। হাতের কাছে একটা কিছু নেই যা ব্যবহার করতে পারে রানা।

হঠাৎ মনে হলো রানার, দেখিই না চেষ্টা করে—হয়তো পিস্তলটা যে খারাপ করে দেয়া হয়েছে সেটা লোবাকের জানা নেই। দুই হাত দূরে থাকতে শোস্তার হোলস্টার থেকে ঝট করে বের করল রানা পিস্তলটা। সোজা তাক করল সে ওটা লোবাকের কপালের দিকে। জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো।

প্রায় ধরে ফেলেছে, তাও এই লোকটার মধ্যে কোন রকম চাকল্য দেখতে না পেয়ে আশ্চর্যই হয়েছিল লোবাক। এইবার বুঝল তার কারণ। ভীত

দৃষ্টিতে চাইল পিস্তলটার দিকে। ধমকে খেমেলগেল সে। কি যেন চিৎকার করে
বলছে স্টুয়ার্ড ইয়ট থেকে—আউট বোর্ড মোটরের গর্জনে শোনা যাচ্ছে না।
পিছিয়ে পড়ল লোবাক। অনেকখানি দূরে সরে গেল বোটটা। ম্লু হেসে চুকিয়ে
রাখল রানা ওর একান্ত প্রিয় পিস্তলটা শোশ্ডার হোলস্টারে।

এতক্ষণে শুনতে পেল লোবাক স্টুয়ার্ডের কথাগুলো। রানার পিস্তলটা
নিজের হাতে নষ্ট করে দিয়েছে ওদের মালিক—গুলি বেরোবে না ও থেকে।
আবার রওনা হতে গিয়েও খেমে গেল সে। বুঝতে পেরেছে, নাগালের বাইরে
চলে গেছে স্পীড বোট, এখন আর ধরা সম্ভব নয়।

দূর থেকে হাত তুলে টাটা করল রানা ওকে।

সাগরসঙ্গম-২

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৬৭

এক

সোজা সদরঘাটে এসে থামল স্পীড বোট। একটা খুঁটির সঙ্গে ওটাকে বেঁধে নেমে গেল রানা। কিছুদূর হাঁটতেই বেবি-ট্যান্কি পাওয়া গেল। পৌনে সাতটা বাজে। সন্ধ্যা হয় এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই আধার হয়ে যাবে। এখনই এক-আধটা বাতি জ্বলতে আরম্ভ করেছে এখানে-ওখানে। বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে উঠল রানার মন।

গোলাম হায়দারের বাগান বাড়িটার কথা জানা ছিল না রানার। ইয়টে কথায় কথায় রুমানার কাছে জেনেছে সে এই খবর। ওখান থেকেই আজ রাত্রির কাজ শুরু করবে সে। লাল বাড়িটা চিনে নিয়েছে, তারই পাশ দিয়ে গেছে রাস্তা। পাহাড়ের মাথায় গোলাম ভিলা।

লাল বাড়িটার কাছেই বেবি-ট্যান্কি ছেড়ে দিয়ে হেঁটে উঠে এল রানা অর্ধেক পথ। বাড়িটার চারপাশে উঁচু দেয়াল। ভাঙা কাঁচ বসানো। গেটটা বন্ধ। ভিতরে ঢুকবার কোনও উপায় দেখা গেল না। রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠল রানা অনেকদূর, তারপর বাঁয়ে একটা পায়ে-চলা পথ পেয়ে রওনা হলো সেদিকেই। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। খুব সম্ভব কেউ নেই বাড়িতে। দেয়াল ঘেষে পুরো বাড়িটা ঘুরল সে একবার। কোনও রাস্তা পাওয়া গেল না ঢোকার। আবার গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। কি মনে করে আশ্বে ধাক্কা দিল সে গেটে। ঝড় ঝড় করে চার ইঞ্চি ফাঁক হয়ে গেল সেটা। সন্ধ্যার নিস্তক্কা আবহা অন্ধকারে এই শব্দটা কানে বড় বেশি করে বাজল রানার। মনে হলো সবাই গুনতে পাচ্ছে। গেটের ফাঁকে সাবধানে চোখ রাখল সে। সোজাসুজি একটা গ্যারেজ দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড, কালো মার্সিডিস গ্লী হান্ড্রেড দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেজের ভিতর রানার দিকে মুখ করে। চকচকে নিকেল করা নাক দেখেই গাড়িটা চিনতে পারল সে। তিন মিনিট চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। না। কেউ নড়ছে না গ্যারেজের ভিতর। আশপাশে স্বতন্ত্র দেখা যায় জনমানবের চিহ্ন নেই। বাড়ির সামনে ঘাস বিছানো প্রকাণ্ড গ্রাসপ। ফাঁকা। মনে হলো যেন ঠোটে তর্জনী রেখে 'চুপ!' বলে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। একটিও বাতি জ্বলছে না কোথাও।

বিস্মিতা বলে ঢুকে পড়ল রানা। প্রথমেই সোজা চলে গেল সে গ্যারেজ। সামনের বন্বের উপর হাত রেখেই টের পেল, অলঙ্কণ আগেই ব্যবহার করা হয়েছে গাড়িটাকে। গরম হয়ে রয়েছে এঞ্জিন। গ্যারেজের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল সে। চারদিক নিস্তক্কা। যে লোকটা এই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছে সে বোমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

অদ্ভুত এক ধমধমে নীরবতা বিরাজ করছে বাড়িটা ঘিরে।

পিছন দিকে একপাক ঘুরে সামনে চলে এল রানা। গাড়ি-বারান্দা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখল দরজা বন্ধ। হয় বাইরে থেকে চাবি লাগানো, নয়তো ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। বাড়িটা যদি তালাই মারা হবে তাহলে গাড়ির এঞ্জিন গরম কেন? বাড়ির পিছনে মালীর ঘরে ঢোকেনি তো ড্রাইভারটা? যাই হোক, ঢুকতে হবে এই বাড়িতে। দরজার সামনে রাখা পাপোশের তলায় আশা করেছিল রানা চাবিটা, কিন্তু পেল না। পিছনের খোলা জানালা দিয়েই ঢুকতে হবে।

বাথরুমের মধ্যে ঢুকল রানা জানালা গলে। পাশেরটা ডাইনিংরুম। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেল সে ড্রইংরুমের ভিতর দিয়ে একটা রীডিংরুমে। মহা মূল্যবান আসবাবে সাজানো প্রত্যেকটি ঘর। সূরুচির পরিচয় রয়েছে প্রতিটি জিনিস ঠিক জায়গা মত গুছিয়ে রাখার নৈপুণ্যে। পা টিপে চলে এল রানা সিঁড়িঘরের কাছে। কাঠের সিঁড়ি। বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে উঠে গেল সে দোতলায়।

প্রথম ঘরটা তালা মারা। সেটা ছেড়ে অন্যান্য ঘরগুলো পরীক্ষা করল সে। অসম্ভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না ওর। করিডরের শেষে বাথরুমটায় ঢুকেই ধমকে গেল। মোজাইক করা মেঝের ওপর দু'ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে।

নিচু হয়ে লক্ষ করল রানা রক্তটা তাজা। এখনও কালচে হয়ে আসেনি। একটা ব্র্যাকেটের ওপর স্নো, সাবান, চিরুনি, ক্ষুর, পাউডার রাখা। সব গুরুত্ব। আশ্চর্য!

সিঁড়ির মাথায় ফিরে যেতেই অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল রানা। ধমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল সে। কিন্তু আর হলো না কোনও শব্দ। যতদূর সম্ভব তেতলা থেকে এসেছে শব্দটা। টর্চ নিভিয়ে অতি সাবধানে উঠে এল রানা তেতলায়। সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল চারপাশে। ট্র্যাপ হতে পারে।

হঠাৎ আবার শব্দটা শুনতে পেল রানা। অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। চটাস্ করে চড় পড়ল কারও গালে। এগিয়ে গেল রানা। তৃতীয় ঘরটার বন্ধ দরজায় কান পাতল। চাপা কণ্ঠে কথা বলে উঠল কেউ।

‘তাহলে বলবি না? ঠিক আছে, চিরতরে মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি তোরা, শুয়োরের বাচ্চা!’

গোঙানির শব্দ হলো আবার। মুখ বন্ধ করে গোঙাচ্ছে কে যেন। অনেক চেষ্টা করল রানা ঘরের ভিতরটা দেখবার জন্যে। কিন্তু দরজা বন্ধ তো আছেই, ওপাশে কালো পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া আছে। কিছুই দেখতে পেল না সে।

দোতলার ঘরগুলোর কথা মনে হলো রানার। প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে দিয়ে পাশের ঘরে যাবার দরজা আছে। দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল রানা। ওপাশের ঘরে যাবার দরজাটাও বন্ধ। কিন্তু পর্দা নেই। দরজার গায়ে এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ভিতরের বেশ খানিকটা অংশ দেখতে পেল সে।

একজন লোকের পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সে রানার দিকে পিছন ফিরে। প্রকাণ্ড চেহারা। একটা রশি ঝুলছে ছাত থেকে লোকটার দুই হাত সামনে। লোকটার এক হাতে চকচকে ছুরি একটা, আরেক হাতে বড় সাইজের স্ট্যাপলিং মেশিন।

‘জিনিসটা দিয়ে দিলেই প্রাণ বাঁচাতে পারতিস, হারামজাদা। যাক, মালিকের হুকুম, প্রথমে একটা চোখ তুলতে হবে। ভাবছি কোন্টা তুলব, বাম চোখ, না ডান চোখ?’ বলেই বীভৎস কণ্ঠে হেসে উঠল লোকটা।

টেলিফোন বেঞ্জে উঠল ঘরের ভিতর। হাসি থামিয়ে সেদিকে এগোল সে। লোকটা সামনে থেকে সরে যেতেই চমকে উঠল রানা।

দুই হাত বাঁধা অবস্থায় সিলিং থেকে ঝুলছে গিলটি মিঞা!

দুই

নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে গিলটি মিঞার। দুই ঠোঁট একত্র করে স্ট্যাপল করা। কপালের ডানধারটা ফুলে আছে অনেকখানি। গালে গোড়া গোড়া দাগ—বোধহয় চক্কটের আঙুন ঠেসে ধরা হয়েছিল সেখানে। সরল নিষ্পাপ দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত—কিন্তু জল নেই সে-চোখে। এদের কাছে করুণা ভিক্ষা করা যে বাতুলতা এটুকু সে বুঝে নিয়েছে।

অপরিপুষ্ট, শীর্ণ, ক্ষীণ, দুর্বল এই লোকটা কী এমন ক্ষতি করেছে এদের যে এমনি ভয়ঙ্কর চরম শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে? ওর বালকসুলভ সরল মুখটার দিকে চেয়ে মাথায় খুন চেপে গেল রানার। ইঠাৎ খেয়াল করল রাগে ধরধর করে কাঁপছে সে। সারা দেহের পেশীগুলো টান হয়ে গেছে ওর। ঘরের মধ্যে কয়জন লোক আছে জানে না সে—জানবার দরকার নেই। লোকটার কাছে ছুরি ছাড়া আর কি অস্ত্র আছে জানে না সে—জানবার দরকার নেই। কিছুটা পিছিয়ে এসে দৌড়ে গিয়ে দড়াম করে লাথি মারল রানা কপাটের মাঝ বরাবর, প্রাণপণ শক্তিতে।

ছিটকিনি ভেঙে দরজা খুলে যেতেই হড়মুড় করে পড়ল রানা পাশের ঘরের মেঝের উপর। কথা বলছে লোকটা তখনও টেলিফোনে। মুখের এক পাশ দেখেই চিনতে পারল রানা—সেদিন রাস্তার ওপর যে লোকটাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে এসেছিল, এ সেই তৃতীয় লোকটা। প্রকাণ্ড চেহারা, গালে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। যেন কিছুমাত্র বিস্মিত হয়নি, এমনি ভাবে ফোনটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা ছুরি হাতে। ঝাঁক করে পিস্তল বের করল রানা। ভাবল, এবারও নিশ্চয়ই কাজে লেগে যাবে কৌশলটা। কিন্তু পিস্তল দেখেই হেসে উঠল লোকটা। তরমুজের বীচির মত

দুই সারি নোংরা কালো দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কাটা দাগটা কুঁচকে ওঠায় আরও বীভৎস দেখাচ্ছে ওকে।

‘আমাকে বুদ্ধি লোবাক পাওনি, বাছা, যে খেলনা দেখিয়ে কাবু করবে। আন্ত এসো তোমার বাহাদুরি ঘুচিয়ে দিই।’ এক পা এগোল লোকটা রানার দিকে।

রানা বুকল ফোনে ওর কথাই হজ্বিল। আর এ-ও বুকল, এই হৃদযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ফোনটা ক্রেডলের ওপর রাখেনি লোকটা, রেখেছে টেবিলের ওপর। ঘরের সমস্ত কথাবার্তা ওনতে পাচ্ছে রিসিভার কানে ধরা ওপাশের লোকটা। অর্থাৎ দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা দলবলসহ।

সাঁ করে ছুঁড়ে মারল রানা পিঙ্কলটা। খপ করে ফ্রিক্কেট বল ধরার মত বাম হাতে ধরে ফেলল লোকটা সেটা শূন্যেই। একই গতিতে ফিরে এল সেটা রানার দিকে। এতটা আশা করেনি রানা। সরে যাবার সময় পেল না সে। দড়াম করে বাঁটটা এসে পড়ল ওর বুকের ওপর।

লাফিয়ে চলে এসেছে লোকটা কাছে! খাটের পাশে রাখা টিপয়টা তুলে নিল রানা। প্রথম আঘাতটা গেল টিপয়ের ওপর দিয়ে। লাথি চালান রানা কিন্তু লাগল না। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। এক সেকেন্ডের এই সুযোগটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল লোকটা। বাম হাতের এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল সে সামনে থেকে টিপয়টা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপুল বিক্রমে। পড়ে গেল রানা। পেটের উপর চেপে বসে ছোঁরা তুলল লোকটা রানার বুক লক্ষ্য করে।

এমনি সময় ধাঁই করে এক লাথি পড়ল লোকটার হাতের ওপর। শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় সব দেখছিল গিলটি মিঞা—ঠিক সময় মত চালান লাথিটা। ছিটকে চলে গেল ছুরি কোণে দাঁড়ানো আলমারির তলায়। সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ে পৌঁচিয়ে ধরল গিলটি মিঞা লোকটার গলা। পা দুটো ছাড়বার চেষ্টা না করে দুই হাতে টিপে ধরল লোকটা রানার গলা। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওর দুই কনুই ধরে দুই দিক থেকে চাপ দিল রানা জোরে। বাপরে বলে হাত সরিয়ে নিল সে রানার গলা থেকে। হাত দুটো অবশ হয়ে গেছে ওর। চোখে সরষে ফুল দেখছে সে এখন। কিন্তু তবুও হেঁচকা টানে শক্তিশালী লোকটা ছাড়িয়ে ফেলল গিলটি মিঞার পা। এবার পিছন থেকে রানার দুই পা উঠে এল বাঁকা হয়ে। গলায় বাধিয়ে জোরে এক ধাক্কা দিতেই ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল লোকটা রানার গায়ের ওপর থেকে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা। লোকটাও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কোনরকম সুযোগ দিলে চলবে না। প্রচণ্ড এক লাথি চালান রানা ওর তলপেটে। ছিটকে পড়ল সে দেয়ালের গায়ে। মাথা ঠুঁকে গেল দেয়ালের সঙ্গে। দমাদম দুটো ঘূসি পড়ল নাকের ওপর। পা ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। আরেকটু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে পড়বার আগে আঙুলগুলো সোজা রেখে রাম দা চালানোর মত রক্ষা লাগিয়ে দিল রানা ওর কানের লতির দেড় ইঞ্চি নিচে। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে

পড়ল ওর জ্ঞানহীন দেহটা। বাস্, আবেষ্টার জন্যে নিশ্চিত।

আলমারির তলা থেকে ছুরিটা বের করে রশি কেটে নামিয়ে আনল রানা গিলটি মিঞাকে। মাংস ফুঁড়ে চোঁট দুটো স্ট্যাপল করা। অতি সাবধানে যত্নের সঙ্গে ছুরির আগা দিয়ে সোজা করল রানা স্ট্যাপল পিনের দুই মাথা। এবার আশু চাড় দিতেই বেরিয়ে এল খানিকটা। রানা বুঝল অত্যন্ত ব্যথা পাচ্ছে গিলটি মিঞা। রানার এই অবস্থা হলে পানি বেরিয়ে যেত চোখ থেকে। কিন্তু একবিন্দু পানি নেই গিলটি মিঞার চোখে। নিজেই এবার একটানে বের করে আনল পিনটা। জামার আঙ্গিনে মুছে ফেলল চারফোটা রক্ত।

‘উহ! একেবারে দারোগার মার মেরেচেন, স্যার। স্না কোনদিন ভুলবে নি কো। চলুন, এখন কেটে পড়া যাক।’

অবাক হলো রানা গিলটি মিঞার উপমা শুনে। টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভারটা কানে তুলল সে। কোনও শব্দ নেই। একবার নামিয়ে রেখে আবার কানে তুলতেই ডায়াল টোন পাওয়া গেল। অর্থাৎ রিসিভার নামিয়ে রেখেছে ওধারের লোকটা। রওনা হয়ে গেছে এতক্ষণে।

‘আর কোনও লোক আছে এ বাড়িতে?’ জ্ঞানহীন লোকটার পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘না, স্যার, আর তো কোনও লোক দেখলুম না।’

‘তবু সাবধানে নামতে হবে।’

সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নেনে এল ওরা নিচে। নামতে নামতে থেমে গিয়ে দুই-তিনবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা সত্যিই গিলটি মিঞা ওর সাথে নামছে কিনা। কারণ রানার পায়ের এবং জামাকাপড়ের সামান্য ঝশঝশ আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু গিলটি মিঞার চলায় বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। প্রতিবারই দেখতে পেয়েছে রানা, পিঠের কাছে স্টেটে আছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নামছে, কিন্তু আশ্চর্য রকম নিঃশব্দ ওর চলা।

জানালা গলে নেমেই আকর্ষণ-বিস্তৃত হাসি দেখতে পেল রানা গিলটি মিঞার মুখে। কৌতূহল হলেও জিজ্ঞেস করল না রানা কিছু। দ্রুত এগোল সে গ্যারেজে দাঁড়ানো মার্সিডিস গাড়িটার দিকে।

এমনি সময় খুলে গেল গেটটা। তীব্র একটা আলো পড়েছে গেটের ওপর। এসে পড়েছে ওরা। একছুটে ঢুকে পড়ল রানা গ্যারেজের ভিতর। লুকিয়ে পড়ল গাড়িটার আড়ালে। সা করে গাড়ি-বারান্দার দিকে চলে গেল একখানা সিটিন ডি.এস.। সিটিনের এঞ্জিন বন্ধ হবার আগেই চালু হয়ে গেল মার্সিডিসের এঞ্জিন। গেটটা অর্ধেক লাগিয়ে ফেলেছিল একজন লোক, পাঁচ হাত তফাতে দপ করে মার্সিডিসের হেড লাইট জ্বলে উঠতেই লাফিয়ে সরে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা সিটিন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন লোক গাড়ি-বারান্দায়। বাম পাশের বাম্পার দিয়ে ঠেলেন খুলে ফেলল রানা গেট। তারপর দ্রুত নামতে আরম্ভ করল রাস্তা বেয়ে। লাল বাড়িটার কাছে এসে পিছন ফিরে চাইল রানা একবার। জ্বলজ্বল করছে সিটিন ডি.এসের চোখ। পিছু পিছু নেমে

আসছে সেটা টিলা থেকে।

এতক্ষণ পর কথা বলল রানা।

‘কি হে, গিলটি মিঞা, তখন হাসছিলে কেন?’

‘কখন, স্যার?’

‘ওই যে জানালা দিলে বেরিয়ে?’

‘ও। ভাবছিলুম স্যার, আপনারা বড় বড় কারবার করেন, মন্ত কোনও গদি কিংবা ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক ম্যানেজ করেন, কিন্তুক আমাদের কায়দাও দিব্যি রঙ আছে। এতখানি আশা করতে পারিনি, স্যার, তাইতেই হাসছিলুম।’

গিলটি মিঞা কি বলতে চায় ভাল করে বুঝতে পারল না রানা। কাজের কথায় এল সে এবার।

‘তোমাকে কেন ধরেছিল ওরা? আর এত অত্যাচারই বা করছিল কেন?’

‘স্যার, সত্যি বলতে কি, কেন যে ওরা এত খেপে গেল আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আপনার কাছে গোপন করবার কিছুই নেই। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। ক’দিন আগে আন্দরকিল্লার একটা বাড়িতে খ্রি সেবেনটি নাইন করতে গিয়েছিলুম। টিপ-টপ হাল ফ্যাচাঙের বাড়ি—কিন্তুক লোকজন আছে বলে মনে হলো না। ঝাড়া দু’টি ঘণ্টা লাগল আমার গুদু ভেতরে ঢুকতেই। জানালাগুলোয় সব মর্টিস লক্ মারা, অ্যালার্মের ব্যবস্থা। মনে সন্দো হলো—এই নির্জন বাড়িতে এত সব বায়নাঙ্কা কেন। ক্যালকাটাতেও কালেন্ড্রে এ-রকম এক-আদটা বাড়ি চোকে পড়েছে। তিন-তিনটে অ্যালার্মের তার কাটলুম, স্যার। একবার ডাকলুম খামোকা সময় নষ্ট করছি, পরমুহুর্তে ওস্তাদের কতা মনে পড়ল—কষ্ট করলে কেউ মিলবেই। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না, স্যার, কিছুই চোকে পড়ল নি। বত্রিশ বচোর এ লাইনে আছি, স্যার—এমনটি আর কখনও দেখিনি।’

‘মানে তুমি কি চুরি করতে ঢুকেছিলে?’ রানা অবাক না হয়ে পারল না। ঝানু চোরকে সে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে খুনে ডাকাতির হাত থেকে। বাহ। কাজের কাজই করেছে! এইবার ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এত মানেও চোখ দিয়ে পানি বেরোয়নি কেন গিলটি মিঞার।

‘ওই একই কতা, স্যার,’ বলল গিলটি মিঞা। ‘আপনারা বড় বড় ব্যাঙ্ক, অফিস, আদালত দিনে-দুপুরে ম্যানেজ করেন পেন্ডুল দেখিয়ে, আর আমরা কাজটা নিরিবিবি রাতের অম্ভোকারে চুপি চুপি সারি। লাইনটা তৈরি একই। রাতে ম্যানেজ করি বলেই কাজটা ছোট হয়ে গেল নাকি, স্যার?’

অবাক হয়ে গিলটি মিঞার মুখের দিকে চাইল রানা। না, ঠাট্টা করছে না। তার মানে ওর স্থির বিশ্বাস একই লাইনের লোক রানা এবং ও। আজ দিনে তেমন কিছু জ্যোটেনি দেখে সন্ধে লাগতে না লাগতেই নেমে এসেছে রানা ওর পর্যায়ে—টুকে পড়েছে জানালা গলে। চট করে রিয়ার ভিউ মিররে নিজের চেহারাটা দেখে নিল সে। একবার ডাকল, সেই রকমই কি লাগে? না তো!

‘আচ্ছা, যাই হোক। তারপর কি হলো, বলো।’

‘বের করলুম। টাকা, স্যার। ঘর ভর্তি টাকা। দোতলায় পাশাপাশি তিনটে ঘর একশো, পঞ্চাশ আর দশ টাকার নোটে ঠাসা। ছাদ সমান উঁচু করে ঠেকি দেয়া। আমার বাপের জন্মেও এত টাকা আমি দেকিনি এক সাতো।’ ওণে ওণে লাক তিনেক ব্যাণে পুরলুম। আর আটলোনি। আরেকটা ঘরে যন্তোর ছিল কতকগুলোন। আর ছিল ক্যামেরা একটা। একটা চক্চকে যন্তোর পচোন্দ হয়ে গেল। ক্যামেরা আর সেই যন্তোরটা নিয়ে চলে এলুম। পরদিন ক্যামেরাটা বিক্রি করতে যেয়েই বোধায় চোকে পড়ে গেলুম ওদের। এমনতেই এক হারামী সাব-ইন্সপেক্টর কিছুদিন যাবত অঠার মতন লেগে আছে পিচনে, তার ওপর আবার বিচ্ছিরি চেহারার লোকগুলোর পাল্লায় পড়ে ভাবলুম, ভালো বিপদ রে, বাবা! প্রথম দিন শুধু মুকে মুকে কতা হলো। পাত্তাই দিলুম না। ওরা বললে, টাকা চাই না, যন্তোরটা দিয়ে দাও। আমি মনে মনে বললুম, লে হালুয়া, লিয়েচি কি দেবার জন্যে? এক স্যাঙাৎকে দিয়ে ঢাকায় পেটিয়ে দিলুম ওটা। বললুম, সৈয়দ ওয়ালিউল্লা চৌধুরীর নামে যেন পোস্ট পার্সেল করে পেটিয়ে দেয় এখানে...’

‘সৈয়দ ওয়ালিউল্লা চৌধুরী কে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে সিট্রাম ডি. এস.। কিন্তু ভয়ের কিছুই নেই। স্টেশন রোডে এসে পড়েছে ওরা।

‘ওটা আমারই ভাল নাম, স্যার,’ বলল গিলটি মিঞা একগাল হেসে।

‘বলো কি? সৈয়দের ছেলে হয়ে তুমি...’

‘আমি সৈয়দের ছেলে না, স্যার। আমার ছেলেপুলে যারা হবে তারা হবে সৈয়দের ছেলে। নামের সামনে পিচনে নিজেই দুটো ছাপ মেরে নিইচি। এ রকম অনেকেই করচে হরহামেশা। একবার চালু হয়ে গেলে আর কে ঠেকায়? কেউ সন্দো করে না। তা যা বলছিলুম, স্যার, শালারা ধরে ফেললে। আথাবাদের গোলাম চেয়ারে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁদে রেকে অকতা অতোচার করলে। একুশ দফা হাজত আর জেল খেটেচি স্যার, কিন্তুক এত কষ্ট পাইনি আর কখনও। স্বীকার গেলুম। কিন্তুক ওরা বলচে আমি মিথো কতা বলচি। পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে আসচে আর বলচে এই নামে কোন পোস্ট-পার্সেল আসেনিকো। খুব মেরেচে, স্যার, ন্যাংটো করে সারা গায়ে সিগ্রেটের আগুন দিয়ে ছাঁকা-দিয়েচে। তিনদিন তিনরাত না বাইয়ে রেকে আজ একেবারে সাবডে দেয়ার যোগাড় করেছিল। সেদিনকে যে পালিয়েছিলুম, ধরে নিয়ে গিয়ে সে কি মার! তবে, স্যার, মার অনেক খেইচি, ওসব পরোয়া গিলটি মিঞা করে না। কিন্তুক দুঃখ, সাদারপ একটা যন্তোরের লেগে এত যন্তোনাও ছিল কপালে!’

‘যন্তোটা পাওয়া গেল না কেন? তোমার স্যাঙাৎ কি পাঠায়নি ওটা?’

‘সেই তো ভ্যবচি, স্যার। সে তো ওরকম ছেলে নয়। তবু এরা বলচে আসেনি...’

‘টাকাগুলোর কি হলো?’ বিশ্বাস করেনি রানা টাকার গল্প।

‘দু’লাক স্বীকার গিয়েছিলুম—ওরা নিয়ে নিয়েচে। শালারা টেরও পায়নি যে এক লাক গাপ্ করে দিইচি—এতই টাকা ওদের!’

‘এক লাখ টাকা কি করেছে?’ দূরে আবদুল হাইয়ের বাড়ির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল রানা।

‘দান করে দিইচি। এক স্যাঙাৎ বড় দুঃখে পড়েছিল। সে আর এক হিস্টিরি। আমারই...’ হঠাৎ সচকিত হয়ে রানার মুখের দিকে চাইল গিলটি মিঞা। ‘এ কোতায় নিয়ে এলেন, স্যার? চারদিকে তো পুলিশ দেকচি খালি! প্রাণে বাঁচিয়ে শেষ কালে ধরিয়ে দিলেন, স্যার? আপনি তাহালে পুলিশের লোক।’

মিলিটারি পুলিশ গাড়ি আটকাল। আবদুল হাইয়ের বাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আর্মড ফোর্স। খুব সম্ভব মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের আদেশে। আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখাল রানা। শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল সার্জেক্টের। খটাশ করে বুটে বুট হুকে স্যালুট করল সে। গাড়ি গিয়ে থামল সোজা আবদুল হাইয়ের গাড়ি-বারান্দায়।

‘আমি পুলিশের লোক নই, গিলটি মিঞা। এরাও কেউ পুলিশ নয়—মিলিটারি। তোমার ভয়ের কিছু নেই। নেমে এসো আমার সঙ্গে।’

চোখ হানাবড়া করে চেয়ে রইল গিলটি মিঞা রানার দিকে। কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা বলতে পারল না। তারপর বলল, ‘অনেক অন্যায্য কথা বলে ফেলেচি, স্যার, মাপ করবেন। আপনাকে আমারই মতন চোর-ছাঁচোর ডেবে...’

‘ওসব ভুলে যাও, গিলটি মিঞা। আমাদের হাতে সময় নেই। নিশ্চিন্তে চলে এসো।’

বেরিয়ে এল গিলটি মিঞা গাড়ি থেকে। রানার পিছন পিছন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে এল ড্রইংরুমে। রানার অনুরোধেও বসল না সে, দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ সরল নিষ্পাপ দুই চোখ মেলে।

দরজার কাছে একজন ইউনিফর্ম পরা লোককে কি যেন বলল রানা। খটখট জুতোর শব্দ ভুলে চলে গেল লোকটা।

‘শোনো, গিলটি মিঞা। তোমাকে ছেড়ে দিলে কতক্ষণ ওদের হাত থেকে বেঁচে থাকতে পারবে বলে মনে করো?’

‘ছেড়ে নিয়ে দেকুন না, স্যার। একবার ধরে নিয়েচে বলেই কি বারবার? আমার ন্যাজের কাছেও তো আসতে পারবে না ওরা আর। খি-সেবেনটি নাইন করি আজ বক্সিশ বচোর...’

‘আচ্ছা, আরেকটা কথা। সৈয়দ ওয়ালিউল্লা চৌধুরী—এতবড় নামটা যদি তোমার স্যাঙাৎ ভুলে গিয়ে থাকে, তাহলে কি নামে পাঠাবে সে জিনিসটা?’

চমকে উঠল গিলটি মিঞা। বিশ্বয় ফুটে উঠল ওর চোখে। হঠাৎ অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। বলল, ‘হায় খোদা! এই সামান্য কতটা

একবার যদি মৃত্যু আসত! ঠিক বলেছেন, স্যার, তাই হয়েছে। গিলটি মিঞার নামেই ও পেটিয়েচে যন্ত্রোন্টা। উই! কী অকত্যা অত্যাচারটা...

‘শোনো, গিলটি মিঞা, আমাদের পেছনে লোক লেগে গেছে তা তো দেখতেই পেয়েছ। ওই কালো গাড়িটা নিয়ে সেজন্যে আমার মত দেখতে একজন লোক চলে গেছে পাহাড়তলীর দিকে। আরেকজন লোক আরেকটা গাড়ি নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওই বড় রাস্তার ওপর। এখনি বেরুতে হবে আমাকে। পিছন দরজা দিয়ে গোপনে বেরিয়ে যাব আমরা। কোথায় নামতে চাও তুমি?’

‘যেখানে খুশি ছেড়ে দিন আমাকে, স্যার। এক মিনিটে হাওয়া হয়ে যাব।’

‘বেশ, চলো তাহলে।’

দশ মিনিট পর আতর ডিপোর এক গলির মুখে নামিয়ে দিল রানা গিলটি মিঞাকে। রানার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে পিছন ফিরল গিলটি মিঞা। কয়েক পা গিয়েই থামল রানার ডাকে। দশ টাকার দুটো নোট এগিয়ে দিল রানা।

‘তোমার পেটে তো দানাপানি পড়েনি কিছুই গত তিনদিন। পয়সাও নেই পকেটে। এটা দিয়ে কিছু কিনে খেয়ে নাও গিয়ে।’

চুপচাপ টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গিলটি মিঞা। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল ওর সরল নিষ্পাপ চোখ দুটো। এত মারেও যার চোখ থেকে একফোটা পানি পড়েনি সেই গিলটি মিঞারই গাল বেয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল দু’ফোটা তপ্ত অশ্রু। হঠাৎ ঘুরে বাম পা-টা টেনে টেনে অদৃশ্য হয়ে গেল সে ভিড়ের মধ্যে।

তিন

পোস্ট অফিস থেকে প্যাকেটটা নিয়ে ফিরে এল রানা হাইয়ের বাংলোয়।

প্যাকেট থেকে বেরোল অদ্ভুত একটা পিনিয়ান জাতীয় পার্ট। কোন্ মেশিনের পার্ট বোঝা গেল না। একটা জায়গায় ই এল ৩১৫৭ এবং মেড ইন জার্মানী লেখা। এই ছোট্ট জিনিসটার কী এমন গুরুত্ব থাকতে পারে যে প্রাণ যেতে বসেছিল গিলটি মিঞার?

ডিনার খেয়ে নিয়ে আরাম করে বসল রানা আরম্চেয়ারে। কফির কাপ হাতে নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। এই কয়দিনের প্রত্যেকটি ঘটনা মনে মনে খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারল, গোলাম হায়দারের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণও আবিষ্কার করতে পারেনি সে।

আশ্চর্য! কোনও প্রমাণ নেই রানার হাতে। অথচ প্রমাণ ছাড়া এতবড় একজন লোককে খামোকা হেনস্তা করলে হলদুল পড়ে যাবে সারা দেশে।

প্রমাণ তো দূরের কথা, কিসের প্রমাণ সে চায় তা-ও জানা নেই রানার। কিছু একটা করছে গোলাম হায়দার। ভয়ঙ্কর কিছু। অন্য দেশের প্রত্যক্ষ সাহায্য আছে ওর পিছনে। কিন্তু কি সেই জিনিস? কি করছে বা করতে যাচ্ছে গোলাম হায়দার?

নিজের বিত্তী বেকায়দা অবস্থার কথা চিন্তা করে রাগ হলো রানার। আত্মরক্ষা ছাড়া কিছুই করবার নেই ওর এখন। নির্বিচারে আক্রমণ করে চলেছে গোলাম হায়দার যেদিক থেকে খুশি। কিছুই বলতে পারবে না সে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া। রানার যদি মৃত্যুও হয় এই আক্রমণের মুখে, কারও কিছু করবার নেই।

কিন্তু তাই বলে যা খুশি তাই করবে নাকি গোলাম হায়দার? বেশি সময় এবং সুযোগ পেলে ভয়ঙ্কর কিছু করে কসবে। যে করেই হোক ঠেকাতে হবে ওকে। আগামীকাল কল্লবাজার রওনা হবে রানা। কিন্তু তার আগে আজ একবার দেখা হওয়া দরকার গোলাম হায়দারের সঙ্গে।

উঠে দাঁড়াল রানা। হঠাৎ সামনের টেবিলে একটা ছায়া দেখতে পেয়ে পাই করে ঘুরে দাঁড়াল। আকর্ষণবিশ্বৃত হাসি হেসে দাঁড়িয়ে রয়েছে গিলটি মিঞা।

‘চিন্তে করচেন বলে ডিস্টাট বরলুম না, স্যার। বিশ মিনিট ধরে ডেঁড়িয়ে রইচি।’

‘চুকলে কি করে তুমি এই বাড়িতে, গিলটি মিঞা?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। ‘চারপাশে মিলিটারি পাহারা দিচ্ছে। কেউ বাধা দিল না তোমাকে?’

‘দিত স্যার, দেকতে পেলেনই ঐটকে দিত। তাই নুকিয়ে চলে এলুম।’

যেন এমন কিছুই কাজ করেনি, এমনি স্বাভাবিক ভাবে কথাগুলো বলে গেল গিলটি মিঞা; অথচ ধরা পড়লে যে ওরা গুলিও ছুঁড়ে বসতে পারত সে জানটুকুও আছে ওদিকে টনটনে।

‘তা কি ব্যাপার? হঠাৎ চলে এলে যে?’

‘জিনিসটা রাকতে এলুম।’ পকেট থেকে কালো রঙের ছোট্ট একটা বাজ্রমত কি যেন বের করল গিলটি মিঞা। একটা বোতাম টিপতেই ডালা খুলে গিয়ে একখানা সাইমা টাইম পিস বেরিয়ে পড়ল। এবার চিনতে পারল রানা। গত বছর হংকং থেকে নিয়ে এসেছিল সে ওটা আবদুল হাইয়ের জন্যে। কী খুশিই না হয়েছিল সে ওটা পেয়ে! ঘড়িটাকে গিলটি মিঞার পকেট থেকে বেরোতে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানা ওর মুখের দিকে।

‘ওই টেবিলটার দু’লম্বর দারাজের ভেতর ছিল, স্যার। লোভ সামলাতে না পেরে ম্যানেজ করে ফেলেছিলুম। মনটা বড় খুঁত খুঁত করতে লাগল, স্যার। তাই ফেরত দিতে এলুম।’

‘তুমি ওটা চুরি করেছিলে?’

‘আমি একে চুরি বলি না, স্যার। একটা সকের জিনিস, সক হয়েচে

লিয়েচি। চাইলে দেবে না, কিনবার পয়সা নেই—অতচ সৰু হয়েছে। কি করবে তখন মানুষ, বলুন? যে যা চাইতে সে যদি তাই পেত তাহলে সব চোর ব্যামো হয়ে মারা যেত, স্যার। আর আমার নামও গিলটি মিঞা হত না।

‘কেন, নামটা তো ভালই লাগে আমার কাছে,’ বলল রানা মৃদু হেসে।

‘আমার ওস্তাদ নামটা দিয়েছিল বলে আপত্তি করিনি—আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না, স্যার। গিলটি কতাতার মানে ভাল না। একুশ দফা কাঠগড়ায় ডেঁড়িয়ে এই কতটা স্বীকার যেতে হয়েছে আমাকে বিচারের শেষে। পাঁচবারের বার বিরক্ত হয়ে উটলুম, স্যার। ঘণ্টা ভর মিচে প্যানর প্যানর যাতে গুনতে না হয় তাই কাঠগড়ায় ডেঁড়িয়েই বলে উটলুম—গিলটি। গুনে তো আমার ওস্তাদ হেসেই খুন। সঙ্গে সঙ্গে নাম দিয়ে দিলে গিলটি মিঞা। ও নামটা আমার পচোন্দ নয়, স্যার।’

কথা গুনতে গুনতে জামা কাপড় পরতে আরম্ভ করে দিয়েছিল রানা। এগিয়ে এল গিলটি মিঞা।

‘কোতাও চললেন নাকি স্যার, আবার?’

‘হ্যাঁ, একটু বেরোতে হবে।’

‘রাস্তার দু’মাতায় চারজন করে লোক তোয়ের আছে, স্যার, আপনার জন্যে। এইসব দারোয়ানগুলোর ভয়ে এগোতে পারচে না। তাছাড়া রাত হয়েছে লটা-দশটার কম নয়। এখন বেরোনো কি ঠিক হচ্ছে?’

‘তোমাকে কে আমার গার্জেন বানাল, গিলটি মিঞা?’

‘তোবা, তোবা! এ আপনি কি বলছেন, স্যার? আমি আপনাকে বারণ করবার কে? তবে কিনা এখান থেকে বেরোবার একটা গোপন রাস্তা আমার জানা আছে—তাই বলছিলাম...’

‘বেশ, সেই গোপন রাস্তা দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাও। তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে না।’

নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না গিলটি মিঞার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রানা আবার বলল, ‘কি হে, ডেঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও।’

‘রাগ করলেন, স্যার? বেয়াদবি হয়ে থাকলে নাহায় জোড়হাত করচি মাপ করে দিন, চুকে যাক ল্যাঠা।’ রানার ক্লেদ উত্তর না পেয়ে যোগ করল ‘আর যদি সিঁদে আঁতুলে ঘি না ওটে, তাহলে পা চেপে ধরব বলে দিচ্ছি, শেষকালে লজ্জায় পড়ে যাবেন, স্যার।’

হেসে ফেলল রানা। আচ্ছা পাল্লায় পড়েছে সে।

রানাকে হাসতে দেখে দ্বিগুণ জোরে নিজেই হাসতে আরম্ভ করল গিলটি মিঞা। বলল, ‘হাসলে বড় সুন্দর দেখায় আপনাকে, স্যার। একেবারে উত্তম কুমারের মত।’ রানাকে গভীর হয়ে যেতে দেখে বলল, ‘না না, দিলিপ কুমারের মত।’ তাতেও যখন রানা খুশি হলো না তখন অন্য কোন নাম বলতে যাচ্ছিল গিলটি মিঞা, হাত তুলে থামতে বলল ওকে রানা।

‘একটা কাজ করতে পারবে, গিলটি মিঞা?’

‘একশো বার পারব। আমার অসাদা কিছুই নেই, স্যার। পরীক্ষা করে দেখুন।’ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সে।

জুতোর গোড়ালি থেকে চাবির ছাপ তোলা কাগজ বের করে দিল রানা ওর হাতে। উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে দেখল সেটা গিলটি মিঞা।

‘কি জিনিস এটা বলো তো?’

‘একটা চাবির ছাপ তুলেছেন, স্যার। ভাল কায়দা হয়েছে। যন্তোর পেলে দু’মিলিট লাগবে আমার চাবিটা তোয়ের করতে।’

‘কাল সকালে চাবিটা বানিয়ে নিয়ে আসতে পারবে?’

‘পারব।’

‘আচ্ছা, আরেকটা কাজ আছে। তুমি তো খলিফা লোক, ভাল কোনও এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের হেড মেকানিকের সাথে আলাপ আছে?’

‘আছে। না থাকলেই বা কি? আলাপ করে নিতে কতক্ষণ?’

‘গিলটি মিঞার চুরি করা পাটটা দিল রানা এবার ওর হাতে।

‘জেনে আসবে কোন মেশিনের পাট এটা, কি কাজে লাগে।’

‘ঠিক আছে, স্যার; এ তো সামান্য কাজ। সব খবর পাবেন আপনি কাল।’

‘আর গোপনে ঢুকবার চেষ্টা কোরো না দিনের বেলা। আমি বলে রাখব গার্ডদের। আটকাবে না তোমাকে। বুঝলে?’

মাথা ঝাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গিলটি মিঞা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

আধ ঘণ্টা পর রানাও বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

চার

ঠিক সাড়ে দশটায় ঢুকল রানা সেইলার্স ক্লাবে। চোখ তুলে চাইল শুধু গোলাম হায়দার, যেন চিনতেই পারেনি এমনি ভাবে স্কোয়াশ মন দিল।

লাল ওপেল ব্রেকডটা নিয়ে এসেছে রানা। ঠিকই বলেছিল গিলটি মিঞা। চারজন ওটা কিসিমের লোক দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার মোড়ে একটা সাদা করোনার গায়ে হেলান দিয়ে; রানা বিশ গজ যেতে না যেতেই টপাটপ উঠে পড়েছে ওরা গাড়িতে। পিছন পিছন ওরাও এসেছে এখানে। সারি সারি গাড়ি আর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাবের সামনে। এইটাস থেকে বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করতে হয়েছে রানার গাড়ি।

কয়েক দান ঝলতে খেলে হারল রানা। আজ কপালটা প্রসন্ন নেই। একটা টেবিলে বসে কক্ষির অর্ডার দিল সে। বাকারাত খেলছে গোলাম হায়দার। বেটে দেয়া তাসগুলো তুলল গোলাম হায়দার—দেখল এক নজর,

কার্ড চাইল। তাঁবুর তলায় চলে এসেছে চারজন অনুসরণকারী। গোলাম হায়দারের আশপাশে ভিড় করে খেলা দেখছে ওরা। রানার দিকে চেয়ে অদ্ভুত বাঁকা রহস্যময় হাসি হাসল গোলাম হায়দার। জুতো মেরে ওর দাঁত ক'টা খসিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল রানার—কিন্তু উপায় নেই।

এতক্ষণে ইভিয়ান নেভির লোকগুলো নিশ্চয়ই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আন্দরকিনার ঢাকা ভর্তি ঘর নিশ্চয়ই খালি হয়ে গেছে। কোনও দিক দিয়ে আটকানো যাবে না গোলাম হায়দারকে। কাজেই আক্রমণের সুযোগ দিতে হবে ওকে। এই আক্রমণের সময়েই হয়তো কোনও দুর্বলতা আবিষ্কার করে ফেলবে সে। এ হাড়া আর উপায় কি? হেড অফিসও সেই নির্দেশ দিয়েছে—প্রোটেকশন নিয়ে আক্রমণের সুযোগ দাও। মূল উদ্দেশ্য বের করে ফেলো কোনও দুর্বলতার সুযোগে।

গোলাম হায়দারের কাছ থেকে সরে গেল চারজন লোক। চারজন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। একেক টেবিলে দর্শক সেজে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। কিন্তু প্রত্যেকের সদা সতর্ক দৃষ্টি রইল রানার ওপর। ঘরের চারদিকে চাইল রানা। আরেকটা পরিচিত মুখ দেখতে পেল সে। হ্যাংলা মত লম্বা লোক। ছোট ছোট দুই চোখের কোলে কালি পড়েছে। কিংবা হয়তো মোটা কাঁচের চশমা পরেছে বলে ওরকম দেখাচ্ছে। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নখ থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ময়লা বের করছে লোকটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে। গোলাম হায়দারের ইয়টে দেখেছে রানা ওকে।

অনেক লোক। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই কপাল ফেরাবার জন্যে। গোলাম হায়দারের আর কয়জন লোক আছে এখন? ঠিক বুঝতে পারল না রানা। হঠাৎ মনে পড়ল ওর আইভরির কথা। ওর কাছ থেকে তো কিছু সংবাদ জানা যেতে পারে! উঠে দাঁড়াল সে। সঙ্গে সঙ্গেই হেলান দেয়া লোকটা সোজা হয়ে গেল।

পাকা দালানটার দিকে কয়েক পা এগিয়েই টের পেল রানা, পিছন পিছন আসছে চশমা পরা লোকটা। শেমিন দে ফার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। খেলোয়াড়দের পিছনে চলে গেল সে। সেই লোকটাও আসছে পিছন পিছন। চলতে গিয়ে মড়মড় করে মাজার হাড় ফুটেছে লোকটার। ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই পা এগিয়ে গেল রানা লোকটার দিকে। নিচু গলায় বলল, 'আর এক পা এগোলে এক ঘুসিতে নাক ফাটিয়ে দেব।'

কোন কথা না বলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল লোকটা রানাকে। তারপর পাশ ফিরে খেলা দেখতে লাগল। রুলেট টেবিলের কাছে অনেক ভিড়। কাছাকাছি পৌছতেই দু'দিক থেকে দু'জন দু'জন করে চারজন ঘিরে ধরল ওকে। সামনে এসে দাঁড়াল সেই চশমা পরা হ্যাংলা মত লম্বা লোকটা।

পিছন দিক ছাড়া আর কোন দিকে যাবার রাস্তা রইল না। কিন্তু এক পিছনে সরতেই মোটা মত একজন ঠোট-কাটা লোক পা মাড়িয়ে ধরল রানার। সামনের লোকটা কি যেন বের করছে কোটের পকেট থেকে। হাতট

বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠল রানা। চক্চকে সূচ দেখা যাচ্ছে একটা কাঁচের সিরিজের মুখে। দ্রুত চিন্তা চলল রানার মাথার মধ্যে। এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেনি সে। ভিড়ের মধ্যে এর চাইতে ভাল অস্ত্র আর কিছুই হতে পারে না। এই তো ক'দিন আগেও করাচিতে এক সিনেমা হল থেকে বেরোবার সময় শো-ভাড়া ভিড়ে এই একই উপায়ে খুন করা হলো একজন লোককে। পোস্ট মর্টেমের আগে কেউ টেরই পায়নি ব্যাপারটা।

এরা বেমানুম মিশে যাবে ভিড়ের মধ্যে। রানা মেঝেতে পড়ে যেতেই কয়েকজন ছুটে আসবে, টেনে তুলবে, কেউ পানি আনবে, কেউ চেয়ার এগিয়ে দেবে। পাঁচ মিনিটের আগে কেউ টেরই পাবে না যে মারা গেছে সে। সবাই ভাববে সব টাকা হেরে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে। আহা-উহ করবে। যখন বুঝতে পারবে যে মারা গেছে লোকটা, তখন আরও উত্থলে উঠবে ওদের সহানুভূতি। হার্টফেল সম্পর্কে সন্দেহ থাকবে না কারও। ভাববে একদিন ওদেরও এই অবস্থা হতে পারে। কেউ সন্দেহ করবে না যে খুন করা হয়েছে ওকে এত লোকের মধ্যেখানে। রানার হাত চেপে ধরল সামনের লোকটা।

কলতে টেবিলে রুপিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'সেভেনটিন। রেড। লো অ্যান্ড অড।'

একটানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরল রানা। চেপে ধরবার চেষ্টা করল ওকে একজন পাশ থেকে। এগিয়ে আসছে সিরিজটা। গা ঝাড়া দিয়ে লাফ দিল সে পিছন দিকে। চিৎকার করে উঠল, 'জিতছি! সব আমার!'

দশ জোড়া চোখ এসে পড়ল রানার ওপর। একটু থমকে গেল গোলাম হায়দারের লোকগুলো। সিরিজটা চলে গেল লগ্না লোকটার পকেটে। ছুটে টেবিলের কাছে গিয়ে প্লেকগুলো ওছাতে আরম্ভ করল রানা। আপত্তির ঝড় উঠল টেবিলের চারপাশ থেকে।

'কিন্তু জানাব...'

ভদ্রভাবে শুরু করতে যাচ্ছিল একজন। কর্কশ কণ্ঠে রানা বলল, 'এই দান আমার।'

'কি যা-তা বলছেন? ছেড়ে দিন ওগুলো। দান আমার!'

'রুপিয়েই! এই অন্যায়...' নালিশ জানাতে চাইল রানা।

'মিথ্যুক কোথাকার! আমি প্লেক রেখেছি এই ঘরে।'

কয়েক সেকেন্ডেই গোলমাল বেধে ডগল হয়ে গেল খেলা। সবাই মিলে বোঝাবার চেষ্টা করছে রানাকে যে ভুল হয়েছে ওর, কিন্তু উত্তরোত্তর খেপে উঠতে থাকল রানা। কিছুতেই বুঝবে না সে।

'সব চোর। আমি জানি। সবাই মিলে সাট করে আমার টাকাগুলো মেরে দেবার চেষ্টা করছে। আমি সেক্রেটারির সাথে দেখা করব।' জেদ ধরল রানা।

ক্লাবের মধ্যে এই ধরনের চলছিল কাণ্ড হলে ক্লাবের বদনাম হয়।

গোকটাই না অনুসরণ করেছিল ওকে? হ্যাঁ, এইবার পরিষ্কার চিনতে পারছে রানা ওকে। সে-ই।

মৃত স্পীড বেড়ে যাচ্ছে গাড়িটার। সামনের এবং পিছনের সীট আলাদা হয়ে গেছে কোথা থেকে এক কাঁচের পার্টিশন এসে। কাঁচটা সরাবার চেষ্টা করল রানা। একচুলও নড়ল না সেটা। দরজার হাতলে চাপ দিল সে উপর-নিচে; ফল হলো না কোনও। লক করা। ড্যাশবোর্ডের একটা রেডিও সেট নাড়াচাড়া আরম্ভ করেছে ড্রাইভার। বাম হাতে ধরা একটা মাউথ পিসে কিছু বলল সে। কি বলল বুঝতে পারল না রানা। এক মিনিট পর সুইচ অফ করে দিয়ে ড্রাইভিং-এ মন দিল সে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর মৃদু ঝড়ঝড় শব্দ শুনতে পেল রানা স্পীকারের। 'পরমুহূর্তে ভেসে এল গোলাম হায়দারের কণ্ঠস্বর।

'কেমন বোধ করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা? নিশ্চিন্তে বসে দু'পাশের দৃশ্য দেখুন। গাড়ি থেকে বেরোবার কোন উপায় নেই—চেষ্টা করলে ওধু ওধুই জখম হবেন। আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভয় পাবেন না। আজই রাতে দেখা হবে আপনার সঙ্গে। তারপর লম্বা এক টুরে যাব আমরা। ভাল কথা, ট্যাক্সির ভাড়াটা আমিই দিয়ে দেব, আপনার দিতে হবে না। আর একটা দুঃসংবাদ আছে। সিরিজ হাতে যে ডাক্তারটা ঘুরছিল আপনার পিছন পিছন, খুব সম্ভব এতক্ষণে মারা গেছে সে। ওর কিছু বন্ধু-বান্ধব যদি আপনার সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রাখতে না পারে তাহলে দয়া করে নিজওগে ক্ষমা করে দেবেন।'

খট করে শব্দ তুলে নীরব হয়ে গেল লাউডস্পীকার। চারদিক নিস্তব্ধ। চাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কেবল মৃদু।

প্রচণ্ড এক লাথি মারল রানা আন্ড্রেকবেল্ গ্রাসের পার্টিশনের ওপর। সীটের পিঠে হেলান দিয়ে আবার দুইপায়ে একসাথে লাথি মারল সে প্রাণপণ শক্তিতে। কঁপে উঠল পার্টিশনটা, ওপর থেকে খসে পড়ল একটা কজা। আবার জোড়া পায়েল লাথি চালান রানা।

এবার ভয় পেল ড্রাইভার। বারবার পিছন ফিরে চাইছে সে। চতুর্থ লাথিতেই চড়াং করে ফেটে গেল কাঁচ। সীলের পাত কসানো সোলের লাথি সহ্য করতে পারল না সেটা। ভেঙে পড়ল খানিকটা জায়গা। যতটা সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে রইল ড্রাইভার আত্মরক্ষার তাগিদে, কিন্তু স্পীড কমাল না। আরেক লাথিতেই বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল ভাঙা জায়গাটায়। এবার ড্রাইভিং সীটের পিছনে পড়ল একটা লাথি। দুলে উঠল গাড়িটা। কাঁচের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরে ঘুরাবার চেষ্টা করল রানা। দুইহাতে টেনে সোজা করে ফেঙ্গল ড্রাইভার গাড়িটা আবার। জনশূন্য রাস্তার ওপর মাতলামি শুরু করল গাড়ি। একবার রাস্তার বামে যায়, একবার ডাইনে। রানার কাঁধের ধাক্কা আরও খানিকটা কাঁচ ভেঙে পড়ল। একটা মোড়ের কাছে এসে পড়েছে ওরা এখন। ধাঁই করে লোকটার নাকের ওপর

একটা খাবড়া লাগিয়ে দিয়ে জোরে চেপে ধরল রানা স্টিয়ারিং। প্রাণপণে দুইহাতে টেনে বাঁকাবার চেষ্টা করল ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইল, শেষে বিপদ বুঝতে পেরে ব্রেক করল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। ফুটপাথের ওপর উঠে গেল গাড়িটা। তারপর নেমে গেল ডিচের মধ্যে। চাকাগুলো আকাশের দিকে তুলে পিঠের ওপর ভর করে চিং হয়ে গেল গাড়ি নর্দমার মধ্যে উল্টানো অবরে পোকায় মত।

গাড়িটা নর্দমায় নামার ঠিক আগের মুহূর্তে পিছনের সীটের গদির ওপর শুয়ে পড়েছে রানা। প্রবল ঝাঁকুনির চোটে একবার দরজায় একবার ছাতে ধাক্কা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল সে। কয়েকটা জায়গায় কেটেছে—কিন্তু ভাঙেনি কোথাও। কোটের ডান হাতটা নিচ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত ছিড়ে গেছে। আশ্চর্য! গাড়ির এঞ্জিন চালু আছে এখনও। চিং হয়ে শুয়ে ফুল স্পীডে চলছে চাকাগুলো। একটা হেড লাইট জ্বলছে। সেই আলোর সামনে দিয়ে একজন লোককে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে দেখে সংবিং ফিরে পেল রানা। ড্রাইভারটা। দরজা খুলে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল সে বাইরে। খুব সম্ভব ওর ওপর দিয়েই এক গড়ান দিয়ে চিং হয়েছে গাড়ি। সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত, মুখটা ব্যথায় বিকৃত, কপাল কাটা।

মোড়ের ওপর একটা প্রকাণ্ড শিরীষ গাছ আলোকিত হয়ে উঠেছে। তারমানে একটা গাড়ি আসছে সেইলরস্ ক্লাবের দিক থেকে। সেই চারজন লোক আসছে না তো?

দু'পাশের দরজা খুলবার চেষ্টা করল রানা। বন্ধ। কাঁচের ডাঙা জন্মগাটা দিয়ে গলে ড্রাইভারের পাশের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। প্যাচপ্যাচে কাদা। জুতো বসে যেতে চাইছে। মোড় নিয়েছে সেই গাড়িটা। এই গাড়ির হেড লাইট কি দেখে ফলেছে ওরা? লাথি দিয়ে হেড লাইট নিভিয়ে দিল রানা। দ্রুত পালাতে হবে এখন। যদি ওরা এই আলো দেখে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই খোঁজ করবে। ধরা পড়লে চারজনের সাথে পারবে না সে একা।

নর্দমার উঁচু পাড়ের কাছাকাছি এসেই চট করে মাথা নিচু করল রানা। ঝটক করে গাড়ির দরজা বন্ধ করবার শব্দ পাওয়া গেল। গাড়ি থেকে যে তিনজন লোক নেমে আসছে তাদের প্রত্যেকের হাতেই পিস্তল।

আর দেরি করল না রানা। মাথা নিচু রেখে ছুটল কাদার মধ্যে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব। বিশ গজ দৌড়ে এসে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল রানা। টর্চের আলোয় ড্রাইভারের রক্তাক্ত মুখটা দেখতে পেল সে। দুটো ছায়ামূর্তি এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে সতর্ক পদক্ষেপে। রানার পায়ের ছাপের ওপর টর্চের আলো ফেলল ওরা গাড়ি খালি দেখে। নর্দমার ভিতর লম্বালম্বিভাবে আলো ফেলল এবার। ঝোপের ওপর এসে স্থির হলো আলোটা। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ওরা এই ঝোপটার আড়ালেই রয়েছে রানা।

আবার দৌড় দিল রানা। পিছনে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ-বাড়ি ও-

বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে এগোতে থাকল রানা। সামনে বেশ খানিকটা কাঁকা জায়গা। দেখতে পেলেনই ওলি করবে ওরা। দ্রুত এগিয়ে আসছে পিছনের দু'জন। আর দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। একটা ডাস্টবিনের মধ্যে ঢুকে বসে পড়ল রানা। দুর্গন্ধ। বমি ঠেলে আসতে চাইছে। দম বন্ধ করে বসে রইল সে। পাশ দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল দু'জন লোক। আরও পনেরো সেকেন্ড শ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারল সে, তারপরই হুস্ করে বেরিয়ে গেল চেপে রাখা নিঃশ্বাস। ওয়াক্ করে বমি হয়ে যাচ্ছিল, কোনও মতে সামলে নিল সে। মাথা উচু করে দেখল বাম ধারের একটা বাড়ির ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তি দুটো। একনায়ে বেরিয়ে এল রানা ডাস্টবিনের মধ্যে থেকে। হঠাৎ চিনতে পারল সামনের প্রকাণ্ড বাড়িটা। গোলাম চেয়ার।

সুইপারস্ প্যাসেজ দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। পিছনের দরজাটা খোলা। ঢুকেই ডান-পাশে সারি সারি ল্যাট্রিন। লিফটের কাছে এসেই দারোয়ানের কথা মনে পড়ল রানার। গেটে বসে আছে দারোয়ান; ওদিক দিয়ে সুবিধে হবে না। অন্ধকার মত একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইল সে। সুইপারস্ প্যাসেজের কাছে পায়ের শব্দ শুনে পাওয়া গেল। আর চিন্তা করবার সময় নেই—লিফটে উঠেই বোতাম টিপল সে টপ ফ্লোরের।

ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে বসে আছে আইভরি গিলবার্ট। চমকে উঠল সে রানাকে দেখে। মুখে মেকাপ নেই, তবু চিনে ফেলল। সোজা হয়ে গেল শিরদাঁড়া। কোন কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

‘খুবই দুঃখিত, আইভরি, আমি—’

‘চলো, ঘরে চলো।’ রানার একটা হাত চেপে ধরল আইভরি। টেনে নিয়ে চলল একটা সুইং-ডোর দিয়ে ঢুকে। দুটো অ্যাপার্টমেন্টের বন্ধ দরজা পেরিয়ে ডাইনে গেলেনই শেষ ঘরটা আইভরির। ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল সে দরজায়, তারপর ফিরল রানার দিকে।

‘আমাদের জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে তিনদিনের মধ্যেই—’ বলতে যাচ্ছিল রানা, বাধা দিয়ে কুঁচকাল আইভরি।

‘ধাক্। আর ওল মারতে হবে না। সেদিন সব দেখেছি আমি।’ জানালা দিয়ে নিচের রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল আইভরি। ‘এবং পরে সব শুনেছি। কিন্তু একি হাল তোমার বলো তো! সারা গায়ে কাটা দাগ, জামা-কাপড় কাদা মাখা, হেঁড়া! কি হয়েছে?’

জানালা দিয়ে নিচে চেয়ে দেখল রানা গোলাম চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই সাদা গাড়িটা। ঠোট-কাটা লোকটা নেমে দাঁড়িয়েছে আগেই, এবার পিছনের দরজা খুলে বেরোল লোবাক। সেই সঙ্গে আরও একজন। টর্চ হাতে চতুর্থ একজন লোকও এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। দারোয়ানটাও এগিয়ে এসেছে। কি যেন কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে।

রানা বুকল সামনে গিয়ে রানাকে দেখতে না পেয়ে ওরা ধরে নিয়েছে যে রানা এই বাড়িতেই ঢুকেছে। একুশি তন্ন তন্ন করে এ-বাড়ির প্রত্যেকটা ঘর

খোঁজা শুরু হবে। দ্রুত কোনও উপায় বের করতে না পারলে আবার ধরা পড়বে সে ওদের হাতে। তার মানে অবধারিত মৃত্যু।

বুঝলাম। লোকগুলো তাড়া করেছিল তোমাকে, এবং অল্পক্ষণেই উঠে আসবে এখানেই খোঁজ করতে। কি বুদ্ধি বের করলে উদ্ধার পাওয়ার?’ জিজ্ঞেস করল আইভরি।

‘আমার উদ্ধারের কথা পরে ভাবব। আগে তোমার নিরাপত্তা দরকার। তোমার বোনকে পাঠিয়ে দাও রিসেপশনে। ওখানে কাউকে দেখতে না পেনেই ওরা নিঃসন্দেহে ধরে নেবে আমার সঙ্গে তোমার কোনও সাট আছে। সেটা তোমার জন্যে মঙ্গলজনক হবে না।’

মুদু হাসল আইভরি। বলল, ‘আমার বোনকে কক্সবাজার পাঠানো হয়েছে একটা মোটেল ক্লোজ করবার জন্যে। ওকে পাচ্ছি কোথায় যে রিসেপশনে পাঠাব? আমাকেই যেতে হবে। কিন্তু তোমাকে বিদায় না দিয়ে যাব না কিছুতেই। আমার যা হয় হোক। এসো আমার সঙ্গে।’

‘কোথায়?’

‘এসোই না। একটা ইমার্জেন্সী এক্সিট আছে। পাঁচ সেকেন্ডে রাস্তার পাশে নেমে যেতে পারবে। ওই দেখো, গাড়িটার চাবি ঝুলছে ইগনিশন সুইচ থেকে। কোনও অসুবিধে হবে না।’

অবাক হয়ে চাইল রানা মেয়েটির মুখের দিকে। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক লাগল ওর এই অযাচিত সাহায্য। অশ্রুতিও বোধ করল একটু। কিন্তু এগোল সে ওর পিছু পিছু।

একটা বোতাম টিপতেই লম্বা চারকোনা একটা গর্ত সৃষ্টি হলো দেয়ালের গায়ে। একজনের ব্যবহারোপযোগী সরু একটা লিফটের দরজা খুলে গেছে। তেমন কোন বিপদ ঘটলে যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা করে রেখেছে গোলাম হায়দার। লোকটা গোড়া থেকেই ক্রিমিনাল মাইন্ডেড।

রানা লিফটের দিকে এক পা বাড়াতেই কোটের ছেঁড়া আস্তিন ধরে টান দিল আইভরি।

‘বাহ! কাজ হাসিল হয়ে গেছে, আর অমনি পালানো! একটা ধন্যবাদও দেবে না?’

অদ্ভুত এক টুকরো হাসি আইভরির মুখে। হাসিটা চেনা চেনা লাগল রানার, কিন্তু মনে পড়ল না ঠিক কায় হাসির মত। রানার অগোছাল একগুচ্ছ চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিল আইভরি।

ওকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল রানা।

আধ মিনিটের মধ্যেই সাঁ করে বেরিয়ে গেল সাদা গাড়িটা হতভম্ব দারোয়ানের চোখের সামনে দিয়ে। ড্রাইভিং সীটে বসে হাসছে কর্দমচর্চিত মাসুদ রানা।

ছয়

গাড়িটা রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে হেঁটে চলে ফ্রান্সা বাংলায় গার্ডদের অবাক করে দিয়ে। শাঁওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে আত্মা করে ঘষে ঘষে গায়ের ময়লা তুলে ফেলল সে। লাক্সের বদৌলতে দুর্গন্ধ দূর হলো। চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য-সাবান যে কাজের জিনিস সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলো স্পাই-তারকা।

আজকের এত ঘটনার পর মাত্র দুটো তথ্য জানতে পেরেছে রানা। কল্লবাজারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আইভরির বোনকে। এবং দূরে কোথাও নিয়ে যেতে চেয়েছিল রানাকে গোলাম হায়দার। কোথায়? কল্লবাজার? নাকি কল্লবাজার আর টেকনাফের মাঝামাঝি জঙ্গলের মধ্যে ওর গোপন আস্তানায়? ওটাই কি ওর আসল ঘাঁটি? কি হয় সেখানে? রানা জানে, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের ধারে অনেক টাকা ব্যয় করে একটা প্রথম শ্রেণীর মোটেল তৈরি করিয়েছিল গোলাম হায়দার। সেটা হঠাৎ বন্ধ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন? এখিলের সামুদ্রিক জনোচ্ছ্বাসের ভয়ে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য পিয়াসীরা ভেগেছে নাকি সবাই?

দুত্তোর বলে মাথা ঝাড়া দিল রানা। বাথরুমে দাঁড়িয়ে আবোল-তাবোল চিন্তা করলে কোন প্রব্লেম মীমাংসা হবে না। চিটাগাং বসে থেকেও কোন লাভ হচ্ছে না। কল্লবাজার রওনা হবে সে কাল। যতদূর সম্ভব সমস্ত গোলমালের গোড়া রয়েছে ওখানেই। রানাকে ইয়টের মধ্যে নজরবন্দী রেখে গোলাম হায়দার গিয়েছিল কোথায়? এই কল্লবাজারে। কালই রওনা হবে রানা।

গা-হাত-পা মুছে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। বিছানায় শুয়ে রিডিং লাইটটা জ্বলে দিয়ে আবদুল হাইয়ের অসমাপ্ত রিপোর্টের শেষ কয়েকটা পৃষ্ঠার ওপর আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। তারপর বাতি নিভিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত মনে। ঘুমের মধ্যেও যে মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করে, এবং অদ্ভুত সব জটিল সমস্যার সহজ সমাধান বের করতে পারে একথা বিশ্বাস করে রানা। বহুবার ফল পেয়েছে সে। তাই কঠিন কোন সমস্যা উপস্থিত হলেই অবচেতন মনের হাতে সমস্ত তথ্য তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

একটু দেরি করে ঘুম ভাঙল রানার পরদিন সকালে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। চোখ খুলতেই দেখতে পেল আবদুল হাইয়ের হাসি-হাসি মুখটা। দেয়ালে ঝুলছে ওর ছবি। আর কোনদিন এমনি করে হাসবে না আবদুল হাই। হৈ-হৈ করে হাসি গড়ে মুখর করে তুলবে না আর জমজমাট আসর। বুকের ভেতর তীক্ষ্ণ একটা শোঁচা খেলো রানা। মৃত্যু সে অনেক দেখেছে। এত প্রাণবন্ত সজীব ছিল বলেই বোধহয় ওর মৃত্যুটা এত বেশি করে

বাজছে রানার বুকে। প্রতিশোধ নিতেই হবে। ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হয়েছে এখন ব্যাপারটা। উঠে পড়ল রানা বিছানা ছেড়ে।

নাস্তা শেষ করে গরম চায়ের কাপে এক চুমুক দিতেই ঘরে ঢুকল গিলটি মিঞা। পিছনে মিলিটারি সার্জেন্ট। মাথা নাড়তেই অ্যাবাউট টার্ন হয়ে চল গেল সার্জেন্ট।

‘খাকি ডেরেস্ দেকলেই প্রাণটা কেমন আইটাই আরাশ্ত করে দেয়, স্যার। ঝাড়া দুটো ফটা এটকে রেকে দিলে—বলে সাহেব ওটেননি একনও। তা বাবা, এটকেচিস ভাল করেচিস, একটা-দুটো কতা বল। না। বোবা বনে গেল সব। এসব লোক আমি পচোন্দ করি না, স্যার।’

‘তোমাকে যে কাজ দিয়েছিলাম হয়েছে?’

‘হবেনি কেন, স্যার? আজ পোয়াস্ত যে-কাজ হাতে নিয়েচি, কোন কাজটা হোইনি বলুন? এস. পি. সাহেবের ফ্যান্ডেশের চমশাটা পচোন্দ হয়েছিল—লিয়ে আসিনি সেটা তেতালার ওপর থেকে? কিছু পরোয়া করি নে, স্যার, আমি—খালি এই শালারাই একটু ঘোল খাইয়ে দিলে। সেদিনকে...’

‘তোমার গল্প কে শুনতে চেয়েছে, গিলটি মিঞা? কাজের কথা বলো।’

আহত হলো গিলটি মিঞা। ভেবেছিল ঝাড়া দু’ফটা চুপচাপ বসে থাকার শোধটা তুলে নেবে রানার ওপর দিয়ে—এ-ও দেখা যাচ্ছে ওদেরই মত। এদের কাছে একটু মন খুলে গল্পো করবার উপায় নেই—কাজের কথা ছাড়া কিছুই বোঝে না।

‘অপসেট মেশিন, স্যার। জার্মানীর হাইডেলবার্গ কোম্পানির টাকা ছাপার মেশিনের যন্তোর। ফস্টার সায়েব তো ভাজ্জব বনে গেল ও মাল আমার হাতে দেকে। চার বচ্ছোর ওদেশে থেকে পাশ দিয়ে এসেচে কিনা—সব জানে শালা। বলল...’

‘আচ্চ! তুমি বলছ ঘর ভর্তি টাকা দেখেছ, এই জিনিসটাও দেখা যাচ্ছে টাকা ছাপার মেশিনের পার্ট। তাহলে....’

‘ঠিক ধরেচেন, স্যার। কতায় বলে না—বুদ্ধিমান লোকেদের চিন্তেধারা একই রকম। আমার মনেও ঠিক এই কতাই সন্দো হয়েছে। আপনারই মতন...’ রানার জ সামান্য কৌচকাতেই হঠাৎ ব্রেক করল গিলটি মিঞা। পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ধরল রানার চোখের সামনে। ‘দেকুন দিকি। আমার সেই স্যাঙাতের কাচ থেকে এই পঞ্চাশটা টাকা চেয়ে লিয়ে এলাম। জাল টাকা।’

থাবা দিয়ে প্রায় ছিনিয়ে নিল রানা সেটা গিলটি মিঞার হাত থেকে। কিন্তু ভাল মত পরীক্ষা করেও কোন খুঁত ধরতে পারল না সে। পকেট থেকে একটা গোল ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে এগিয়ে ধরল গিলটি মিঞা। একগাল হেসে বলল, ‘খালি চোকে কিছুই বুঝবেন না, স্যার। এইটে দিয়ে দেকুন।’

টেবিলের ওপর নোটটা বিছিয়ে নিয়ে টেকল ল্যাম্প জ্বলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করেও কিছু বুঝতে পারল না রানা।

‘তবেই বুজুন, স্যার! এইতেই প্রমাণ হচ্ছে কত পাকা জালিয়াৎ! আপনার মানিব্যাগের তিন নম্বর পরতে যে পঞ্চাশ টাকার নোটটা আছে, সেটা বের করুন, স্যার—আমি বুজিয়ে দিচ্ছি...।’

এক মিনিট পর জাল নোট হাতে উদ্ভাস্ত ভঙ্গিতে পায়াচারি ভঙ্গিতে বেড়াতে থাকল রানা ঘরময়। এত টাকা দিয়ে কি করবে গোলাম হায়দার? টাকার অভাব নিশ্চয়ই নেই ওর। তাহলে? কোটি কোটি টাকা বানাচ্ছে কেন ও? রানার সাথে সাথে গিলটি মিঞার দৃষ্টিটা ঘরের এক ধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত ঘোরাফেরা করছিল, হঠাৎ রানা শ্রমকে দাঁড়াতেই চমকে উঠল সে।

‘আর চাবিটা?’

‘এই যে, স্যার।’ পকেট থেকে একটা চাবি বের করল গিলটি মিঞা। ‘চাবিটাও ইস্পিশাল। এই যে খাঁজটা দেকতে পাচ্ছেন, শুদু এইটের পিচনেই পাঁচটি মিলিট নষ্ট হয়েছে।’

হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল রানা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পকেটে ফেলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাকে ধরে প্রথমে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ওরা, গিলটি মিঞা?’

‘গোলাম চেয়ারে। ওখেন থেকে আন্দরকিল্লার সেই বাড়িটায়। তারপর মেরে ফেলবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল গোলাম ভিলায়।’

‘গোলাম হায়দারকে দেখেছ কখনও?’

‘ওই যে চোক লষ্ট হয়ে যাওয়া লোকটা তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘দেকেছি। শুদু পয়লা দিন দেকেছি। হঠাৎ দিনদুপুরে রাত্তার ওপর থেকে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পয়লা কয়েকজন মিলে খুব ধোলাই করলে। ও মার কত খেয়েচি, ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেললুম, স্যার। ধরে নিয়ে গেল সর্দারের কাছে। অনেক প্রশ্ন করলে সে। অনেক ভয় দেকালে। শেষে পিন দিয়ে নোকের ভেতর ফুটাতেই দু’লাকের কতা স্বীকার গেলুম। আমাকে খুব করে বানাবার হুকুম দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উটে যাচ্ছিল এক চোখে হারামীটা—হটাৎ ধাঁই করে ওর পোদে এক লাঠ মেরে দিলুম। তারপর, স্যার, কি বলব, তিনজনে মিলে এমন মার মারলে যে একেবারে মূতে দিলুম।’ করুণ মুখ করে চাইল গিলটি মিঞা রানার মুখের দিকে।

‘বিয়ে করেছ?’ হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘না, স্যার, মনের মতন ইত্তিরিলোকই পেলুম না’ আজ পোয়যন্ত। তেমন মেয়ে কই? এই ধরুন গিয়ে একটু ধম্মো-কম্মো করবে, রাজা-মামাজটা ঠিক রাখবে, গায়ের রং আর বয়েস যাই হোক, ভদ্রবংশের অল্পবয়স্ক শিক্তা মেয়ে হবে—কোতায়? যা-তা একটা মেয়ের সঙ্গে ঘর করা তো আমার কম্মো নয়। আরটিসের মতন মেজাজ আমার...’

রানা কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ কথার মাঝখানে

থেমে প্রশ্ন করল গিলটি মিঞা, 'কোতাউ চললেন নাকি, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকায়?'

'না।'

'তবে কোতায়?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা ওকে কল ঠিক হবে কিনা। তারপর বলল, 'কল্লবাজার।'

'একা?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে নেনবেন?'

আবার এক সেকেন্ড চিন্তা করে রানা বলল, 'না।'

আর কোন প্রশ্ন করল না গিলটি মিঞা। আনমনে কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর মুচকে হাসল একটু। বলল, 'আর কোন কাজ আছে, স্যার?'

'না। অনেক ধন্যবাদ, গিলটি মিঞা। অনেক উপকার করেছ তুমি।'

'ওসব বলে লজ্জা দেবেন না, স্যার। আমি তবে আসি একোন, স্যার?'

'এসো।'

কয়েকটা জরুরী টেলিফোন সেরে নিল রানা। গিলটি মিঞা বেরিয়ে যেতেই। তারপর বসল এই ক'দিনের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখতে। সেইলারস ক্লাবের সামনে থেকে গিয়ে আসা হয়েছে ওপেলটা। পাঁচটায় বেরিয়ে গেল লাল ওপেল রেকর্ড আবদুল হাইয়ের বাংলো থেকে। ছটায় পার হয়ে গেল দোহাজারী। উড়ে চলেছে সেটা কল্লবাজারের দিকে।

সাত

'...নয় নম্বর মহাবিপদ সংকেত উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আবার বলছি। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এখন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আকারে কল্লবাজারের পাঁচাত্তর মাইল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ রাত সাড়ে আটটার সময় এই ঝড় চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ভোলার উপকূলে প্রবলভাবে আঘাত হানতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসেরও আশঙ্কা আছে। উপকূল এলাকার জনসাধারণকে অতি সত্বর নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ভোলার উপকূলে নয় নম্বর মহাবিপদ সংকেত উত্তোলনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ঘোষণাটি এখানেই শেষ হলো।'

শিরদাঁড়া সোজা করে বসল অনীতা গিলবার্ট। ভয়ে অস্ত্রাঙ্গা শুকিয়ে

গেল ওর। আটটা বাজে। কোন কাজ ছিল না দুপুর থেকে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল দরজা লাগিয়ে দিয়ে। ঘুম ভেঙেছে সাতটায়। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে সেই দুপুর থেকেই—আরও যেন একটু বেশি মনে হলো। ঘুমের রেশ লেগেই ছিল চোখে। আবার পাশ ফিরে ঘুমতে গিয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে ঘড়ির দিকে চাইল। বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে ঢুকল সে। হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে অফিস কামরায় বসে মাত্র রেডিওটা খুলেছে—অমনি এই সংবাদ।

কে না ভয় পাবে? আধঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছুচ্ছে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আর সেই সঙ্গে তার চেয়েও মারাত্মক সামুদ্রিক জলোচ্ছাস। নিশ্চয়ই দুপুর থেকে এই খবর খারবার করে প্রচার করা হচ্ছে। সবাই সরে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ে। ঘুমিয়ে ছিল সে। শহর থেকে এক মাইল দূরে গোলাম হায়দারের বিরাট মোটেলে পড়ে রয়েছে সে একা। মাইল খানেকের মধ্যে একটি জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। এখন যদি এখান থেকে বেরিয়ে দৌড়ও দেয়—আধঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না কোন নিরাপদ জায়গায়। অসহায় একা সে—কয়েকদিনের মধ্যে কেউ জানতে পারবে না যে এই নির্জন মোটেলের মধ্যে মারা গেছে সে। যখন পাওয়া যাবে ওর লাশটা তখন পচে ফুলে দুর্গন্ধ ছুটছে ওর মৃতদেহ থেকে!

হ-হ করে দমকা হাওয়া এসে বন্ধ দরজা-জানালাগুলো একবার ঝাঁকি দিয়ে দেখে গেল কতখানি শূন্য। চোখ কেটে জল গড়িয়ে পড়ল অনীতা গিলবার্টের।

সমুদ্রের ধারের একটা ঘন শাল মহুয়ার জঙ্গলের মাঝখানে তিন একর জমি পরিষ্কার করে তৈরি করেছিল গোলাম হায়দার এই মোটেল ড্রীম বহর দু'য়েক হলো। কিন্তু জমাতে পারেনি। যে পরিমাণ ব্যয় সেই পরিমাণ আয় হয়নি এতে। সবাই স্বীকার করেছে ওর শিল্পী-সুলভ সৌন্দর্যবোধকে। অর্ধচন্দ্রাকার মোটেলে চল্লিশটা কামরার প্রত্যেকটি কামরা থেকে শাল গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। এক ফার্নিং ছায়ায় ছায়ায় হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় সমুদ্রের ধারে। ইচ্ছে হয় বসে থাকো, কাব্য করো—ইচ্ছে হয় সাতার কাটো, স্কিন ডাইভিং করো। সী-বীচের সৌন্দর্য পিপাসু জনসমুদ্র নেই। চমৎকার নিরিবিলা, শান্ত, গম্ভীর পরিবেশ। কিন্তু তবু জমেনি এই মোটেল। প্রাপের ভয় বড়। এপ্রিল আর সেপ্টেম্বর এলেই সবাই পালায় এখান থেকে। বছরের মধ্যে চার-পাঁচ মাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায় মোটেল।

এবারও মার্চের শেষাংশে ভেঙেছে সবাই। দেড় মাসের জন্যে বন্ধ করে দেবার চার্ট নিয়ে এসেছে এখানে অনীতা গিলবার্ট, সাত দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে যাবে চিটাগাং। কাজও শেষ হয়ে গেছে প্রায়। সবাইকে টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে সে, জিনিসপত্র সব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়েছে। পাঁচটা তিন টনের ট্রাক তিন-চার ট্রিপ দিচ্ছে গত তিনদিন ধরে, সব জিনিসপত্র সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এখান থেকে। বেশির ভাগ মাল চলে গেছে,

কিরাট মোটেলটা ফাঁকা হয়ে গেছে একেবারে। আজ দুপুরেই শেষ ট্রাকটা চলে গেছে, আগামীকাল সকালে আসবে। কাল পাচটা গাড়ির এক ট্রিপেই সব জিনিস খতম হয়ে যাবে। তানা মেরে দিয়ে চলে যাবে অনীতা মাইক্রোবাসে করে চিটাগাং।

হঠাৎ চমকে উঠল অনীতা। আজই তো এক ট্রিপ দিলে শেষ হয়ে যেত সব জিনিসপত্র—তবে তা করা হলো না কেন? তীছাড়া দুপুরে ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা অমন ঠোট বাকিয়ে হাসছিল কেন? ওরা কি রেডিওর ঘোষণা শুনেছিল আগেই? তাহলে ওকে এখানে একা ফেলে চলে যাওয়ার মানে কি?

কড়াং করে ডাল ভেঙে পড়ল কোন গাছের। কেঁপে উঠল অনীতা। সাইক্লোনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে পরিষ্কার। বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল সে। আর রক্ষে নেই। এতদিন করাচিতে বসে খবরের কাগজে দেখেছে সে এই ঘূর্ণিঝড়ের খবর। হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি হয় পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। এবার স্বচক্ষে দেখবে সেটা। কিন্তু এ গল্প কাউকে বলবার আর সুযোগ হবে না কোনদিন।

কেঁপে উঠল সমস্ত বাড়িটা—টিনের ছাত, কার্ড বোর্ডের সিলিং। বাতাসের এক হ্যাঁচকা টানে মড় মড় করে উঠল ছাতটা। মট মট করে শাল গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে পাটখড়ির মত। ত্রুদ গর্জন শোনা যাচ্ছে সাইক্লোনের। দ্বিতীয় ধাক্কাতেই অফিস ঘরের টিনের ছাত উড়ে চলে গেল। রইল শুধু কার্ড বোর্ডের সিলিংটা।

হঠাৎ দিশেহারার মত ছুটে গিয়ে লাল নিয়নে বড় বড় করে লেখা 'রুম অ্যাভেইলেবল' আর নো 'রুম অ্যাভেইলেবল'-এর কন্ট্রোল সুইচটা নিচের দিকে টেনে দিল অনীতা। 'নো' কথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল বিরাট সাইন বোর্ডের উপর থেকে। অনীতা ডেবেছিল ঘর পাওয়া যাবে দেখলে কোন পথিক হয়তো এসে উঠতে পারে। পরমুহূর্তেই নিজের বোকামি বুঝতে পারল সে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে পথিক আসবে কোথেকে?

কাছেই বাজ পড়ল। ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল কয়েকটা জানালার কাঁচ। তারপর গুরু হলো মূলধারে বৃষ্টি। মূলধারে পানি নামতে আরম্ভ করল ঘরের মেঝেতে চারপাশের দেয়াল বেয়ে। একটা কাঠের চেয়ারে পা তুলে উঠে বসল অনীতা। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে সে দুই হাতে কান চেপে ধরে।

কতক্ষণ এইভাবে বসে ছিল খেয়াল নেই অনীতার। আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে—তবু আসেনি জলোচ্ছ্বাস। রেডিও বেজেই চলেছে। একটি কথাও ঢুকছে না ওর কানে। হঠাৎ একটা কথায় কান খাড়া হয়ে গেল ওর। এইমাত্র আবহাওয়া অফিস থেকে খবর পাওয়া গেছে, ঘূর্ণিঝড়টা আকস্মিক ভাবে দিক পরিবর্তন করে কক্সবাজারের কয়েক মাইল দূরে থাকতেই পূবে সরে গেছে।

তড়াক করে নামল অনীতা চেয়ার থেকে। এতক্ষণ বসে থাকতে থাকতে

বিনিমি ধরে গেছে পায়ে। কানে চিমটি কাটল সে, কিন্তু ফল হলো না কিছুই।
 তবল, এখানে বসে থেকে লাভ নেই, যে কোন মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হয়ে
 গেলে ঘরে ফেরাই মুশকিল হয়ে যাবে। তার চাইতে বিছানায় শুয়ে গায়ের
 ওপর একটা চাদর টেনে দিয়ে গল্পের বই পড়লে সময়টা কাটবে ভাল। গোটা
 কয়েক স্যাডউইচ নিয়ে গেলেনই হবে। ওই খেয়েই রাতটুকু কাটিয়ে দেয়া
 যাবে। কাফেটেরিয়ার দিকে এগোচ্ছে অনীতা, ঠিক এমনি সময় দরজায় কড়া
 নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

আতকে উঠল অনীতা। কে এল এই দুর্যোগের রাতে? ওহ-হো! রুম
 অ্যাডেইলেনবল তো জ্বালা আছে বাইরে। তাই দেখেই হয়তো কোন পথিক
 উপস্থিত হয়েছে এসে। হয়তো, রাস্তায় গাড়িতে ছিল বলে সাইক্লোনের খবর
 পায়নি, বাতাসের দুই-একটা ঝাপটা খেয়ে ভেবেছে বেশ চমৎকার হাওয়া
 ছেড়েছে আজ। যাই হোক, বিনয়ের সঙ্গে মাফটাফ চেয়ে নিতে হবে। দরজা
 খুলে একটু ফাঁক করল অনীতা। একজন নয়, দু'জন। রেইন কোট গায়ে।
 টুপিগুলো সামনের দিকে টেনে দেয়ায় অর্ধেক মুখ দেখা যাচ্ছে না। যথেষ্ট
 ভদ্রতার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটাকে বলল, 'মিস অনীতা গিলবার্ট?'

'জি।' একটু অবাক হলো অনীতা অপরিচিত আগন্তকের মুখে নিজের
 নাম শুনে। 'কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত, হোটেল ড্রীম এক হপ্তা আগেই বন্ধ
 করে দেয়া হয়েছে।'

'তা জানি। গোলাম হায়দার সাহেবের অনুমতি নিয়েই এসেছি আমরা।
 আমরা ইনশিওরেন্সের লোক। কাগজ-পত্র সব আছে আমাদের সাথে। কিন্তু
 এই বিষ্টির মধ্যে বের করলেই ভিজে যাবে। ভেতরে আসতে পারি। জিনিস-
 পত্র কি আছে না আছে টুকে নিতে এসেছি আমরা।'

একটু ভয় পেল অনীতা। লোক দুটোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কথায়
 তো মনে হচ্ছে রীতিমত অনুমতি পেয়েছে ওরা কর্তৃপক্ষের। আমতা আমতা
 করে বলল, 'এই দুর্যোগের রাতে আপনারা হঠাৎ কোথেকে এলেন? তার
 চেয়ে কাল সকালে আসুন না। তাছাড়া আপনারদের আসবার কথা তো
 আমার জানা নেই। কেউ বলেনি আমাকে যে আপনারা আসছেন।'

'কেউ বলেনি, না?' হো-হো করে হাসল লোকটা। 'এইবার ব্যাটাকে
 বাগে পেয়েছি। হাসান ড্রাইভারের কাছে রীতিমত চিঠি দিয়ে দিয়েছেন জনাব
 গোলাম হায়দার আমার সামনে। কালই রিপোর্ট করব আন্নি-চাকরি যাবে
 ওর। যাক, ভেতরে ঢুকেই আমাদের পরিচয়-পত্র দেখাচ্ছি। ওধু ওধুই বাইরে
 দাঁড় করিয়ে রেখে কষ্ট দিচ্ছেন। দরজাটা খুলুন।'

কিন্তু কাউকে ঢুকতে দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন মিস্টার গোলাম
 হায়দার। উনিই যখন পাঠিয়েছেন, তখন... শিকল নামিয়ে দরজা খুলে দিল
 অনীতা। দিয়েই বুঝল কতবড় ভুল করেছে সে।

ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে অনীতার গায়ের সঙ্গে গা ঘষে ঢুকে এল লোক
 দু'জন। খুলে ফেলল মাথার টুপি। নাক উঁচু করে বাতাসে দু'তিনবার শ্বাস নিল

লম্বা লোকটা। তারপর কঠিন দৃষ্টিতে চাইল অনীতার দিকে। সিগারেট খাও তুমি?’

‘হ্যাঁ, একটু-আধটু। কেন?’ ভয়ে ভয়ে বলল অনীতা।

‘ভাবছিলাম সঙ্গে লোক আছে বন্ধি।’ দড়াম করে দরজা লাগিয়ে শিকল তুলে দিল লোকটা। বক্টুও লাগিয়ে দিল। তারপর রেইন কোট খুলে রাখল দু’জনই একটা চেয়ারের ওপর।

এবার একনজর দু’জনকে দেখেই বিপদ টের পেল অনীতা। পরিষ্কার পেশাদারি গুণ্ডার চেহারা। অল্পদিন হলো বেরিয়েছে জেল থেকে। চেহারায় স্পষ্ট ছাপ পড়েছে কু-চরিত্রের। হেন হীন কর্ম নেই যা এদের দ্বারা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বেঁটে মোটা লোকটার চওড়া নাক, ছোট ছোট চোখ আর দেড় ইঞ্চি পুরু বিচ্ছিরি ঠোঁট দেখে প্রথম দর্শনেই ঘৃণা না জন্মে পারে না। অপেক্ষাকৃত লম্বা লোকটার মাথাটা ছোবড়া ছাড়ানো একটা নারকেলের সমান। তাও আবার ওপর দিকটা চোখা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা—ভাবলেশহীন। চিবুকটা বেচপ সাইজের—দুই তিন ভাঁজ হয়ে মাংস কুলছে চিবুক থেকে। দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

শিউরে উঠল অনীতা। বৃকের রক্ত পানি হয়ে গেছে ওর।

বত্রিশ পাঁচ দাঁত বের করে হাসল লম্বা লোকটা অনীতার দিকে চেয়ে। এগিয়ে এসে ওর চারপাশে এক পাক ঘুরে পরীক্ষা করল। হঠাৎ মুখের মধ্যে দুই আঙুল পুরে সিটি দিল সে। বেঁটে লোকটাকে চোখ টিপে বলল, ‘দেখেছিস, দাঙ। আহ-হা! যেমন সামনে তেমনি পেছনে। উহ্!’ মেরে ফেলেছে, দোস্ত! একদম মাঠার (মার্ভার) কেস্। আমি কিন্তু আগে...

‘আহা, থাম্ তো, পিচ্চি। ওসব পরে হবে। আগে যা, কেবিনগুলো সব চেক করে আয় চট করে।’

কিন্তু প্লকিত পিচ্চি আনন্দের আর্তিশয্যে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছে ততক্ষণে। বিচিত্র স্টেপ ফেলে কোমর বাঁকিয়ে টুইস্ট নাচল সে পাঁচ সেকেন্ড, তারপর হঠাৎ বক্সিং-এর স্টেপিং করে ‘হঁঃ হঁঃ’ শব্দ করে মক্ ফাইট আরম্ভ করল অনীতার সঙ্গে। দমাদম ঘুসি মারার অভিনয় করছে সে, আর পয়েন্ট গুণছে। যতখানি ভয় পেল তারচেয়ে অনেক বেশি ভয় পাওয়ার অভিনয় করল অনীতা। পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে সে। হঠাৎ চটাশ করে এক চড় লাগিয়ে দিল সে পিচ্চির গালে নাগালের মধ্যে আসতেই, তারপর ওদের বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠবার আগেই একটা হালকা চেয়ার মাথার ওপর তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল।

খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল বেঁটে মোটা দাঙ।

‘হয়েছে, পিগুন বের করতে হবে না, বুদ্ধ কাহিকে! বলেছিলাম না, আমোদ-ফুতি পরে হবে। সারা রাতই পড়ে রয়েছে সামনে। যা, তোকে যা কল্লেছি তাই করে আয় আগে।’

‘খাচ্ছি। কিন্তু তোরা আল্লার কসম লাগে, দাঙ, আগে আগেই গায়ে হাত

দিয়ে বসিস না, দোস্তু। আমার শোধ আমিই নেব। হাগিয়ে ছেড়ে দেবো আজ হায়মজাদিকে।'

ভিতর ভিতর হৃৎকম্পন আরম্ভ হয়ে গেল অনীতার। কোন মতে নিজেকে সংযত করে বলল। 'কে তোমরা? এ কোন ধরনের অভদ্রতা আরম্ভ করেছে? দেশে কি আইন-শৃঙ্খলা উঠে গেছে নাকি? জানো আমার ওপর কোনও রকম অত্যাচার করলে কাল তোমাদের কি অবস্থা হবে?'

হাসল পিচ্চি। 'কালকের কথা কালকে। আজ রাতের কথা ভাবো, সুন্দরী। তুই মেয়েলোকটাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দে, দাও, আমি আসছি এক্ষুণি।' চলে গেল সে অনীতার দিকে একবার চোখ টিপে। পিচ্চি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কথা বলল দাও।

'ঠিকই বলেছে পিচ্চি। তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়েছে আমাদের গোলাম হায়দার। এদিকে বাঘের ভয় আছে কিনা, তাই।'

'তোমরা তাহলে ইনশিওরেন্সের লোক না?'

'আরে হ্যাঃ! ওসব দালালীর মধ্যে নেই আমরা। সত্যি বলতে কি কারও চাকর না আমরা আসলে। গোলাম হায়দারেরও না। শুধু একরাতের লেগে ভাড়া করেছে সে আমাদের, তোমার সাথে রাত কাটাবার জন্যে।'

'সাইক্লোনের কথা জানতে না?' মাথার ওপর চেয়ারটা ধরাই রইল অনীতার।

'ওটা নামিয়ে রাখো। হ্যা, সাইক্লোনের কথা জানব না কেন? এতক্ষণ তো সাইক্লোন শেলটারেই ছিলাম। ডুফানটা সব গেল বলেই না আসতে পারলাম। নগদ পাঁচটি হাজার টাকা মার যেত আমাদের আজ ডিউটি করতে না পারলে।'

'একরাত পাহারা দিলে পাঁচ হাজার টাকা?'

'রাতটা যদি ভালয় ভালয় কেটে যায় তো কাল সকালে পাওয়া যাবে আরও পাঁচ হাজার।'

'রাতে কি কোনও বিপদ আশা করছেন গোলাম হায়দার সাহেব?'

'বিপদ না, বাধা।' পুরু ঠোট বাঁকিয়ে হাসল দাও। এর মানে বুঝতে পারল না অনীতা।

দ্রুত চিন্তা করছে অনীতা। এই দু'জনকে যে গোলাম হায়দার পাঠিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? কালকের জন্যে পরোয়া নেই—আজ এই ঝড় বৃষ্টির রাতে কী বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ওরা? কেনই বা এত টাকা দেয়া হবে ওদের? কি ঘটতে চলেছে আজ রাতে? এরা যে জেল-খাটা বদমাশ তাতে কোন সন্দেহ নেই, এদের সাথে গোলাম হায়দারের কি সম্পর্ক?

বিলী সর আশঙ্কা উঁকি-ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করল ওর মনের মধ্যে। ওকে কি করবে লোকগুলো? খুন? পালাবার চেষ্টা করবে ও? কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে এক মাইল পথ যাওয়ার অনেক আগেই ধরে ফেলবে ওরা ওকে। পুরানো

মডেলের একটা অস্টিন গাড়ি নিয়ে এসেছে ওরা। কাজেই শহরের দিকে গিয়ে লাভ নেই। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লে বাঁচা যাবে না? হয়তো বাঘে ধরবে, কিংবা পথ হারিয়ে না খেয়ে মারা যাবে, কিন্তু পালাতেই হবে ওকে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঝোপ-ঝাড় কাঁটা মাড়িয়ে সমস্ত গা-হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে ওর—তবু পালাবে সে।

কাউন্টারের পিছনে চলে এল অনীতা। হিটারে পানি চড়াবার ছিলে একটা কাঁটা চামচ ওজ্জে নিল সে কোমরের কালো বেল্টে। দরজার সামনে বসে আছে দাণ্ড। পিচ্চির পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই সুযোগ। একলাফে চলে গেল অনীতা পিছনের কাঁচ ভাঙা জানালাটার কাছে। খুঁট করে শব্দ হতেই চোখ পড়ল দাণ্ডর কাউন্টারের দিকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এক লাফে বেরিয়ে গেল অনীতা জানালা গলে। বুম করে পিস্তলের গুলির শব্দ পাওয়া গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ধরা পড়ল অনীতা পিচ্চির হাতে। আধ মিনিটের মধ্যেই গাড়িটা নিয়ে এসেছে দাণ্ড মোটেলের পিছন দিকে। হেড লাইটের তীব্র আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল কোন্ দিকে ছুটেছে অনীতা। ব্রী হানড্রেড মিটার স্প্রিন্ট দিল পিচ্চি তীরবেগে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছল অনীতা জঙ্গলের ধারে। জামা কাপড় ভিজে সঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে। পিচ্ছিল ঘাসের ওপর দিয়ে এতক্ষণ তা-ও দৌড়ানো গিয়েছিল কিন্তু ভিজে আঠালু মাটির ওপর গিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ানোই দূরুর হয়ে পড়ল, দৌড়ানো তো দূরের কথা। হামাওড়ি দিয়ে এগোল সে। হাঁটু ছড়ে গেল চোখা ডাল আর কাঁটার খোঁচায়। বুঝল, আর বেশি দূর এগোনো যাবে না। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে পিচ্চির। টাশ্‌শু করে গর্জ্জে উঠল পিস্তল। কানের পাশে ঠক করে শব্দ হলো। গাছের গায়ে ঢুকেছে গুলিটা।

‘চলে এসো, সুন্দরী। এর পরের গুলিটা সিধে গিয়ে পাছায় ঢুকবে।’

পিছন ফিরে দেখল অনীতা পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে পিচ্চি। চক্-চক্ করছে হাতের পিস্তল। নীরবে উঠে দাঁড়াল অনীতা। এমন ভাব করল যেন পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। ছুটে এসে ধরতে গেল পিচ্চি ওকে। টাইমিংটা একটু গোলমাল হয়ে গেল অনীতার। হেড লাইটের আলোয় ঝিক করে উঠল ওর হাতের কাঁটা চামচ। হাতটা ধরে ক্লে খনখনে গলায় হেসে উঠল পিচ্চি।

‘এ যে জাত গোফুর দেখছি, বাবা! আর আমি হচ্ছি, শালা, এক নম্বর হারামী ওঝা।’ পড়ে গিয়েছিল অনীতা পা পিছলে। চুলের মুঠি ধরে টেনে খাড়া করে দিল পিচ্চি। ‘হাওয়া হয়ে যেতে চেয়েছিলে, সুন্দরী, কিন্তু তোমায় সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের দশটি হাজার হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল, তার কি? চলো সুন্দরী, স্বপ্নের নীড়ে ফিরে যাই—কোনও কায়দা করবার চেষ্টা করলেই ভেঙে দেব কজিটা।’

নিম্নের ওপর করুণা হলো অনীতার। চোখ ঝেঁটে বেরিয়ে এল কয়েক ফোঁটা গরম পানি। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ফুঁপিয়ে উঠল অনীতা গিলবার্ট।

জানালা দিয়ে ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকানো হলো অনীতাকে। ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত পিছু পিছু ঢুকল পিচ্চি। গাড়িটা ঘুরিয়ে রেখে দরজা দিয়ে ফিরবে নাও। ঘরে ঢুকেই অনীতার জামা-কাপড় টানাটানি শুরু করল পিচ্চি। বলল, 'এক মিনিট। দাও শালা এসে পড়বার আগেই... খোদার কসম...'

কাঁচের গ্লাসটা ভেঙে গেল পিচ্চির কপালে লেগে। ফিংকি দিয়ে সরু একটা রক্তের ধারা নামল গাল বেয়ে। লাল হয়ে গিয়েছে পিচ্চির ঘোলাটে দুই চোখ। এমনি সময়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বন্ধু ও শিকল তুলে দিল নাও।

মারল ওরা অনীতাকে। অত্যন্ত দক্ষ হাতে যত্নের সঙ্গে মারল, যাতে দেহের কোথাও কোনও কাটা-চেরা দাগ না থাকে। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল অনীতা নিজের ঘরের বাথরুমে পড়ে আছে সে কলের তলায়। মাথায় ঠাণ্ডা পানি পড়ছে কল থেকে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পিচ্চি, জুলজুল করছে ওর চোখ দুটো। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল অনীতা। শরীরটা ভয়ঙ্কর রকম দুর্বল লাগছে। গলগল করে বমি করল সে।

'হ্যাঁ। বমি করে ফেলো, সুন্দরী। তাহলে একটু ভাল বোধ করবে। চান্টান করে ভাল কাপড় পরে একেবারে তৈরি হয়ে এসো অফিস কামরায়। আমাদের আগে দু'কাপ কফি খাইয়ে মারধোর করার পেরেশানিটা দূর করো, তারপর টন্ করে দেখা যাবে কার কপালে ঝুলছে তুমি। দাও শালা একটা জ্বানোয়ার। ও চাল পেলো তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। নাও আর তর সইছে না ম্যাডাম, জলদি করো।'

পিচ্চিই জিভল বাজিতে। একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে সে অনীতার দিকে। পিঠের ফিল ধরে টান দিল নিচে। ঠিক সেই সময় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল দরজায়। পাথরের মূর্তির মত জমে গেল সবাই।

আট

'ইয়া আন্না! কে এল আবার?' পিছিয়ে গেল পিচ্চি। পকেটে হাত চলে গেছে দু'জনেরই।

দাওই সামনে নিল প্রথম। বলল, 'পিচ্চি, তুই পিস্তল নিয়ে গৈরি থাক। আর তুমি এসো এদিকে। কাপড় ঠিক করে নাও আগে। হ্যাঁ, আমাদের যেমন বিদায় করবার চেষ্টা করেছিলে ঠিক তেমনি শিকল তোলা অবস্থায় দরজা একটু ফাঁক করে ক্রিয়ায় কর নাও ওদের। একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কি খুন হয়ে যাবে। একটা কস্কা কথা যদি বলে বসো তাহলে তুমিও শেষ, আর ওই লোকগুলোও শেষ। মনে রেখো। আমি আছি পেছনে।'

আবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। এবার আরেকটু জোরে। বল্টুটা নামিয়ে

দিল দাও। ঝট করে শিকলটাও খুলে ফেলল অনীতা। পিঠের ওপর পিস্তলের নল দিয়ে চাপ দিল দাও। কিন্তু ততক্ষণে দু'পাট খুলে ফেলেছে সে দরজাটা। অনীতা জানে এই অবস্থায় হঠাৎ গুলি করবে না ওরা—কারা বাইরের লোকটা এমনি অতিথি, না পুলিশের লোক জানা নেই ওদের। সত্যিই, গুলি ছুঁড়ল না কেউ। কিন্তু সবকিছু নির্ভর করেছে এখন অজানা অচেনা এই দীর্ঘদেহী আগন্তুকটার ওপর।

প্রথম দর্শনেই চমকে উঠল অনীতা। জেসাস! এ দেখছি ওদেরই আরেকজন! নিষ্ঠুর একটা মুখ, তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ, ব্যাকব্রাশ করা চুল। চেহারায়ে একটা কাঠিন্যের ছাপ। ভীত সম্ভ্রান্ত অনীতার মুখের দিকে চেয়ে অল্পত সুন্দর করে হাসল লোকটা। মুহূর্তে চিনতে পারল অনীতা।

'রানা! তুমি?' নিজেই অজান্তেই বেরিয়ে গেল শব্দ দুটো অনীতার মুখ থেকে।

৯ রানাও কম অবাক হয়নি, কিন্তু সামলে নিয়েছে আগেই। 'কেন? আশা করেনি বুঝি?'

'তুমি হঠাৎ কোথেকে?' চোখ টিপল অনীতা।

'চিটাগাং থেকে আসছিলাম। ঝড়ে পড়ে দেরি হয়ে গেল। কোনও হোটেল, মোটেল, কটেজ খোলা নেই। দূর থেকে রুম অ্যাভেইলেবল দেখে চলে এলাম।'

'কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমাদের মোটেল বন্ধ হয়ে গেছে এক সপ্তাহ আগেই। এখানে কোন রুম দেয়া সম্ভব নয়।' তর্জনী দিয়ে ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করে আবার চোখ টিপল অনীতা। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল রানা। ব্যাপার কি!

'কিন্তু আমার গাড়ির একটা চাকা পাংচার হয়ে গেছে। একটু রুম না দিলে তো খুব অসুবিধায় পড়ে যাব।'

'আচ্ছা দাঁড়াও, ইনশিওরেন্স কোম্পানির দু'জন লোক আছে ঘরের মধ্যে, ওদের অনুমতি না নিয়ে কিছুই বলতে পারছি না।' ঘুরে দাঁড়াল অনীতা। এবার রানা দেখতে পেল অনীতার জামার যিপ অর্ধেক নামানো। অনেকখানি বুঝে ফেলল সে। ঢুকে পড়ল সে ঘরের মধ্যে। পিচ্চি এবং দাণ্ডুর দিকে চেয়েই চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে গেল ওর।

'আশা করি সবই শুনেছেন আপনারা। এখানে আমার স্নাতটা কাটানোয় কোন আপত্তি আছে আপনারদের?'

'আছে,' ছবাব দিল দাও। 'আপনিও উদ্ভ্রমহিলার সব কথাই শুনেছেন। মোটেল বন্ধ। অন্য কোথাও জায়গা খুঁজে নিল গিয়ে, এখানে হবে না। চলুন, আপনার চাকা চেঞ্জ করে দিচ্ছি।'

ততক্ষণে ঘরের চারদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে চেয়ার ২টাবিলের এলোমেলো ভাব, গ্লাসের ভাঙা টুকরো আর মেঝেতে কাদার দাগ দেখে নিয়েছে রানা। আরও দু'পা ঢুকে এল সে ঘরের ভিতর। বলল, 'আমি ক্রান্ত,

আর কোনও জায়গা খুঁজে নেবার উপায় থাকলে আপনাদের আর কষ্ট দিতাম না। রাতটা আমি এখানেই কাটাচ্ছি। খুব বেশি অসুবিধে হবে তোমার, অনীতা?’

‘মোটোও না। আমার কোনও অসুবিধে নেই। রুমও সব খালি পড়ে আছে। ওরা এখন রাজি হলোই আমি একটা কামরা খুলে দিতে পারি।’

‘জায়গা হবে না বলে দিয়েছি, সোনা মানিক, কেটে পড়ো। আমরা...’ রানার জ্বলন্ত দুই চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল পিচ্চি। কথার খেই ধরল দাও।

‘চোখ গরম করছেন কেন, সাহেব? হুক্ কথাই বলছে ও। জোর করে থাকবেন নাকি...’

‘হ্যাঁ। জোর করেই থাকব। আইনের জোরে। রুম আভেইলেবল্ দেখেছি—আমি ক্লান্ত পথিক, আমাকে জায়গা দিতে আপনারা বাধ্য। নইলে মোটেলের লাইসেন্স ক্যান্সেল করিয়ে দিতে পারি আমি।’

‘বাব্বা! আবার পাওয়ার দেখায়...’

‘তুই ধাম্, পিচ্চি। এদিকে এসে কথা শুনে যা একটা।’ পিচ্চিকে নিয়ে কিছুক্ষণ গুজুর গুজুর করল দাও। তারপর বলল, ‘আচ্ছা, ঠিক আছে। থাকবেন থাকুন। কিন্তু ওসব ক্যান্সেল ক্যান্সেলের ভয় দেখাবেন না। গোলাম হায়দার সাহেবেরও অনেক ধরাধরির লোক আছে। আর সাইন বোর্ডে ওরকম ভুল হতেই পারে। তবু যখন এত করে বলছেন, থাকুন। কিন্তু আমাদের কোনও কাজে বেহুদা নাক গলাতে আসলে খামোকা বেইজ্জত হবেন। বোঝা গেছে?’

‘খুব। অনেক ধন্যবাদ। আমার সুটকেসটা নিয়ে আসছি আমি একুণি।’

‘আমি সাহায্য করতে পারি,’ বলে অনীতাও বেরিয়ে এল বাইরে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কৃষ্ণপঙ্কের চাঁদ উঠেছে শালগাছগুলোর দুই হাত ওপরে। পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা-কালো মেঘ দ্রুতবেগে উড়ে যাচ্ছে পূবে। দরজার মাঝখানে দাড়িয়ে ওদের লক্ষ করছে দাও।

‘আমাকে মেরে ফেলছিল ওরা, রানা। ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছ। ভয়ানক কোন প্ল্যান আছে ওদের। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সাবধান, পিস্তল আছে ওদের দু’জনের কাছেই।’

‘টেলিফোন নেই?’

‘না। কানেকশন কেটে দেয়া হয়েছে সাতদিন আগে।’

‘তোমার পাশের কেবিনটা দিয়ো আমাকে।’

‘তা তো নিচ্চই।’

আটাচি কেসটা অনীতার হাতে দিয়ে সুটকেসটা বয়ে নিয়ে এল রানা ঘরের মধ্যে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল দাও। একটা চাবি ছুঁড়ে দিল পিচ্চি রানার দিকে। ‘এই যে তোমার ঘরের চাবি—পঁয়ত্রিশ নম্বর।’

অনীতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, চোখ টিপল রানা। তারপর বলল,

‘ধন্যবাদ।’

‘নাম কি তোমার?’ জিজ্ঞেস করল পিচ্চি।

‘মাসুদ রানা।’

‘বানান?’

‘খুব কঠিন বানান, তুমি পারবে না। রেক্সিস্টারটা নিয়ে এসো, আমি লিখে দিচ্ছি।’

‘পণ্ডিত লোক মনে হচ্ছে? পেশা কি?’

‘পুলিস।’

হ্যাঁ হয়ে গেল পিচ্চির মুখ। জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চাটল সে একবার। ঢোক গিলে হাসি হাসি মুখ করে দাওকে বলল, ‘ওনলি, দাও, পুলিশের লোক বলে।’

‘তাতে কি হয়েছে? আমরা অন্যায় তো কিছু করি কখনো কঠে বলল দাও।’

ওদের প্রতি ঔৎসুক্য হারিয়ে ফেলল রানা। অনীতার দিকে চেয়ে বসল, ‘কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে, অনীতা? খিদে লেগে গেছে।’

‘গোটা কয়েক স্যান্ডউইচ আছে। খেয়ে নাও, কফি বানিয়ে দিচ্ছি।’

‘তোমার ভাগটা দিয়ে দিচ্ছ বোধহয়?’

‘না। মানে, হ্যাঁ। কাল সকালেই তালা মেরে ঢলে যাওয়ার কথা। তাই খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। কোনরকমে আধপেট খেয়ে কাটিয়ে দাও রাতটা।’

‘এসো দু’জনে ভাগ করে খাই। একটু শক্তি অর্জন করে রাখা দরকার। প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে। যাক, কতদিন পর দেখা, তাই না? আইভরি গিলবার্ট তোমার বোন?’

‘হ্যাঁ। ওকে আবার চিনলে কি করে? কায়িন—চাচাত বোন। আচ্ছা! তুমিই সেই বিদেশী নাবিক নাকি, যে ওকে পাগল করে দিয়েছে?’

‘কই পাগলামি তো দেখিনি, তবে আমিই সেই নাবিক। ওর মুখেই তুলেছিলাম ওর ছোট বোন আছে ওর সঙ্গে—তোমার কথাই বলেছিল তাহলে। পরে আবার ওনলাম কল্পবাজারে পাঠানো হয়েছে তাকে।’

‘হ্যাঁ। গোলাম হায়দারের এই মোটেল ড্রীম বন্ধ করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে। কিন্তু তুমি হঠাৎ এখানে এসে উপস্থিত হলে কি কবে?’

‘সে অনেক কথা। শুনে আশ্চর্য হবে, তোমার এবারের এই প্রভুটিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। বেছে বেছে ওয়ালী আহমেদ আর গোলাম হায়দারের মত প্রভু পছন্দ হয় নাকি তোমার?’

কাজ করতে করতে কথা বলছে অনীতা। একটা প্লেটে দেড় ডজন চিকেন স্যান্ডউইচ বের করল সে ফ্রিজ থেকে। রানার সামনে টেবিলের ওপর সেটা রেখে এক কেটলি পানি চড়িয়ে দিল হিটারে। তারপর ফিরে এসে বসল চেয়ারে। কোণের এক টেবিলে বসে নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ

করছে পিচ্চি ও দাণ্ড। খেতে খেতে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল অনীতা। সব শুনে গভীর হয়ে গেল রানার মুখ।

‘কিন্তু সত্যি সত্যিই ওরা কি চায় বলতে পারবে, রানা?’

‘ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে যা আঁচ করছি সেটা সত্যি হলে বড় শত্রু পাল্লায় পড়েছ তুমি এবার, অনীতা।’

‘কি আঁচ করছ?’ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল অনীতা।

‘সেটা পরে শুনো। খামোকা ভয় দেখিয়ে দিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া আমার অনুমান সত্যি নাও হতে পারে।’

স্যাডউইচ শেষ করে কফির কাপ মুখে তুলতেই দাণ্ড উঠে এল চেয়ার ছেড়ে।

‘অনেক টেনশন হতো হলো, এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। কারেন্ট অফ করে দেয়া হচ্ছে স্ট্রিকশনের মধ্যেই। পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘর আপনার।’

‘উনি আমার পাশের ঘরে থাকবেন,’ বলল অনীতা।

‘আজ্ঞে না। আপনার ঘরের দু’পাশের দুটো রুমে থাকুব আমি আর পিচ্চি। চিনি না শুনি না, একজন লোককে আপনার পাশের ঘরে আমরা থাকতে দিতে পারি না। ভদ্র মহিলার সম্মান রক্ষা করবার দায়িত্ব আমাদের ওপর। রাত-বিরাতে উঠে উনি গোলমাল আরম্ভ করবেন কিনা কে জানে? সম্পূর্ণ একজন অজানা অচেনা লোক...’

‘তুমি না চিনতে পারো, কিন্তু আমি ঐকে কতদিন ধরেই চিনি। আমার দু’পাশের কামরা যদি তোমরা দখল করে থাকো তাহলে ও আমার ঘরেই থাকবে আজ রাতে।’

‘উহ! ঢং দেখে মরে যাই!’ বলে উঠল পিচ্চি দাণ্ডর মাথার ওপর দিয়ে। ‘আমি কি দোষ করেছিলাম, সুন্দরী? আমার চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে এই লোকটা ভাল হলো?’

হঠাৎ কথা বলে উঠল রানা। ‘বেশ, আপনারা দায়িত্বশীল লোক যখন অনীতার ভার নিতে রাজি হয়েছেন তখন আমি পঁয়ত্রিশ নম্বর রুমেই নিশ্চিন্তে ঘুমাব। এসব গোলমাল আমার ভাল লাগছে না। তাছাড়া ঘুমও পেয়েছে খুব।’

‘এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা!’ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল পিচ্চি, পেটের ওপর কনুইয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিল দাণ্ড।

‘আপনারা কোন্ ইনশিওরেন্স কোম্পানির লোক?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘স্টার ফেডারেশন,’ বলল দাণ্ড।

হেসে ফেলল রানা। কোম্পানির নামটাও ভাল করে বলতে পারে না—এমনি ইনশিওরেন্স অ্যাসেসার! স্টেফ ওজা-বদমাইশ ছাড়া আর কোন পরিচয় থাকতে পারে না শুদের।

‘কয় লাখের ইনশিওর করা হয়েছে?’ আবার প্রশ্ন করল রানা।

এবার উত্তর দিল পিচ্চি। ‘তোমার এত খবরের কি দরকার, বাপু? এই সাতদিন আগে হত্রিশ লাখ টাকার ইনশিওরেন্স করা হয়েছে। হলো? এবার

উঠে পড়ো। আমি লাইট নিভিয়ে দিচ্ছি গিয়ে। শুধু শুধু কারেন্ট পোড়াবার কোন দরকার নেই।’

প্রথমে অনীতার কেবিনে ঢুকল রানা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ‘ব্যাটারদের মতলব কিছু বোঝা যাচ্ছে না। স্থানীয় লোক। গোলাম হায়দারই যে ওদের ভাড়া করে পাঠিয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আগে ঘরটা পরীক্ষা করে নিই।’ সারাটা ঘর, জানালা-দরজা, ভেন্টিলেটর সমস্ত ভাল করে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো সে। ‘একমাত্র দরজা ছাড়া ঢুকবার কোন রাস্তা নেই। মাস্টার-কী ওদের হাতে। ল্যাভেটরি পেপার ভিজিয়ে গৌজ বানিয়ে দিচ্ছি। ওগুলো দরজার নিচে গুঁজে দিলে সহজে খুলবে না দরজা।’ বাথরুম থেকে আধ রিল ল্যাভেটরি পেপার ছিঁড়ে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে শক্ত দুটো গৌজ তৈরি করল সে। লাগাবার কৌশলও শিখিয়ে দিল অনীতাকে। তারপর পকেট থেকে একটা ফোর ফাইভ ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক বের করে দিল অনীতার হাতে। ‘এটা ব্যবহার করতে জানো?’

‘ছোটকালে টয়-পিস্তল ছুঁড়ছি।’

‘বাস, বাস। ওতেই হবে। একটু নিচু করে ধরো গুলি করবার সময়। কোন ভয় নেই তোমার। খুব সম্ভব এটা ব্যবহারের প্রয়োজনই পড়বে না। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় একবার শুধু ট্রিগার টিপলেই দশ সেকেন্ডের মধ্যে পৌছে যাব আমি এখানে। বেঞ্জেড্রিন ট্যাবলেট খেয়ে নেন আমি ঘরে গিয়ে। ঘুমিয়ে পড়বার ভয় নেই। সর্বক্ষণ সতর্ক থাকব, যে কোন বিপদের জন্যে প্রস্তুত থাকব। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নাও। তার আগে কয়েকটা কথা মনে দিয়ে শোনো। দরজার নিচে গৌজ তো লাগাবেই, এই টেবিলটা টেনে লাগিয়ে দেবে দরজার গায়ে। টেবিলের-কিনারে দুটো গ্লাস এমন ভাবে রাখবে যেন একটু ধাক্কা লাগলেই মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায়। যদি দেখো দরজা ধাক্কাধাক্কি করছে কেউ, তাহলে হ্যাভেলটার কাছাকাছি তাক করে গুলি করবে দরজার দিকে।’ চলে যাচ্ছিল—হঠাৎ আরেকটা কথা মনে হতেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। ‘আজ রাতে খাটের ওপর শুয়ো না। তোষকটা নামিয়ে এনে এইপাশে বিছানা করে তার ওপর ঘুমিয়ো, পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখো।’ হাসল রানা। মস্ত আশ্বাস বুঁজে পেল অনীতা রানার এই হাসিতে। সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল ওর।

‘তোমাকে অনেক...অনেক ধন্যবাদ, রানা। ডাগিয়াস তুমি এসে পড়েছিলে! আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই বোধহয় সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাকে। এই নিয়ে দু’বার হলো। ভাবছি, তিনবারের বার সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়ে যাব তোমার।’ দুই পা এগিয়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো অনীতা রানার গালে। বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে।

রানার কথামত প্রত্যেকটি কাজ করে শুয়ে পড়ল অনীতা মেঝের উপর বিছানা পেতে। এই অভূত লোকটার কথা শুয়ে শুয়ে ডাকল সে অনেকক্ষণ। জীবনে এমন আশ্চর্য গভীর অথচ প্রাণবন্ত মানুষ আর দেখেনি সে কখনও।

হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত শ্রদ্ধা এর পায়ে অর্ঘ্য দিলেও প্রাণটি কেন যেন ভরতে চায় না। আশ্চর্য এক তীক্ষ্ণতা আছে এর মধ্যে, যেজন্যে ভয়ে ভয়ে দূরত্ব বজায় রেখেছে অনীতা। ও জানে এ লোক আপন হবার নয়। চিরকাল এর জন্যে চাতকীর মত তৎসার্ত হয়ে বসে থাকলেও বুক ভরে পাওয়া যাবে না একে কোন দিন। যখন আসবে, বন্যার মত দু'কল ছাপিয়ে আসবে—ভাসিয়ে ডুবিয়ে একাকার করে দিয়ে চলে যাবে। কেউ রাখতে পারবে না ধরে। অনীতাও পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ল অনীতা। যখন ঘুম ভাঙল তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে চারদিকে। যেমন তাপ তেমনি ধোয়া। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দরজার দিকে এগোল সে হামাগুড়ি দিয়ে। কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলছে টেকনটা। আর এগোনো যাচ্ছে না। কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে চোখে। ভয়ানক কাশতে আরম্ভ করল সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে জমাট ধোয়ায়। মড় মড় করে কড়িকাঠ ভেঙে পড়ল একটা। ঠিক এমনি সময় কে যেন চেপে ধরল ওকে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝের ওপর।

নয়

'নীতা! নীতা!' কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস করে ডাকল রানা। কঁপে উঠল অনীতার চোখের পাতা। রানা বুকল জ্ঞান ফিরছে।

'কথা বোলো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। কোন ভয় নেই, আমি রানা।'

চোখ খুলল অনীতা। চেয়ে দেখল ভেজা ঘাসের ওপর শুয়ে আছে সে খোলা আকাশের নিচে। কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলছে মাসুদ রানা। উঠে বসল অনীতা। বিকট শব্দ হচ্ছে। মড়মড় করে খসে পড়ছে ঘরের চাল। আগুনের লেলিহান শিখা সগর্জনে বিস্তার করছে নিজেকে। জ্বলছে মোটেল ড্রীম। হাসল রানা।

'এই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এবার বুঝেছ?' বুড়ো আঙুল দিয়ে জ্বলন্ত মোটেলটার দিকে দেখাল সে। 'এটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে হুমিগ্রিশ নাথ টাকা আদায় করতে চেয়েছিল গোলাম হায়দার ইনশিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে। ওই বদমাইশ দুটো ধারমাইটের গুঁড়ো ছড়াচ্ছে এখন। আগুনটাকে অফিস-কামরা আর কাফেটেরিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এখন ঘায়েল করতে পারতাম ব্যাটারদের, কিন্তু তাতে ওই কামরাগুলো বেঁচে যেত হায়দারের। গোলাম হায়দারের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিনি। সবই গেছে, ও ক'টা গেলে এমন কিছুই ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে সে নিজেই যখন এ সম্পত্তি নষ্ট করার জন্যে ভাড়া করা লোক পাঠিয়েছে। তুমি-আমি সাক্ষ্য দিলে একটি পয়সাও পাবে না সে ইনশিওরেন্সের কাছ থেকে।

জেল হয়ে যাবে এই প্রমাণের ভিত্তিতে ।’

‘কিন্তু এত ভয়ঙ্কর আশুন ধরান কি করে ওরা এত কম সময়ের মধ্যে?’ প্রশ্ন করল অনীতা ।

‘প্রত্যেকটা কেবিনে থারমাইট বস ব্যবহার করছে ওরা । পেট্রনের চাইতে অনেক সহজে অনেক ভাল কাজ হয় এই বোমা দিয়ে । কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না থারমাইটের ।’

‘তোমাকে-আমাকে দু’জনকেই পুড়িয়ে মারবার প্লান ছিল ওদের ।’

‘না । পুড়িয়ে মেরেছে ওরা কেবল তোমাকে । আমাকে আগেই গুলি করে মেরেছে ।’

কি ব্যাপার! মেবেছে মানে? মরার পর আলাপ করছে নাকি ওরা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনীতা । ‘তার মানে?’

‘মানে, এখন পর্যন্ত ওদের ধারণা পিচ্চির পিস্তলের গুলিতে মারা গেছি আমি, আর তুমি মারা গেছো দাগুর আগুনে ।’

‘ধারণা । তাই বলো । আসলে তবে মরিনি আমরা?’ হেসে ফেলে বলল অনীতা । ‘আমি তো ভেবেছিলাম মরার পর গল্প করছি বুঝি তোমার সঙ্গে!’

হাসল রানা ।

‘আরেকটু হলে তাই করতে হত । কিন্তু ওরা জানত না, আগেই আঁচ করেছিলাম আমি ব্যাপারটা । এবং এ-ও আঁচ করেছিলাম, তোমাকে মারার আগে আমাকে শেষ করতে চাইবে ওরা । তাই তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেই বিছানার ওপর হত্যাক, বালিশ আর কসল দিয়ে মাসুদ রানা তৈরি করলাম একটা । কলম দিয়ে বালিশের ওপর চুল আঁকলাম, তারপর কান পর্যন্ত চাদর ঢেকে দিয়ে একটা শার্ট বিছানার কাছে চেয়ারের মাথায় এমন ভাবে টাঙিয়ে রাখলাম যেন একজনকে দেখলেই যে কেউ মনে করে শার্টের মালিকটি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে চাদর মুড়ি দিয়ে । কেরোসিনের ল্যাম্পটা জ্বলে খুব কমিয়ে দিলাম আলোটা । ঠিক এমনি সময় নিভে গেল মোটেলের সমস্ত বাতি । আমিও নিশ্চিন্ত মনে সুটকেস হাতে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে । দরজায় চাবি লাগিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে এসে সুটকেসের ওপর বসে বসে মশার কামড় খেয়েছি এতক্ষণ ।’

‘তারপর?’

‘ফাঁটা খানেক পরই টর্চ হাতে একজনকে এগিয়ে দেখলাম আমার ঘরের দিকে । দরজা খুলেই গুলি করল লোকটা বিছানার ওপর পর পর তিনবার । পরমুহর্তেই দপ করে জ্বলে উঠল আগুন । ছুটলাম তোমার ঘরের দিকে । পৌছবার আগেই তোমার কেবিনেও আগুন লাগিয়ে দিল ব্যাটারী । একটার পর একটা দরজা খুলছে আর থারমাইট বস ফেলে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে । সামনে দিয়ে গেলে ধরা পড়ে যাব—কাজেই জানালী ভেঙে ঢুকতেই হলো তোমার ঘরে চোরের মত । ঢুকে দেখি দাঁউ দাঁউ করে জ্বলছে আগুন, আর হাপুস-হাপুস করছে তুমি । আমি ধরতেই নিশ্চিন্তে জানালী হারিয়ে পড়ে গেলে ।

বহু কসরত করে বের করতে হয়েছে তোমাকে।’

‘আমাদের দু’জনকে মেরে ওরা তো কালই ধরা পড়ত পুলিশের হাতে। পড়ত না?’

‘না। নিশ্চিতে বাড়ি ফিরে যেত ওরা। গোলাম হায়দার তোমার ওপরই দোষ চাপাত। বলত ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিয়ে খরচ বাঁচাবার জন্যে কেরোসিনের বাতি ব্যবহার করছিলে তুমি। কোনভাবে উল্টে গিয়ে আগুন ধরে যাওয়ায় সেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে তোমার। সমস্ত মোটেল আসবার-পত্র সহ ভস্ম হয়ে গেছে, কাজেই টাকা দিতে বাধ্য হত ইনশিওরেন্স কোম্পানি। ভিতর ভিতর সন্দেহ হলেও এতবড় একজন দেশবন্ধু গণ্যমান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে সাহস পেত না পুলিশ বা ইনশিওরেন্স কোম্পানি।’

‘আর তোমার মৃতদেহ যখন আবিষ্কার হত, তখন?’

‘কিছুই হত না। সবাই জানত তোমার দোষে আরেকজন লোকও প্রাণ হারিয়েছে। বেচারী সেই রাতেই এসেছিল কম্বাজারে—গাড়ির চাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কোনোমতে তোমাকে রাজি করিয়ে শেষ কামরায় আশ্রয় নিয়েছিল রাক্টিটার জন্যে। মানুষকে মউতে টানলে কার সাধ্য ঠেকায়? এইভাবেই মৃত্যু লেখা ছিল ওর কপালে।’

কথা বলতে বলতে বারবার আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চাইছে রানা। এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘একটু উচিত শিক্ষা দিতে হবে ওদের। আমি যতক্ষণ না আসি, বসে থাকো এইখানে।’

‘কিন্তু রানা, যথেষ্ট প্রমাণ তো আছে তোমার হাতে। ওদের পেছনে না লাগলেই কি নয়? যাক না ওরা পালিয়ে, কাল ধরা পড়বে। কেন শুধু শুধু বিপদের মধ্যে...’

‘না, অনীতা। এরা খুনী। বিনা দ্বিধায় খুন করতে পারে এরা মানুষকে। তুমি, আমি কি অন্যায় করেছিলাম ওদের কাছে? কালকেই যে ওরা আর কাউকে খুন করবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে? আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।’

‘আমিও যাব তাহলে,’ জেদ ধরল অনীতা।

‘খামোকা আমার কাজে বাধ্য সৃষ্টি করবে তুমি। তুমি এখানেই থাকবে। আর ধরো,’ ওর বালিশের তলা থেকে কুড়িয়ে আনা পিস্তলটা ওঁজিয়ে দিল রানা আবার অনীতার হাতে। ‘এটা হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে সামনের দিকে চলে যাও। যতটা সম্ভব আমার গাড়িটার কাছাকাছি থাকবে—দরকার হলে তোমাকে খুঁজে নিতে অসবিধা হবে না আমার। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তোমার অবস্থান যেন টের না পায় ওরা। টু শব্দ করবে না। যদি আমার কিছু ঘটে, তাহলে ধীরে ধীরে পিছিয়ে চলে যাবে সাগর তীরে। তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে শহরে। সোজা ধানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনা এবং আমার পরিচয় বলবে। নাম তো জানোই, তার আগে একটা মেজর যোগ করে

নিয়ো—দেখবে অনেক ভাড়াভাড়ি কাজ হবে। আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কাছে
বেতার মারফত আমার খবরটা জানাতে কলবে আজই রাতে। বুঝলে?’
মাথা ঝাকান অনীতা গিলবার্ট।

দশ

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। অতি সন্তর্পণে এগোল রানা জঙ্গলের ধার দিয়ে। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইছে। এদিকের তিন চারটে কেবিনে আগুন ধরেনি এখনও। অফিস কামরাটায়ও আগুন আনতে পারেনি ওরা। কাফেটেরিয়াটা শুধু পুড়েছে একা একা। মটমট আওয়াজ হচ্ছে, ফুলকি উঠছে উপরে।

কিন্তু এতক্ষণেও দমকল আসছে না কেন? গাছ-টাছ পড়েছে নাকি পথের ওপর? নাকি আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, কারও চোখেই পড়েনি এই আগুন? উত্তরে জঙ্গলের কয়েকটা গাছ আগুনের তাপে শুকিয়ে গিয়ে জ্বলে উঠেছে। দাবানল সৃষ্টি হবে নাকি? বৃষ্টিতে না ভিজলে বোধহয় তাই হত।

হঠাৎ চোখে পড়ল রানার, অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে পিচ্চি আর দাণ্ড। গাড়ির দিকে এগোচ্ছে ওরা। দু’জনের হাতে দুটো প্রকাণ্ড রেডিও সেট। কমপক্ষে পাঁচশো টাকায় বিক্রি হবে একেকটা। বোধহয় পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, তাই কেবিন থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা ও দুটো—কিছু এক্সট্রা প্রফিট হবে। সোজা হেঁটে এগিয়ে গেল রানা ওদের দিকে।

নিশ্চিন্তে গল্প করতে করতে আসছিল ওরা দু’জন। সোজা সামনে থেকে যে কেউ আসতে পারে এটা ওদের কল্পনারও বাইরে ছিল, তাই দশ হাতের মধ্যে চলে আসার পরেও দেখতে পেল না ওরা রানাকে। মনে মনে হাসল রানা। একেই বলে সারপ্রাইজ স্যান্ডিট। ওব লাইনে এ ব্যাপারটার গুরুত্ব অপরিসীম। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে সে এখন।

হঠাৎ জোরে হাঁচি দিয়ে উঠল রানা। থমকে দাঁড়াল দু’জন। সামনে জলজ্যান্ত মাসুদ রানাকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাঁ হয়ে গেল ওদের মুখ। জিভ দিয়ে পুরু ঠোট চাটল দাণ্ড একবার। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোট নড়ল কেবল, আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। মড় মড় করে কড়িকাঠ ভেঙে পড়ল পিছনের কোন একটা কেবিনের। শুল্ক ঝরে পড়ল অনেকগুলো। চক্ চক্ করে উঠল রানার হাতে ধরা ওয়ালথার পি. পি. কে.।

‘ব্যাপারটা বুঝতেই পারছ। কাজেই ভদ্রলোকের মত ঘুরে দাঁড়াও। যার হাত থেকে রেডিও সেট মাটিতে পড়বে সে-ই প্রথম গুলিটা খাবে।’

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল পিচ্চি আর দাণ্ড। রেডিও সুদ্ধ দুই হাত মাথার

ওপরে তুলে রাখল দাও। পিচ্চি ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানাকে। প্রথমে ওদের পকেট থেকে অস্ত্রগুলো বের করে নেয়া দরকার। কিন্তু একা দু'জনকে সামলানো মুশকিল। ডাক দিল রানা, 'নীতা! এ দিকে এসো।'

বেরিয়ে এল অনীতা জঙ্গলের মধ্যে থেকে। ওকে দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল পিচ্চি আর দাও। বুঝল, এবার শত্রু পাল্লায় পড়েছে ওরা—চরম পরাজয় ঘটিতে চলেছে ওদের। প্রস্তুত হলো ওরা ভিতর ভিতর প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মরক্ষার জন্যে। কেবল আত্মরক্ষা করলে চলবে না। এই দু'জনকে শেষ করতে না পারলে নিজেরাই শেষ হয়ে যাবে ওরা।

'থামো।' দশ ফুট থাকতেই থামবার আদেশ দিল রানা অনীতাকে। থেমে দাঁড়াল অনীতা। অগ্নীল কয়েকটা গাল দিল পিচ্চি অনীতার উদ্দেশে।

'খবরদার! একদম চুপ! নইলে এক গুলিতে তোমার ওই ঝুনো নারকেলের মত খুলি ফুটো করে দেব। শোনো, অনীতা। তুমি এক এক করে দু'জনেরই পকেট থেকে পিস্তল বের করে নেবে। প্রথমে তোমার পিস্তলটা ঠেসে ধরবে পিঠের ওপর তারপর পকেটে হাত দেবে। একটু নড়াচড়া করলেই টিপে দেবে ট্রিগার। আমি পেছনে প্রস্তুত থাকলাম। তাড়াহুড়ো করো না—ধীরে সুস্থে কাজ করবে। ওই কুৎসিত বেঁটে লোকটাকে দিয়ে শুরু করো।'

অপটু হাতে পরীক্ষা করল অনীতা। বলল কিছুই নেই দাওর পকেটে। শোলডার হোলস্টারে আছে কিনা খুঁজে দেখবার জন্যে বলতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ অনীতার মাথার ওপর রেডিওটা ছেড়েই পাই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর পিস্তল ধরা হাতটায় জোরে আঘাত করল দাও। ছিটকে পড়ে গেল পিস্তল মাটিতে। চেপে ধরল দাও অনীতাকে রানার পিস্তল থেকে নিজেকে আড়ালে রাখবার জন্যে।

গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। দাওর ডানগালটা সামান্য চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল পয়েন্ট ব্রী-টু বুলেট। উঁচু পর্দায় 'আউ' বলে উঠেই আরও চেপে ধরল সে অনীতাকে। প্রাণের জন্যে লড়ছে সে এখন। লাথি দিয়ে, আঁচড়ে, কামড়ে ওর হাত থেকে ছুটবার চেষ্টা করল অনীতা কিন্তু পারল না, আরও সজোরে চেপে ধরল দাও ওকে নিজ দেহের সঙ্গে। বলল, 'এইবার? এইবার কেমন হলো, শালা পুলিশের বাচ্চা? গুলি ছুঁড়লে খুন করে ফেলব এই শালীকে।' অনীতা টের পেল একটা হাত ঢিল দিচ্ছে দাও পিস্তল বের করবার জন্যে। আবার ধস্তাধস্তি আরম্ভ করল যাতে সে সুযোগ না পায়।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা, 'অনীতা! লাফিয়ে উঠে পা ফাঁক করো।'

কথাটা শেষ হবার সাথে সাথেই লাফ দিল অনীতা। আবার গর্জে উঠল রানার পিস্তল। ব্যাখায় ককিয়ে উঠল দাও—একরাশ অগ্নীল গালি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। ছেড়ে দিল সে অনীতাকে। পিছনে খট করে একটা শব্দ হতে ঘুরে দাঁড়াল অনীতা। দেখল, পিচ্চির হাতে ধরা রেডিওটা পড়ে আছে এখন রানার পায়ের কাছে। বসে পড়েছে রানা; কপাল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। যে

মুহূর্তে দাণ্ডর পায়ে গুলি করেছে রানা ঠিক সেই মুহূর্তে রেডিওটা ছুঁড়ে মেরেছে পিচ্চি রানার মাথা লক্ষ্য করে।

‘দৌড় দে, দাণ্ড!’ পিচ্চির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়েই তুলে নিল অনীতা ওর পিস্তলটা। পর পর দুটো গুলি করল অনীতা, কিন্তু একটা গুলিও লাগল না কারও গায়ে। প্রাণপণে ছুটছে ওরা অফিস কামরার দিকে। পিচ্চি পৌছে গেল আগেই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছন পিছন অদৃশ্য হয়ে গেল দাণ্ডও। উঠে এল অনীতা। জিজ্ঞেস করল, ‘খুব বেশি কেটেছে?’

‘না।’ কপালের ওপর থেকে হাত সরিয়ে দেখল রানা নিজের রক্ত। ‘তেমন কিছুই নয়। মাথাটা ঘুরে না উঠলে পালাতে পারত না ব্যাটার।’

‘কিন্তু আগেই গুলি করলে না কেন তুমি? দু’জনেরই দুই হাতে ধরা ছিল রেডিও। সহজেই তো ঘায়েল করতে পারতে তুমি দু’জনকেই।’

‘ঠাণ্ডা মাথায় এই কাজটা কখনোই হয় না আমাকে দিয়ে। কিন্তু দাণ্ডর পা-টা অন্তত খতম করে দেয়া উচিত ছিল। এতদূর দৌড়ে যেতে পেরেছে যখন, তখন নিচয়ই সামান্য ছুঁড়ে গেছে পা—ভেতরে ঢোকেনি গুলি। তার মানে দুটো পিস্তলই রয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে, কমাতে পারিনি একটাও।’

‘পালাবে কেন ওরা? তোমাকে ঘায়েল করছে গুলি করে মেরে ফেলল না কেন পিচ্চি?’

‘কেন জানে? হয়তো পিস্তল রেখে গিয়েছিল সে অফিসরুমে। জ্যাস্ত বুলেট আশুনের ধারে নিতে সাহস পায়নি। যাই হোক, যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে। গাড়িটার দিকে নজর রাখতে হবে আমাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাবার চেষ্টা করবে ওরা এখান থেকে। কিন্তু তার আগে শেষ বারের মতো চেষ্টা করবে একবার আমাদের খুন করতে। কাজেই আর গল্প নয়।’ ঝন্ঝন্ করে অফিসরুমের একটা জানালার কাঁচ ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে হাত ধরে টান দিল রানা অনীতাকে। ‘ছোটো!’

• গুলি আকুল হওয়ার আগেই ছুটল ওরা ডান দিকে। একেকবারে সাতটা করে গুলি ছুঁড়ছে ওরা। প্রচুর গুলি সঙ্গে আছে বোঝা গেল পরিষ্কার। যেখানটায় পড়ে গিয়েছিল রানা সেইদিকে গুলি ছুঁড়ছে ওরা আন্দাজের ওপর।

‘এইবার শোনো,’ দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে বলল রানা, ‘তুমি ওই পাশ দিয়ে রাস্তার ওপর চলে যাও। ওখান থেকে গাছের আড়ালে আড়ালে ওদের গাড়িটার কাঁছে চলে আসবে যতটা সম্ভব। দেখো, ধরা পড়ে যেয়ো না আবার। তোমার ধরা পড়া মানে আমাদের পরাজয়। আমার আদেশ ছাড়া গুলি কোরো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাবে কেবল। ওরা যদি গাড়িতে উঠেও পড়ে তাও চুপ করে থাকবে। বুঝলে?’

‘বুঝলাম। আর তুমি?’

‘আমি এইখানেই থাকব। তুমি সরে গেলেই গুলি করে নিজের অবস্থান জানাব আমি ওদেরকে। আক্রমণ ওরাই করবে। গরজ ওদের। আমাদের

ধতম করে দ্রুত কেটে পড়তে হবে ওদের, কাজেই দ্রুতই আসবে ওরা এখানে। চলে যাও যেখানটায় যেতে বলছি—ওখান থেকে সবই দেখতে পাবে তুমি।

অনীতা রওনা হয়ে যেতেই দ্রুত পদক্ষেপে এক নম্বর কেবিনের আড়ালে চলে গেল রানা। দুটো গুলি করল সে অফিসরুমের জানালা লক্ষ্য করে। ঠুস করে কাঁচ ভেঙে ঢুকে গেল গুলি দুটো। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দুটো পিস্তল এক নম্বর কেবিনের দিকে লক্ষ্য করে।

রাস্তার ওপর চলে এসেছে অনীতা। গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এল গাড়ি থেকে বিশ গজ দূরে। আর এগোনো ঠিক হবে না। আঙুন কমে এসেছে অনেকখানি কিন্তু তবুও যথেষ্ট আলো আছে। অফিসরুমের ছায়া পড়ায় খানিকটা জায়গা কেবল অন্ধকার, তাছাড়া পুরো যুদ্ধক্ষেত্রটা এক নজরে দেখতে পাচ্ছে অনীতা। সমানে গুলি চলছে দুই পক্ষ থেকেই। রানার দিক থেকে বন্ধ হয়ে গেল গুলি।

হঠাৎ দেখতে পেল অনীতা, ঘাসের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে দাও। এতক্ষণ অফিসরুমের ছায়ায় ছিল বলে দেখা যায়নি। পিস্তল হাতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে সে এক নম্বর কেবিনের দিকে। চিৎকার করতে গিয়েও সামলে নিল অনীতা। রানাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে সমানে গুলি চালাচ্ছে পিচ্চি। দুটো পিস্তলের অভিনয় করবার চেষ্টা করছে। রানার পিস্তল ধেমে গেল কেন? আহত হয়েছে, না টের পেয়ে গেছে ওদের প্ল্যান?

এবার এক পলকের জন্যে দেখতে পেল অনীতা রানাকে। শরীরটা বাকিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে চলে যাচ্ছে ও আঙুন নিস্তেজ হয়ে আসা পোড়া কেবিনগুলোর দিকে। খুব সম্ভব ঘুরে এসে ঢুকবার চেষ্টা করবে সে অফিসরুমের পিছনের জানালা দিয়ে। অদৃশ্য হয়ে গেছে রানা।

দাও চলে এসেছে এক নম্বর কেবিনের পিছন দিকটায়। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। সত্তর্পণে দেয়াল ঘেষে এগোল। যেখানটায় রানা দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সেদিকে পুরো ম্যাগাজিন গুলি শেষ করল দাও। কোন উত্তর নেই। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে ইশারা করল সে পিচ্চিকে যে পালিয়েছে ওখান থেকে রানা এবং অনীতা। তারপর এগিয়ে এল গাড়িটার দিকে।

ঠিক এমনই সময় পর পর দুটো গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল অফিসরুমের মধ্যে থেকে। পরমহুর্তে ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদে ভরে গেল আকাশ বাতাস। ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল পিচ্চি চিৎকার করতে করতে। বাম হাতে পিস্তল ধরা—ডান হাত ঝুলছে কাঁধ থেকে আলগা ভাবে। দৌড়াতে দৌড়াতে পিছন ফিরে গুলি করছে সে খোলা দরজা লক্ষ্য করে।

কিন্তু রানার পিস্তল গর্জন করে উঠল কাফেটেরিয়ার ওই মাথা থেকে। বসে পড়ল পিচ্চি। পায়ে লেগেছে গুলি। মাটির ওপর গড়াতে গড়াতে এগোবার চেষ্টা করছে সে গাড়ির দিকে। মাঝে মাঝে ধেমে গুলি করছে। কিন্তু রানা তখন চলে এসেছে আবার এক নম্বর কেবিনের বারান্দায়।

গর্জন ছেড়ে স্টার্ট হয়ে গেল এল্লিন। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে দাশু। সাঁ করে এসে দাঁড়াল গাড়িটা পিকির পাশে। দরজা খুলে দিতেই আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল পিকি গাড়ির ভিতর। সোজা এগোল গাড়ি রাস্তার দিকে। পানিয়ে যাচ্ছে ওরা।

রানার জন্যে আর অপেক্ষা করল না অনীতা। এক লাফে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গুলি আরম্ভ করল গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে। ঠন্ ঠন্ করে দুটো গুলি লাগল গাড়ির গায়ে। বাকিগুলো কোথায় গেল বোঝা গেল না। কিন্তু ম্যাগাজিন শেষ না করে থামল না সে।

আবার গর্জ্জে উঠল রানার পিস্তল। এবার অনেকখানি সামনে থেকে। জানালা দিয়ে পিকিও গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু সে বাঁয়ে বসেছে, আর রানা গুলি করছে ডান দিক থেকে, কাজেই রানার ধারে কাছেও ঘেঁষল না ওর কোনও গুলি। আবার গুলি করল রানা। হঠাৎ মাথা ঝরাপ হয়ে গেল গাড়িটার। সোজা এগোল সেটা রানার দিকে। চাপা দেবার চেষ্টা করছে নাকি? ছুটেতে আরম্ভ করল অনীতা রানার দিকে। হেড লাইটের আলো পড়েছে রানার ওপর। ডান পা-টা সামনে রেখে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে গুলি করছে সে সামনে হাত বাড়িয়ে। রানার দিকে এগোতে গিয়েও ঘুরে গেল গাড়িটা আবার। ফার্স্ট গিয়ারে চলছে গাড়ি। পুকুরের মধ্যে পড়বে না তো আবার? সৌখিন অতিথিরা ইচ্ছা করলে যেন মাছ ধরতে পারে সেজন্যে কাটিয়েছিল পুকুরটা গোলাম হায়দার। সাগরে নামতে যারা ভয় পায় তারা এরই মধ্যে সমুদ্র-স্নান সেরে নেয়। কিন্তু উঁচু জায়গায় কাটা হয়েছে বলে প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে রয়েছে পানি। ওই দিকটায় প্রায় ঝাড়া হয়ে নেমে গেছে পাড়টা। গাড়িটা চলছে সোজা পুকুরের দিকে। গাড়ির পিছন পিছন ছুটল অনীতা। পুকুরের ধারে বসানো সিমেন্টের বেঞ্চে লেগে এবার থেমে যাবে বোধহয় গাড়িটা। না। ভেঙে এগিয়ে গেল সেটা বীরদর্পে। ঝপাং করে ভারি একটা শব্দ হলো পানিতে। চোখে মুখে পানির ছিটে এসে লাগল। ডুব গেল গাড়িটা ধীরে ধীরে—ওধু ছাদের সামান্য কিছুটা অংশ চিক্ চিক্ করছে চাঁদের আলো পড়ে।

চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। অনীতা গিয়ে দাঁড়াল পাশে। কেটে গেল পাঁচ মিনিট।

‘ভাগ্যিণি বিগড়ে গেছিল গাড়িটা! তোমার লেগেছে কোথাও, রানা?’

‘না। দাশু চালাচ্ছিল গাড়িটা। আমার একটা গুলিতে মারা গিয়েছিল ব্যাটা। পড়ে গিয়ে অ্যাক্সিলারেটর চেপে রেখেছিল ওর মৃতদেহ।’ একটু হাসল রানা। একটা হাত রাখল অনীতার কাঁধে। ‘দুঃখ হচ্ছে না আমার। দুটো প্রাণ নষ্ট হলো ঠিকই, কিন্তু এর ফলে অনেক প্রাণ রক্ষা পেল।’ পিস্তলটা শোলডার হোলস্টারে ভরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে এগোল ওরা অফিসরুমের দিকে।

নিভু-নিভু হয়ে এসেছে আশুন। সাড়ে তিনটে বাজে। স্নান লালচে আভা বেরোচ্ছে পোড়া কেবিনগুলো থেকে। আকাশে চাঁদ।

‘বড় ক্লান্তি লাগছে, অনীতা। একটু ঘুমিয়ে নিলে হয় না? তিন চারটে কেবিন এখনও আস্ত আছে। এক নম্বর আর দুই নম্বরটা ব্যবহার করতে পারি আমরা।’

লাল হয়ে গেল অনীতার গাল। ‘যা-ই ভাবো না কেন, তোমাকে কাছ-ছাড়া করতে পারব না আমি আজ রাতে। আমি না হয় মেঝেতে ঘুমাব—আপত্তি আছে তোমার?’

হেসে ফেলল রানা। বলল, ‘হ্যাঁ, আপত্তি আছে। তুমি মেঝেতে ঘুমালে আমাকেও মেঝেতেই ঘুমতে হবে। অত সুন্দর ডাবল-বেডটা খুব দুঃখ পাবে তাহলে। তার চাইতে দু’জন মিলে ওটাকেই সম্ব্যবহার করা যাক। দু’জনের মাঝে একটা বালিশ থাকবে পার্টিশন। চলবে না তাতে?’

এগারো

এক নম্বর কেবিনে ঢুকল অনীতা রানাকে নিয়ে। রানা গেল জঙ্গলের মধ্যে থেকে সুটকেসটা নিয়ে আসতে। ঘরটা ড্যাপসা গরম হয়ে রয়েছে, জানালাগুলো খুলে দিল অনীতা। চাঁদের আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। শেষ রাতের মিষ্টি মধুর ঠাণ্ডা বাতাস আসছে সাগর থেকে। প্রাণটা জুড়িয়ে গেল অনীতার।

ঘুমাচ্ছে রানা। ডান হাতটা বালিশের তলায় পিস্তলের বাঁটের ওপর। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেছে অনীতা ওয়ে ওয়ে, আর আকাশ-পাতাল ভাবছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না চোখে।

সেই কবে পরিচয়! সাতদিন পেয়েছিল সে এই লোকটার সঙ্গ করাচিতে। তারপর কৌথায় হারিয়ে গেল। দুঃখ হয়েছে—কিন্তু অনুশোচনা হয়নি। অনীতা জানত একে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা ওর নেই। আজও বুঝল, দৈবক্রমে এসে উপস্থিত হয়েছে রানা ঠিক ওর বিপদের সময়। রক্ষা করেছে ওকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। গাড়ির চাকা বদলে কেটে পড়তে পারত মানুষটা বিপদ দেখে, কিংবা আক্রমণের প্রচণ্ডতা দেখে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু যায়নি। কাল নিজের কাজে চলে যাবে সে হয়তো অন্য কোথাও। রানা না বাঁচালে এতক্ষণে পুড়ে কয়লা হয়ে যেত ওর দেহটা—কিন্তু তবু কেন যেন বড় নিষ্ঠুর মনে হয় অনীতার রানাকে। কখনও কিছু দাবি করেনি রানা। ঠিক আছে, এভাবেই খুশি থাকবে অনীতা। ওর কাছে কোনদিন কিছু চাইবে না সে। যদি কখনও দেয়—গ্রহণ করবে অঞ্জলি ভরে। প্রত্যাখ্যান করবে না। একেই বোধহয় বন্ধুত্ব বলে। বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করবে সে রানাকে।

বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় এবং তার ওপর এই বিতিকিচ্ছিন্নী আঙুন দেখে ব্যাঙগুলোর উৎসাহে ভাটা পড়েছে। তাদের জায়গা দখল করেছে অসংখ্য বিবি পোকা। ঠাণ্ডা হাওয়াটা বড় মিষ্টি লাগছে। চাঁদটা পশ্চিমের শালগাছগুলোর মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। এবার একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।

একটা জানালার লাল পর্দা কেঁপে উঠল, আধবোজা চোখে দেখল অনীতা। বাতাসের বেগ বোধহয় বেড়েছে। কিন্তু ওদিকটায় বাতাস লাগবে কি করে? বাতাস তো আসছে মাথার দিক থেকে। মাথা উঁচু করে দেখল অনীতা এপাশের জানালার দিকে। কই, না! ভারি পর্দাটা তেমনি ঝুলছে। কাঁপছে না তো! যাই হোক, এখন ঘুমিয়ে পড়া দরকার।

এসনি সময় দেখতে পেল অনীতা মুখটা। পিচ্চি! পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর চেয়ে রয়েছে সে। চাঁদের আলো পড়ে আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে মুখটা। ধক ধক করে জ্বলছে ওর নিশ্চন্দ্র দুই চোখ।

বালিশের ওপর ঝস্ ঝস্ শব্দ তুলে খাড়া হয়ে গেল অনীতার মাথার পিছনের চুলগুলো। ভয় পেয়েছে অনীতা। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর সর্বাঙ্গ। চিংকার করবার চেষ্টা করল কিন্তু আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। পাশেই ঘুমাচ্ছে রানা—ধাক্কা দিয়ে ওকে জাগিয়ে দেবার শক্তিও নেই ওর দেহে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সে বিকট মূর্তিটার দিকে। দাঁত বেরিয়ে আছে পিচ্চির। ত্রুক্ষু হিংস্র জানোয়ারের মতো লাগছে ওকে দেখতে। হয়তো হাসছে সে শিকার দেখতে পেয়ে।

সারা ঘরে দৃষ্টি বুলাল সে ধীরে ধীরে, তারপর দৃষ্টিটা স্থির হলো ধবধবে সাদা বিছানার ওপর। চাঁদের আলো পড়ে ভৌতিক লাগছে দেখতে মুখটা। ধীরে ধীরে, মেন অতি কষ্টে, বাম হাতটা উঠে এল মাথার পাশে। কালো একটা চক্চকে জিনিস ধরা সে হাতে। ক্লিক করে সেফটি ক্যাচ নামানোর শব্দ পাওয়া গেল।

এই সামান্য শব্দটুকুতেই সংকীর্ণ ফিরে পেল অনীতা। হঠাৎ ধাক্কা দিল সে রানার গায়ে। তড়াক করে উঠে বসল রানা বিছানার ওপর। পরমুহূর্তেই প্রায় একসাথে গর্জ্জে উঠল দুটো পিস্তল। ঠক করে একটা গুলি লাগল অনীতার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে। ভয়ঙ্কর মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেছে জানালার ওপাশ থেকে।

বিছানাটা দুলে উঠল। একরাশ চাঁদের আলো এসে পড়ল ঘরের ভিতর দরজাটা খুলে যেতেই। বেরিয়ে গেছে রানা ঘর থেকে। আতঙ্কিত অনীতা চুপচাপ শুয়ে থাকল বিছানার ওপর। এক মিনিটেই ফিরে এল রানা আবার। প্রথমেই এক গ্লাস পানি ঢেলে খাওয়াল অনীতাকে, তারপর জানালাটা বন্ধ করে টেনে দিল লাল ভারি পর্দা। অনীতা বুঝল ওই ভয়ঙ্কর মুখটা আর দেখতে হবে না ওকে কোনদিন।

বিছানার পাশে এসে বসল রানা। দ্রুত পরীক্ষা করল একবার পিস্তলটা। চারটে গুলি ছিল, স্লাইড টানতেই টপাটপ অনীতার পাশে বিছানায় পড়ল

সেওলো। শিউরে উঠল অনীতা। শীতল একটা ভয়ঙ্করত্ব আছে সীসার গায়ে। কুড়িয়ে নিল সেওলো রানা। চেয়ারে একটা গুলি ভরে সেফটি ক্যাচ তুলে দিল রানা, তারপর ম্যাগাজিনে গুণে গুণে সাতটা গুলি ভরে ঢুকিয়ে দিল সেটা যথাস্থানে। আবার যন্ত্রটা বালিশের তলায় রাখল সে। তারপর বলল, 'আমারই ভুল হয়েছিল এদেরকে আভার-এস্টিমেট করা। এরকম অসাধবধান হলে বেশিদিন আর টিকতে হবে না।'

'কিন্তু লোকটা এল কি করে এখানে? ডুবে গেল না গাড়িসুদ্ধ সুইমিং পুলে?'

'ওইখানেই তো বোকামি হয়েছে আমার। খেয়াল আছে, গাড়ির ছাতের কিছুটা অংশ চাঁদের আলো পড়ে চক্ চক্ করছিল? নিশ্চয়ই যথেষ্ট বাতাস আটকে ছিল ওখানটায়। কাজেই ধীরে সূস্থে চিন্তা ভাবনা করে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছে আহত পিচ্চি। কয়েকটা গুলি খেয়েছিল লোকটা। বহুক্ষেপে গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে উঠে এসেছে প্রতিশোধ নিতে। যাক, এসো ঘুমিয়ে পড়ি। আর ভয় নেই কোন।'

প্যাচা ডেকে উঠল জঙ্গলের মধ্যে। দুটো বিঝি পোকা পাল্লা দিয়ে ডাকছিল—হঠাৎ ধেমেল গেল এক সাথে। আশ্চর্য একটা স্তব্ধতা বিরাজ করল কয়েক সেকেন্ড। তারপর আবার তান ধরল দু'জনে মিলে।

আওয়াজটা কিসের? বিঝির ডাকের কয়েক সেকেন্ড বিরতির মধ্যে বহুদূর থেকে একটা স্পীড বোটের ধুক-ধুক শব্দ কানে এল না? কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করল রানা শব্দটা। কিন্তু বিঝি দুটো মেতে উঠেছে আপন তানে। কিছু শোনা যাচ্ছে না ওদের জ্বালায়। মৃদু হেসে ঘুমিয়ে পড়ল সে পাশ ফিরে।

ঘুম ভাঙল ওর গোলাম হায়দারের ইয়টে।

বারো

মাথাটা কিমঝিম করছে। সর্বাঙ্গে অসহ্য ব্যথা। চোখ না খুলেই হাই তুলল রানা। হঠাৎ ক্লোরোক্সরমের একটা মিষ্টি গন্ধ এল ওর নাকে খুবই আবহা অস্পষ্টভাবে। পূর্ণ সজাগ হয়ে চোখ মেলল সে। মেনেই অবাক হয়ে গেল। এ কোথায় গুয়ে আছে সে? অনীতা কোথায়?

উঠে বসতে গিয়েই টের পেল রানা, শক্ত ভাবে আট্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে সে কোনও কিছুর সঙ্গে সম্পূর্ণ অচেতন কোন আধো-অন্ধকার জায়গায়। ক্লোরোক্সরম দিয়ে অজ্ঞান করে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে মোটেল ড্রীম থেকে। অজ্ঞান অবস্থায় মারধোরও করা হয়েছে প্রচুর। ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না রানা। মৃদু মৃদু দুলছে ঘরটা।

বেশ বড়সড় একটা ঘর, চারপাশটা সাদা পেইন্ট করা। ঘান আলো আসছে দু'পাশের দুটো স্কাইলাইট দিয়ে। কয়টা বাজে? রিস্টওয়াচটার দিকে চেয়ে দেখল চুর চুর হয়ে আছে কাঁচ। কিন্তু সেকেন্ডের কাঁটা তেমনি চলছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে। যদি কাঁটা নড়ে না গিয়ে থাকে তাহলে এখন বাজে বেলা চারটে। শুধু জাসিয়া পরা অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে একটা কাঠের তক্তার ওপর। তক্তাটা মাথা এবং পায়ের দিকে বেশ খানিকটা লম্বা। মাথার দিকটা একটা চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা, পায়ের দিকটা মেরেতে। হঠাৎ খানিকটা দূরে দেখতে পেল রানা অনীতাকে। ঠিক একই ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকেও। কয়েকটা স্টীলের চেয়ার আর একটা টেবিল রয়েছে ঘরের এক পাশে।

'নীতা!' ডাকল রানা। কর্কশ একটা আওয়াজ বেরোল ওর গলা থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল অনীতা। ফিসফিস করে বলল, 'চুপ! কথা বোলো না। এফুনি আবার আসবে!'

'কোথায় ওরা?'

ইঙ্গিতে পাশের ঘরের দিকে দেখাল অনীতা। ভারি পর্দা ঝুলছে একটা দরজায়। দরজাটা খোলা। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে পাশের ঘরে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রানা বলল, 'তোমাকেও মেরেছে?'

উত্তর দিল না অনীতা। রানা বুঝে নিয়ে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। ভয়ঙ্কর একটা ক্রোধ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ওর বুকের ভিতর।

'কি করে বন্দী করল আমাদের?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা একটু পর।

'ভোর রাতে স্পীড বোটে করে এসেছিল ওরা সমুদ্রের দিক থেকে। আমি বাথরুমে ছিলাম। পিস্তল দেখিয়ে বন্দী করেছে আমাকে, তোমাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে। নিয়ে এসেছে ইয়টে। চারজন লোক রয়ে গেছে মৃতদেহ আর গাড়ির ব্যবস্থা করবার জন্যে। আমাদের...'

দপ করে উজ্জ্বল বাতি জ্বলে উঠল ঘরের ভিতর। চুপ হয়ে গেল অনীতা। আলোটা চোখে সহ্য হয়ে যেতেই রানা দেখতে চুপল সর্বাস্থে ডোরা কাটা দাগ অনীতার। নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে ওরা অনীতাকে। নিজের দেহটা দেখতে পাচ্ছে না রানা, অনীতাকে দেখেই নিজের অবস্থা বুঝতে পারল।

পর্দাটা সরিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল লোবাক। বার্মিজ শার্ট আর লুঙ্গি ওর পরনে। দু'জনকেই জাঘত অবস্থায় পেয়ে ভয়ঙ্কর একটা নিঃশব্দ হাসি হাসল লোবাক। প্রকাণ্ড হাত দুটো ঝুলছে কাঁধ থেকে। স্পষ্ট আতঙ্ক ফুটে উঠল অনীতার চোখে-মুখে।

প্রকাণ্ড পায়ের পাতায় ধপ ধপ আওয়াজ তুলে রানার পাশে এসে দাঁড়াল লোবাক। এক লাখি দিয়ে চেয়ারটা সরিয়ে দিল সে। দড়াম করে মাটিতে পড়ল রানা তক্তাসহ। আঙ্গুলগুলো তক্তার নিচে পড়ায় ককিয়ে উঠল রানা। ব্যথার স্রোত বয়ে গেল ওর সর্বশরীরে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে

লোবাকের চোখের দিকে। অন্তরের সমস্ত ক্রোধ, ঘৃণা আর জিঘাংসা কুটে উঠল সে দৃষ্টিতে।

বাকী হয়ে অনায়াসে তুলে নিল লোবাক তক্তাটা। নির্বিকারভাবে আবার আগের মত রাখল সেটা চেয়ারের হাতলের ওপর, কিন্তু এবার রানা ঝুলছে নিচের দিকে। মেঝেটা দেখেই ঝুল রানা ইয়টেই আছে সে। কিন্তু চলছে না কেন ইয়টটা?

দড়াম করে লাথি পড়ল চেয়ারের পায়ায়। আবার পড়ল তক্তাটা মেঝের ওপর। নাকে আর কপালে প্রচণ্ড জ্বোরে আঘাত লাগল রানার। মনে হলো মাথাটা দু'কাঁক হয়ে গেছে। অনীতার তীক্ষ্ণ চিৎকার অস্পষ্ট ভাবে পৌঁছল রানার কানে। ঘোলা হয়ে এল সবকিছু—বহুকষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে 'নিল রানা। আবার তুলল লোবাক তক্তাটা। চোখ মিট মিট করে পানি সরাবার চেষ্টা করল রানা। স্পষ্ট অনুভব করল রক্ত গড়িয়ে নামছে ওর নাক থেকে। জ্বল জ্বল করছে লোবাকের ছোট ছোট চোখ দুটো নিষ্ঠুর আনন্দে। তৃতীয় পতনের জন্যে প্রস্তুত হলো রানা।

ঠিক এমনই সময় পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল গোলাম হায়দার। চমৎকার ছাঁটের কড়া ইস্তিরি দেয়া নীল সুট পরেছে সে। ধবধবে সাদা কটনের শাট। লাল সিল্কের টাই ড্রাগন আঁকা সোনার টাই পিন দিয়ে আঁটা। কালো জুতো আয়নার মত ঝকঝক করছে। বাম হাতের অনামিকায় থিক করে উঠল ইয়েলো ডায়মন্ড। প্রকাণ্ড একটা চুরুট দাঁতে চেপে রেখেছে সে তেরছা করে। রানার পাশে এসে দাঁড়াল গোলাম হায়দার। মুখে মসু হাসি। পাপড়িহীন নষ্ট চোখটা আরও বড় দেখাচ্ছে। গোলাম হায়দারের পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকেছে ইভিয়ান নেভির পোশাক পরা লম্বা হাভিড-সর্বস্ব সেদিনকার সেই সিরিজ-হাতে লোকটা। মারা যায়নি তাহলে সে!

আবার চেয়ারের হাতলের ওপর রাখল লোবাক তক্তাটা। কিন্তু লাথি মারবার আগেই আঙুলের ইশারায় থামতে বলল ওকে গোলাম হায়দার।

'কেমন আছেন, মিস্টার মাসুদ রানা? টিবেটান অভ্যর্থনা কেমন লাগছে? লোবাক আপনাকে বেশ আনন্দের মধ্যেই রেখেছে দেখতে পাচ্ছি। এরপর চীনা সমাদর করা হবে। আমার বিশ্বাস, এতে আরও আনন্দ লাভ করবেন আপনি। হাজার হোক, বন্ধু দেশের সমাদর তো!' অনীতার দিকে ফিরল গোলাম হায়দার। 'এই যে, অনীতা, গিলবার্ট। তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার। বোনের আমন্ত্রণে দু'দিন বেড়াতে এসে কি বিচ্ছিরি দুর্বিপাকে পড়ে গেছ, তাই না? তোমার সাথে যে আবার এইসব মহারথীদের যোগসাজশ থাকতে পারে একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আমি। যাক, সবকিছু এখন আমার আয়ত্তে চলে এসেছে। চিন্তা কোরো না, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই প্রিয়তমের হাত ধরে হাওয়ায় ভেসে চলে যেতে পারবে স্বর্ণের দিকে। তখন আর এই পাষাণ গোলাম হায়দার বাধা দিতে পারবে না তোমাদের বিমল আনন্দে।' আবার ফিরল সে রানার দিকে। 'আহা-হা! ঠোঁটের রক্ত চাটছেন

কেন, বললেই হয় তৃষ্ণা পেয়েছে। ডাক্তার, এক গ্লাস জল খাওয়াও দেখি মিস্টার মাসুদ রানাকে।

সত্যিই ভয়ঙ্কর তেষ্ঠা পেয়েছিল রানার। লম্বা লোকটা পাশের ঘর থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে এল। রানার একটা হাত খুলে দিল লোবাক। হাতটা চোখের সামনে তুলে দেখল রানা সারা হাতে কালশিরা পড়ে গেছে প্রচণ্ড মারে। কড়ে আঙুলটার নখ ফেটে রক্ত জমে আছে খানিকটা। গলা ঠুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। অত্যন্ত আয়তনের সঙ্গে গ্লাসটা নিল সে। কিন্তু অল্প খানিকটা পানি মুখে নিয়েই কালো হয়ে গেল ওর মুখ। সমুদ্রের লবণ পানি।

হাসছে লোবাক। পানি ভরা গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল রানা ওর মুখের ওপর। চট করে একটা হাত তুলে মুখ আড়াল করল লোবাক। হাতে লেগে মেঝের ওপর পড়ে ভেঙে গেল গ্লাসটা। একরাশ পানি ছিটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। হাত সরতেই দেখা গেল তেমনি নিঃশব্দ হাসি লোবাকের মুখে—এক ফোঁটা পানি লাগেনি মুখের কোথাও।

এই অভদ্র আচরণে গম্ভীর হয়ে গেল গোলাম হায়দারের মুখ। ইঙ্গিত করল সে লোবাককে। আবার হাতটা বেঁধে দিল লোবাক। এবার খানিকটা নিশ্চিত হয়ে একটা স্টীলের চেয়ারের ওপর এক পা তুলে দিয়ে কিছুক্ষণ আনমনে চুকট টানল গোলাম হায়দার। তারপর বলল, ‘আপনাকে আগেই সাবধান করেছিলাম আমি, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনি ফায়ার ট্রিপলিসিটির মানুষ, আমি ওয়াটার। পানির সঙ্গে দ্বন্দ্ব চিরকাল হেরেছে আঙুন। সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে উত্তরোত্তর বেড়ে গেলেন আপনি—উঠে-পড়ে লাগলেন আমাকে ধ্বংস করবার চেষ্টায়। উপায় থাকল না আমার। আর একঘণ্টার মধ্যে আপনার চিহ্নও থাকবে না পৃথিবীর বুকে। আবদুল হাইয়ের কিছুটা অংশ পাওয়া গিয়েছিল, আপনার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু এই একটি ঘণ্টার আপনাকে আমরা নরক দেখিয়ে আনব। এই ব্যাপারে আমার চাইতে ডক্টর নিয়োগীর উৎসাহই বেশি। আর্টিস্টিক টেম্পারামেন্টের মানুষ—এসব সাদামাঠা ব্যাপারের মধ্যে আমি থাকব না। আমি এসেছি আপনাকে গোটা কয়েক ইন্টেলেকচুয়াল শব্দ দেয়ার জন্যে।’

রানা বুকল, মৃত্যু ঘটবে ওর। অকথ্য নিষ্ঠুর নির্ধাতন করা হবে ওকে মেরে ফেলার আগে। এই ব্যাপারে কোন আশা বা সাহুনা দিল না সে নিজের মনকে। হাত পায়ের বাঁধন ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছে সে—পাকা হাতের কাজ, খোলা অসম্ভব। যা অবশ্যজ্ঞাবী সেটাকে মেনে নেবার চেষ্টা করল সে। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, তখন আর টের পাবে না সে কিছুই—এই যা একটু ভরসার কথা। কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত? থাক, আগে থেকে ভেবে কষ্টের তীব্রতা বাড়িয়ে লাভ নেই।

‘আবদুল হাইয়ের মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিল জানান?’ জিজ্ঞেস করল গোলাম হায়দার।

‘জানি।’

‘হাস্করের মুখে, এটুকু তো সবাই জানে। কিন্তু চিটাগাং-এর সাগর-সঙ্গমে হাস্কর এল কোথা থেকে সেটা নিশ্চয়ই জানেন না?’

‘জানি। খুলনার দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে।’

ভুরু কঁচকে গেল গোলাম হায়দারের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল রানার চোখের দিকে। এই লোক কতটা জানে বের করতেই হবে ওকে। সব কথা বের না করে হত্যা করা যাবে না একে।

‘কি করে এল?’

‘রক্তের ঘাণে।’ গোলাম হায়দারকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইতে দেখে মৃদু হেসে যোগ করল, ‘বিস্মিত করতে চেয়েছিলে, কিন্তু প্রথম শকটা তোমার ওপর দিয়েই গেল, গোলাম হায়দার। এবার দ্বিতীয় শক দেয়ার চেষ্টা করে দেখো।’

‘বাহ! খেলা খেলা গোছের মজা পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? কলুন দেখি, মোটেল ড্রীম পুড়ল কেন?’

‘মাত্র ছত্রিশ লাখ টাকার জন্যে। একটি পরিসাও যার পাবে না তুমি।’

‘আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার প্লানের মধ্যে আপনি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে যেটুকু গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিলেন তা ঠিকঠাক করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা পাই পরিসা গুণে গুণে দিতে হবে ইনশিওরেন্স কোম্পানিকে। যেতারে খবর গেছে চিটাগাং-এ। ইতিমধ্যেই উকিল ক্লেইম স্যুট করে দিয়েছে। চেকও বোধহয় রেডি হয়ে গেছে এতক্ষণে।’ অত্যন্ত আনন্দিত মনে হলো গোলাম হায়দারকে।

‘এতক্ষণে চেক নয়, হাতকড়া রেডি হয়ে গেছে তোমার জন্যে, শয়তান। আমার গাড়ি আর পিচ্চির মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলেই মনে করছে সব কল রক্ষা হয়েছে? দাও কোথায়?’

‘ও নিশ্চয়ই কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে সরে গেছে ঘটনাস্থল থেকে।’

‘পিচ্চির মৃতদেহ আর আমার গাড়িটা ফেলেই পালাল কেন?’

‘কেন?’ আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইল গোলাম হায়দার রানার দিকে।

‘কারণ পিচ্চির আগেই মৃত্যু হয়েছিল দাওর। গাড়িসুদ্ধ পড়ে আছে সে সুইমিং পুলের মধ্যে। এতক্ষণে পুলিশের লোক আর দমকল বাহিনী তুলে ফেলেছে লাশ। পুরো ব্যাপারটা যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না ওদের। কেমন লাগল দ্বিতীয় শকটা?’

গম্ভীর হয়ে গেল গোলাম হায়দার। বিপদ টের পেয়েছে সে।

‘কলুন দেখি সেই বাদরের মত দেখতে চোরটাকে কেন ধরেছিলাম?’

‘তোমার টাকা জালের ব্যাপারে জেনে ফেলেছিল লোকটা অনেকখানি, তাই।’

দু’পা এগিয়ে এল গোলাম হায়দার। নষ্ট চোখটা আরেকটু বিস্ফারিত দেখাল। ভদ্রতার মুখোশ ঝসে পড়ল ওর। উজ্জ্বল দেখাল ওকে।

‘তুমি জানলে কি করে? পাটটা তাহলে তোমাদের হাতে পড়েছে?’

‘হ্যাঁ। এখন ঢাকার হেড অফিসে। এই ব্যাপারে আমার মতামতও জানানো হয়েছে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে। কোথায় টাকা ছাপা হচ্ছে সে ঠিকানাটাও।’

বোকা হয়ে গেল গোলাম হায়দার। বুঝল, যতখানি সহজ মনে করেছিল, আসলে ব্যাপারটা তা নয়। অনেক প্যাচ খেয়ে জটিল হয়ে গেছে সমস্ত কিছু। বিচলিত হয়ে পড়ল সে। এর কাছ থেকে সমস্ত তথ্য জেনে নিয়ে সেইমত ব্যবস্থা করতে হবে। চেহারায় একটা দৃঢ় সঙ্কল্প ফুটে উঠল ওর। যে-কোনও উপায়ে সব কথা বের করতেই হবে। চেয়ে দেখল মুচকে মুচকে হাসছে রানা। ওর অবস্থা সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল সে।

‘কেমন লাগল তৃতীয় ধাক্কাটা?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘সমস্ত ব্যাপার জেনে ফেলেছ, তাই বলতে চাও তুমি?’

‘সবকিছু। ইয়টের নিচে সরু করিডর দিয়ে গিয়ে ডান ধারে যে গোপন কী-বোর্ড আছে, তার আটনম্বর চাবিটা কোন্ দোজখে প্রবেশের চাবিকাঠি তা-ও জানা আছে আমার।’ এবার সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলল রানা।

‘কি বললে?’ ফ্যাকাসে হয়ে গেল গোলাম হায়দারের চেহারা। ‘সাবমেরিনের কথাও জেনে ফেলেছ!’

ভিতর ভিতর হোঁচট খেলো রানা। বলে কি! সাবমেরিন! ইয়টের তলায় করে পাকিস্তানী রাডার এড়িয়ে সাবমেরিন আসছে ইন্ডিয়া থেকে! রুমানার কথার সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে। রাইমঙ্গলের মোহনায় পৌছে শিকারের ভান করে গোলাম হায়দার। সাবমেরিন তখন ঘুরে আসে ডায়মন্ড হারবার থেকে। ইয়টের নিচে ফাঁপা জায়গা আছে সাবমেরিনের জন্যে। আবার সেটা ইয়টের ছায়ায় ছায়ায় চলে আসে চিটাগাং-এর সাগর-সঙ্গমে। সেখান থেকে যায় কক্সবাজার আর টেকনাফের মাঝামাঝি এক দুর্গম জঙ্গলে—যেখানে কয়েক কর্মাইল জায়গা কিনে নিয়ে কাঠের কান্নবার আরম্ভ করেছে গোলাম হায়দার। এরই জন্যে পঁচিশ নম্বরের বেশি স্পীড দিতে দেখেনি কেউ এই ইয়টকে। কিন্তু কি এদের উদ্দেশ্য? গত ছ’মাস ধরেই লক্ষ করেছে পি. সি. আই, যে কোন ভারতীয় স্পাইকে সন্দেহ করা হয়েছে টের পেলেই বর্ডারের দিকে না গিয়ে সোজা চিটাগাং পালিয়ে যাচ্ছে ওরা আজকাল—এবং বেমানুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু এইটুকুর জন্যে এতবড় একটা ব্যবস্থা করবে না ভারত, তাহলে কি ডায়মন্ড প্যাচ কষছে সে এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে? নিশ্চয়ই কোন মহা পরিকল্পনা আছে ওদের। কি সেটা?

রানার ভিতরে এতগুলো চিন্তা খেলে গেল ঠিক তিন সেকেন্ডের মধ্যে। একটুও পরিবর্তন হলো না মুখের চেহারায়।

‘কে বলেছে!’ সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠল গোলাম হায়দারের কণ্ঠস্বর। চুরুটটা ধরল সে রানার দিকে পিস্তলের মত করে। ‘বলো, কে বলেছে! বলতেই হবে তোমাকে, কে বিশ্বাসঘাতকতা করল।’ ধীরে ধীরে

এগিয়ে নিয়ে আসছে সে জ্বলন্ত চুরুটটা রানার চোখের দিকে।

মুদু হাসল রানা। বলল, 'খুব ভয় পেয়েছ, গোলাম হায়দার। কল্পনাও করতে পারেনি ইস্টেনেকচুয়াল শক্ দিতে এসে ট্যাকটিকাল কিং খেতে হবে। আমি জানি, আর অল্পক্ষণেই মৃত্যু ঘটবে আমার। কাজেই তোমার চুরুটের আগুন আমি ভয় পাই না—মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করেছি আমি আমার মনকে। কেবল দুঃখ, তোমার মত একটা তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাচড়ার হাতে প্রাণটা যাচ্ছে। তেমন জ্বানরেল কোন ভিলেনের হাতে মরেও সুখ আছে। সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমি। তবে মনে রেখো বিষ-কামড় আমি দিয়ে দিয়েছি। নিস্তার নেই তোমার।'

'কিছুই হবে না আমার। তেমন বিপদ দেখলে আজই পালিয়ে যাব আমি সাবমেরিনে করে। এখুনি ইয়ট ছেড়ে দিলে কে ঠেকায় আমাকে? জঙ্গলের মধ্যে যদি হারিয়ে যাই কে খুঁজে পাবে আমাকে?' যেন নিজেকেই নিজে আশ্বাস দিল গোলাম হায়দার।

'চেষ্টা করেই দেখো না! আকাশে-পাতালে; জলে-ভাঙায় কোথাও তোমার আর জায়গা নেই, গোলাম হায়দার। সব কথা বলিনি। বললে এখুনি আত্মহত্যা করতে চাইবে তুমি। বলি আর না-বলি, ধরা তুমি পড়বেই, আর আমি মারা যাবই। কাজেই যদি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করো তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কি কি কাজ করেছি এবং কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছি সব হয়তো বলতে পারি।'

'তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। নির্ধাতনের মাধ্যমে সব কথা বের করে নেব আমি।'

'চেষ্টা করে দেখো। আমি প্রস্তুত। একটি কথাও বের করতে পারবে না আমার কাছ থেকে। ওই তো চুরুট রয়েছে হাতে—ঠেসে ধরো না আগুনটা আমার চোখের মধ্যে। পরীক্ষা করে দেখো। একটি কথাও বলব না। নির্ধাতনে দেরিই হবে কেবল। মনে রেখো সময় ফুরিয়ে আসছে তোমার।' রহস্যময় হাসি হাসল রানা।

লাল হয়ে উঠল গোলাম হায়দারের ফর্সা মুখ। থর থর করে কাঁপছে সে। গলায় আরও সাদা হয়ে ফুটে উঠল ফাঁসের দাগটা। টকটকে লাল হয়ে গেল নষ্ট চোখ। দাঁতগুলো বেরিয়ে আসায় বীভৎস লাগছে ওকে দেখতে। আধ মিনিটের মধ্যেই সামলে নিল সে। আবার একবার আশ্চর্য হয়ে গেল রানা ওর দুর্দান্ত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে। কিন্তু প্যাচের মধ্যে পড়ে গেছে সে এখন। পরাজয় স্বীকার করতেই হলো ওকে।

'কি প্রশ্ন আছে তোমার?' শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠ গোলাম হায়দারের।

'টাকার তো তোমার অভাব ছিল না, জাল করতে নামলে কেন?'

'সে অনেক কথা, সংক্ষেপে বলছি। কিছুই অভাব ছিল না আমার—প্রচুর পরিমাণে টাকা ও সব রকম বিলাসিতা উপভোগ করেছি আমি। যখন প্রয়োজন বোধ করলাম, যথেষ্ট পরিমাণে যশ উপার্জন করলাম। কিন্তু অর্থ আর যশ

ছাড়াও মানুষের জীবনে আর একটি জিনিসের দরকার—ক্ষমতা। উপলব্ধি করলাম, ক্ষমতার অভাব আছে আমার মধ্যে। এ যুগে এ দেশের আমি শ্রেষ্ঠ মানব। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি আমি আমার অসাধারণ বুদ্ধিবলে। অন্যায়সে শোষ্ট আসনে উঠে গেছি। তাহলে ক্ষমতারই বা শ্রেষ্ঠ আসনে বসতে পারব না কেন? প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আমি শটকাট রাস্তা বেব করে নিয়েছি মগজ খাটিয়ে। এ-ব্যাপারেও অতি অল্প সময়ে সাফল্য অর্জন করবার কৌশল আবিষ্কার করে নিলাম। সেটা হচ্ছে টাকা জ্ঞান।

‘ক্ষমতা মানে ঠিক বুঝলাম না। তোমার ধারণা, টাকা হলই ক্ষমতা হবে?’

‘তুমি একটি গর্দভ। টাকা আমার যথেষ্ট ছিল—কিন্তু ক্ষমতা বলতে আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কথা বুঝি। পাকিস্তানের সম্রাট হতে চাই আমি। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে রেখে যেতে চাই আমার নাম। কিন্তু তা করতে হলে দেশের বর্তমান স্থিতিশীল অবস্থার ওপর আঘাত হানতে হবে আমাকে সবার আগে। অর্থনৈতিক আক্রমণটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক আর দ্রুততম বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। তাই এক সঙ্গে সমস্ত দেশে আমি অসংখ্য টাকা ছাড়ব। কোটি-কোটি-কোটি-কোটি টাকা। সমগ্র পাকিস্তানের টোটাল মানি-সাপ্লাই হচ্ছে ১০৮৫ কোটি টাকা। বাজারে চাল আছে মোট ৬৩৫ কোটি টাকা। আমি ছাড়ছি দশ হাজার কোটি টাকা। দরকার হলে আরও ছাড়ব। কল্পনা করতে পারো ব্যাপারটা? বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাড়া হবে টাকাগুলো। ডায়মন্ড রকমের মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে এর ফলে। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কি সাংঘাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। চল্লিশ টাকা মণ চাল বিক্রি হবে চারশো টাকায়। পনেরো দিনে খসে পড়বে পাকিস্তানের এতদিনকার গড়ে তোলা অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। হাহাকার পড়ে যাবে চারদিকে। দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে...’

‘টাকাগুলো ছাড়বে কি করে?’

‘আমার নিষ্পত্ত হাজার কয়েক লোক বাজার থেকে সমস্ত জিনিস কিনতে আরম্ভ করবে। চোখ বুজে। অসংখ্য জিনিস কিনে ফেলে দেয়া হবে নদীতে। বিশ দিনের মধ্যেই গদীচ্য হবে ক্ষমতাসীন সরকার। সমস্ত কিছু ছক কেটে রেখেছি। ঠিক দুইমাস পর নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করব আমি।’

‘পাগলামিরও একটা সীমা আছে—সেটাও ছাড়িয়ে গেছ তুমি। যাক, এর মধ্যে ইন্ডিয়া ঢুকল কি করে?’

‘ওরা সাহায্য করল আমাকে। আমিও সাহায্য করলাম ওদের। টাকা ছাপার অফসেট মেশিন ওরাই ইমপোর্ট করে দিয়েছিল আমাকে জার্মানী থেকে। এক্সপোর্ট সব ওদের। কাগজ সমস্তই দিচ্ছে ওরা। পুরোদমে চলছিল দশ, পঞ্চাশ আর একশো টাকার নোট ছাপার কাজ। আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে এসে পড়েছিল, এমন সময় নষ্ট হয়ে গেল মেশিনের একটা পার্ট। স্যাম্পল পাঠিয়ে দিলাম কলকাতায়। কারণ পাকিস্তান থেকে ওই পার্ট

ইমপোর্ট করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। বন্ধুরা যোগাড় করে পাঠিয়ে দিল পাটটা বিশেষ লোক মারফত। সেইটাই চুরি করেছিল সেই হিঁচকে চোর গিলটি।

এইবার গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। ভয়ঙ্কর এক খেলায় মেতেছে গোলাম হায়দার। একে ঠেকানোর কি কোনই উপায় নেই? টাকা ছাপার মেশিনের পাট সম্পর্কে ওর রিপোর্টে উল্লেখ ছিল, কিন্তু তার বেশি কিছুই নয়। আরও তথ্য সংগ্রহ করে তারপর ওর সন্দেহের কথা প্রকাশ করবে ভেবেছিল রানা। ভাগ্যক্রমে ওর মিথ্যে কথাগুলো গোলাম হায়দারের দুর্বল জায়গায় লেগে যাওয়ায় এত কথা জানতে পারল সে। কিন্তু জেনে লাভ কি হলো? খবরটা ঢাকায় জানানোর কোন উপায় নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু ঘটবে ওর। ওর মৃত্যুর সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যাবে সমস্ত প্রমাণ এবং তথ্য। গোলাম হায়দারের এই ধ্বংসাত্মক লীলায় বাধা দেবার থাকবে না কেউ। সত্যি সত্যিই যদি সে অসংখ্য কোটি টাকা বাজারে চালু করে তাহলে কি সাংঘাতিক অবস্থা যে সৃষ্টি হবে তা ডাবতেও শিউরে উঠল রানার সর্বাঙ্গ। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শোক মারা যাবে না খেয়ে। গোটা পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা আর উন্মত্ততার রাজত্ব কয়েক মাস হবে।

‘আর কোন প্রশ্ন আছে তোমার?’

‘একটা অনুরোধ আছে।’

‘কি?’

‘এই সব পাগলামি ছেড়ে হেমায়েতপুর মেটাল হস্পিটালে ভর্তি হয়ে যাও। সীটও খালি আছে ওখানে। দু’দিনেই ভূত ছাড়িয়ে দেবে ওরা।’

‘অর্থাৎ আর কোন প্রশ্ন নেই তোমার। এবার বলো আমার বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করেছে তোমরা।’ নিজের প্ল্যানটা বলতে বলতে আবার হত আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে গোলাম হায়দারের। কষ্টের শুনেই বুঝতে পারল সেটা রানা। আচমকা গোটা কয়েক বোম্বাস্টিক কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল সে, চিন্তা করবার কিছুটা সময় পেয়ে রানার চাতুরী ধরে ফেলেছে। রানাকে চুষ করে থাকতে দেখে আরও নিশ্চিত হলো সে। বলল, ‘কি? বলবার কিছুই পাছ না বোধহয়?’

‘তুমি কি করে ভাবতে পারলে যে কোনও কথা বলব আমি তোমাকে? খেপেছ নাকি, হে? বলে দহ, আর অবস্থা বুঝে একটা ব্যবস্থা বের করে কেনো তুমি—এতখানি বুদ্ধি ঠাওরালে কেন আমাকে?’

ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কমাল গোলাম হায়দার রানার গালে। ঝন্ঝন্ করে উঠল মাথাটা। দাঁতে দাঁতে চেপে রাখল রানা।

‘তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি, মিথ্যুক শয়তান!’ বলল গোলাম হায়দার। ‘কোন খবর পৌছায়নি ঢাকায়। টাকশাল আর সাবমেরিনের খবর পৌঁছলে এতক্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্সার প্লেন আর হেলিকপ্টার এসে হাজির হয়ে যেত। চিটাগাং পোর্টে নোঙর করা দু’দুটো ডেপুটীয়ার ছুটে আসত হাঁ হাঁ

করে। ওয়ারলেসে খবর পেয়ে যেতাম আমি আরও অনেক আগেই। কাজেই কোন খবরই জানে না কেউ। এবং তুইও এখন জেনেছিস অনেক পরে—যখন কাউকে কিছু জানাবার আর সুযোগ ছিল না। তার মানে কি? মানে বিশ্বাসঘাতক, নেমকহারাম আছে কেউ এই ইয়টে। কে সে? কার এতবড় আশ্পর্ধা? চাবির নম্বর পর্যন্ত যখন মিলে যাচ্ছে, তখন ভুল নেই এতে। বল, হারামজাদা, কার কাছ থেকে জেনেছিস তুই সাবমেরিনের কথা? আবার দুটো চড় মান গোলাম হায়দার রানার গালে। এবারও নীরবে হজম করল রানা সে আঘাত। কিন্তু আবার মারবার জন্যে হাত তুলতেই থুক করে থুথু ছিটিয়ে দিল সে ওর মুখের ওপর।

আবার একবার লাল হয়ে উঠল গোলাম হায়দারের মুখ। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেলে দিল সে রুমালটা মাটিতে। তারপর বলল, 'ডক্টর নিয়োগী!'

একটা স্টীলের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর হাত ভাঁজ করে তার ওপর মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাম্বিল নিয়োগী, চমকে উঠে চোখ মেলে চাইল। এদের বকবকানির চোটে ঘুম এসে গিয়েছিল তার। চোখ ঘষতে ঘষতে সোজা হয়ে বসল সে।

'তোমার চাইনির্জ ট্রিটমেন্ট তৈরি করো, ডাক্তার।' কথাটা বলেই লোবাককে ইঙ্গিত করল গোলাম হায়দার। তক্তাটা আলগোছে তুলে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে এল লোবাক। হেলান দিয়ে রাখল সেটা টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের হাতনে। একটা সুইচ অন করবার শব্দ পাওয়া গেল—সাথে সাথেই মৃদু গুঞ্জন তুলে চালু হয়ে গেল কিসের যেন একটা যন্ত্র।

ততক্ষণে সামলে নিয়েছে গোলাম হায়দার। নষ্ট চোখটা তেমনি লাল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিশেষ বা রাগের আভাসমাত্র নেই। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি খুব ঠোকের বশে চলি—এটাই আমার একমাত্র দোষ, মিস্টার মাসুদ রানা। একবার মাথায় রাগ চাপলে সমস্ত বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যায় আমার। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারি। আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি—আমাকে মাফ করে দেবেন। মরা মানুষের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমার এংগু ডাঙায় যেতে হবে। ফিরে এসে আপনাকে দেখতে পাব না। কাজেই যাবার আগে আপনার বদদোয়া কুড়িয়ে নিয়ে যেতে চাই না।'

রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, 'মনে কোনও কষ্ট নেবেন না, মিস্টার মাসুদ রানা। স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলে মৃত্যুটা সহজ হবে। আপনার সঙ্গে আমার বিরোধ হয়েছে—এর পরিণতি যে-কো-ও একজনের মৃত্যু। আমার ক্ষমতা বেশি, তাই আপনাকেই বরণ করে নিতে হচ্ছে মৃত্যুটা—আপনার ক্ষমতা বেশি হলে আমারও এই একই অবস্থা হত। সাবুভাইডাল অভ দা ফিটেস্ট। আপনার মৃত্যুটা প্রয়োজন—আমার কয়েকজন লোকের মৃত্যু হয়েছে আপনার হাতে, কাজেই উপযুক্ত নির্যাতন করা হবে আপনাকে হত্যার আগে। ডাক্তারের হাতে যে যন্ত্রটা দেখছেন, ওটা একটা

ড্রিলিং মেশিন। অতি সূক্ষ্ম কাজ হয় ওতে। এ ব্যাপারে নিয়োগীর তুলনা হয় না।

পেন্সিলের মত একটা যন্ত্র ধরে আছে নিয়োগী তিন আঙুল দিয়ে—ঠিক যেন তুলি ধরেছে কোন শিল্পী। ব্যাপারটার ভয়ঙ্করত্ব টের পেল রানা। অশ্লীল কয়েকটা গালাগালি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। পার্বত্যার বুঝতে পারল, এদের হাত থেকে নিস্তার নেই ওর। নিষ্ঠুরতম নির্যাতন করবার জন্যে তৈরি হয়েছে এরা।

‘প্রথমে কোন চোখটা ড্রিল করতে দেবেন, মিস্টার মাসুদ রানা? ডান চোখ, না বাঁ চোখ?’

আবার কয়েকটা বুলি বেরোল রানার মুখ থেকে। মৃদু হাসল গোলাম হায়দার। ‘এখন এসব কথা উচ্চারণ না করে আদ্যার নাম করলেই পারতেন। অবশ্য যার যেমন খুশি সে তেমন করবে—অন্যের নাক গলানো উচিত নয়।’

‘আমাকে মেরে ফেললেই তুমি নিস্তার পেয়ে যাবে মনে করেছ? তোমার বিরুদ্ধে এমন সব প্রমাণ...’

‘এসব তো আর শুনতে চাইনি আমি, মিস্টার মাসুদ রানা। নির্যাতন করে কোন কথা বের করবার চেষ্টা করব না আমরা আপনার কাছ থেকে। কোন তথ্যের বিনিময়েই আপনার মৃত্যুদণ্ড নাকচ করা হবে না, শাস্তির মাত্রাও কমবে না একবিদ্যুৎ। কাজেই এসব কথা বলে লাভ নেই কোনও। কোনখান থেকে কাজ আরম্ভ করতে চাও, ডক্টর নিয়োগী? প্রথমেই চোখ নষ্ট করে দিলে দেখতে পাবে না ও কি ঘটছে। তার চেয়ে পা থেকে শুরু করো। চোখে এসে থামবে। এক ইঞ্চি পর পর এফোড় ওফোড় করে দাও পায়ের হাড়। কিংবা এক কাজ করো সবচেয়ে কম ব্যথা লাগবে যেখানটার সেখান থেকে আরম্ভ করো।’

‘তাহলে কানের লতি থেকেই শুরু করতে হয়,’ বলল নিয়োগী একগাল হেসে।

‘আচ্ছা, যা ভাল বোঝো করো। আমার কাজ আছে, যেতে হবে এক্ষণি। একক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছে নাজনীন। গুড বাই, মিস্টার মাসুদ রানা। দেখা হবে।’ আঙুল তুলে উপর দিকে ইশারা করে স্বর্ণ না নরক কি বোঝাতে চাইল গোলাম হায়দার ঠিক বোঝা গেল না। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

রানাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কজার মধ্যে পেয়ে পরস্পরঃ দিকে চেয়ে অর্ধপূর্ণ হাসি হাসল লোবাক ও নিয়োগী। তারপর এগিয়ে এল। झুলা করে উঠল রানার কানের লতি। রক্ত নামল গাল বেয়ে। কড়মড় করে দাঁত ঘষল রানা, পেশীগুলো টান করে রাখল—চিৎকার করে অনীতাকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না সে। রানাকে দেখতে পাচ্ছে না অনীতা—ও যত কম টের পায় ততই ভাল। কিন্তু সবচেয়ে কম ব্যথাই যদি এই ব্যথা হয়, তাহলে অন্য জায়গায় গর্ত করলে সহ্য করবে সে কি করে?

ফুটো হয়ে গেছে রানার কানের লতি। যন্ত্রটা সামনে-পিছনে করে

এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে গর্তটা আরেকটু বড় করল নিয়োগী। ব্যথায় দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল রানার চোখ থেকে। কানের কাছে ছোট্ট ড্রিলিং মেশিনের শব্দটা প্লেনের এঞ্জিনের শব্দের মত মনে হলো ওর কাছে। আঙুন ধরে গেছে যেন রানার কানে। ড্রিলের নিডলটা বের করে নিল নিয়োগী। পরস্পরের দিকে অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল আবার লোবাক ও নিয়োগী।

যেন ক্রাসে লেকচার দিচ্ছে এইভাবে একটা আঙুল তুলে বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল নিয়োগী, 'দেখুন, মিস্টার রানা, এই যে এখানে নার্ডটা—এটাকে বলে ট্রাইজেমিনাল' মুখের ওপর একটা আঙুল রেখে দেখাল সে নার্ডটা, 'আর এটাকে বলে সাইয়াটিক নার্ড, এগুলোর ওপর মৃদু অত্যাচার করব আমরা এবার। অল্পতেই পাগল করে দেয়া যায় একটা মানুষকে। ক্যালকাটা সেন্ট্রাল জেলের দুটো পেশেন্টকে এই ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম। কাটা মুরগীর মত হটফট আরম্ভ করে দিয়েছিল তিন সেকেন্ডেই। কিন্তু তার জন্যে ঝোলানো দরকার আপনাকে মাথা নিচু দিকে করে। লোবাক, তোমার কর্ড কোথায়?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দেয়ারাজ থেকে একটা নাইলনের রিল বের করল লোবাক। বাধা দেবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। সিলিং-এর একটা কড়ার মধ্যে দিয়ে কড়ে আঙুলের অর্ধেক মোটা নাইলনের রশিটা ঘুরিয়ে এনে বাধা হলো শক্ত করে ওর ডান পায়ের গোড়ালি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে। তক্তার সঙ্গের বাধনগুলো কেটে দিয়ে টেনে তোলা হলো পা-টা উচুতে। কাঁধটা ছাড়া বাকি দেহ উঠে গেল মাটি ছেড়ে। গোটা দেহের ওজন পড়তেই মাংস কেটে বসে যেতে আরম্ভ করল রশিটা পায়ে। ব্যথায় কঁচকে গেল রানার মুখ। একটা তীক্ষ্ণ ধ্বনি বেরোল অনীতার মুখ থেকে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে এখন রানাকে। ওর তক্তাটা ঘুরিয়ে এদিকে মুখ করে দিয়েছে লোবাক।

'চোখ বন্ধ করে রাখো, অনীতা!' কর্কশ কণ্ঠে বলল রানা। যতটা সম্ভব কাঁধের ওপর দেহের ভার ধারণ করবার চেষ্টা করল সে। স্পষ্ট দেখতে পেল সে রক্ত নৈমে আসছে পা বেয়ে নিচের দিকে। কোনও কৌশলে মৃত্যুটাকে তরাণিত করা যায় কিনা ভাববার চেষ্টা করল সে। কিন্তু অসহ্য ব্যথার ফলে কিছুই ভাবতে পারছে না সে আর।

এতক্ষণ অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল নিয়োগী রানার দিকে। এবার আবার ড্রিলিং মেশিনটা চালু করে এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

হঠাৎ একটা বেল বেজে উঠল ঘরের মধ্যে। দরজার মাথায় একটা লাল বাতি জ্বলল-নিডল সেই সাথে। বিরক্ত মুখে সেদিকে চাইল নিয়োগী, তারপর চাইল লোবাকের দিকে। লোবাকও বিরক্ত হয়েছে। টেবিলের পায়ার সাথে রিলটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল সে।

'তাড়াতাড়ি এসো, লোবাক। নইলে তোমার জন্যে অবশিষ্ট থাকবে না আর কিছু। যাও, কুইক।'

বেরিয়ে গেল লোবাক অপ্রসন্ন মুখে। রানা ভাবল, বোধহয় ডেকে পাঠিয়েছে ওকে গোলাম হায়দার কোন জরুরী ব্যাপারে। গোলাম হায়দার সাগর সঙ্গম-২

এতক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের ওপর ওর বাহ্যলোতে চলে গেছে। সেখানেই গেল লোবাক? এর ফলে কি নির্ধাতন পিছিয়ে যাবে? নিয়োগী কি লোবাককে ছাড়া নিজেই ওর ট্রিটমেন্ট আরম্ভ করবে? আর যে সহ্য করতে পারছে না সে। রণে টান পড়ায় পা থেকে একটা অসহ্য ব্যথা দমকে দমকে নেমে আসছে তলপেটের কাছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে সে এক্ষুণি।

এগিয়ে এল নিয়োগী। সাদা প্যান্টটা দেখতে পাচ্ছে রানা, আর মড়মড় করে হাঁটু আর মাজার শুকনো হাড় কোটার শব্দ শুনে পাচ্ছে। কাছে আসতেই হঠাৎ বাঁ পায়ে দড়াম করে লাথি মেরে বসল রানা ওর তলপেটে। পরমুহূর্তে নিজেই আত্ননাদ করে উঠল ব্যথায়। এই নড়াচড়ার ফলে তলপেটে ছুরির আঘাতের মত ব্যথা অনুভব করল সে।

লাথি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল ডক্টর নিয়োগী। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। মড়মড় করে ফুটল অনেকগুলো হাড়। এবার পিছন থেকে মাথার কাছে চলে এল সে। চক্ চক্ করে উঠল সরু ড্রিলিং মেশিনটা রানার চোখের সামনে।

ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল রুমানা। খালি পা, কাপড়-চোপড়-চুল বিস্তৃত, হাতে একটা রিভলভার। কপালে আর ঠোঁটের কোণে রক্ত, ডান গালে চোখের ঠিক নিচেই বড় একটা ফোঁস পড়েছে। হাতের রিভলভারটা সোজা নিয়োগীর বুকের দিকে ধরা।

‘রুমানা! তুমি...’

‘চূপ!’ রানাকে থামিয়ে দিল রুমানা অস্বাভাবিক কণ্ঠে। টেবিলের ওপর থেকে ছুরি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল সে নিয়োগীকে। উঠে দাঁড়াল নিয়োগী মড়মড় আওয়াজ তুলে। ‘মাথার ওপর হাত তুলে ওইখানে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াও।’

মাথার ওপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াল নিয়োগী। চলতে থাকল ওর ডান হাতে ধরা ড্রিলিং মেশিন। কেটে দিল রুমানা নাইলনের রশিটা। দড়াম করে পড়ছিল পা-টা মাটিতে, বাম পা ব্যবহার করে কৌশলে নামিয়ে আনল রানা সেটা আশু করে।

‘হাতের বাঁধন—রুমানা, জলদি!’ বলল রানা।

রুমানার হাতের রিভলভার স্থির হয়ে রয়েছে নিয়োগীর দিকে। রানার কণ্ঠস্বর শুনে পিছন ফিরে দেখবার চেষ্টা করল নিয়োগী। সাথে সাথেই ধমক খেল রুমানার কাছে।

‘খবরদার! ঘুরে দাঁড়াও!’

বাট করে পিছন ফিরল নিয়োগী।

হাতের বাঁধন খুলে যেতেই ছুরিটা নিয়ে নিজেই নাইলনের রশি কেটে আলাগা করে দিল রানা পা থেকে।

‘রিভলভারটা আমাকে দাও, রুমানা। টলছ কেন তুমি এমন করে? কি হয়েছে? এমনভাবে মারল কে তোমাকে? আমি এখানে আছি জানলে কি করে?’

একসাথে এতগুলো প্রশ্ন শুনে মলিন হাসি হাসল রুমানা। রিভলভারটা রানার হাতে দিয়ে পট্ট পট্ট করে জামার বোতাম খুলে দেখাল সে রানাকে। বুকে-পিঠে পোড়া পোড়া দাগ। চুরুটের আঙন ঠেসে ধরেছে কেউ বারবার। চাবুকের দাগও দেখতে পেল রানা। খুন চেপে গেল ওর মাথায়।

‘কে? গোলাম হায়দার?’ জিজ্ঞেস করল রানা। কঠিন হয়ে গেছে ওর মুখটা।

মাথা ঝাঁকাল রুমানা। এতক্ষণে লক্ষ করল রানা—খাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রুমানার।

‘রুমানা, অনীতা গিলবার্টের বাঁধনটা একটু কেটে দেবে? একুশি এসে পড়বে লোবাক, প্রস্তুত থাকতে হবে আমাকে।’

এতক্ষণ অনীতাকে লক্ষই করেনি রুমানা। ঝট করে ফিরল সে অনীতার দিকে। তাড়াতাড়ি জামার বোতাম লাগাতে গিয়ে দেখল রানারই মতো প্রায় উলস অনীতা গিলবার্ট। টলতে টলতে এগিয়ে গেল রুমানা। রানা সাহায্য করল একটা হাত ধরে। বাঁধন কেটে দিয়ে অনীতার সাহায্যে একটা খাটের ওপর বসে পড়ল রুমানা। বিছানার চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণ করল অনীতা। এগিয়ে গেল রানা।

‘আমরা এখানে আছি জানলে কি করে তুমি?’ আবার প্রশ্ন করল রানা।

‘গোলাম হায়দারের কাছে। বিশ মিনিট আগে। ওর ধারণা সাবমেরিনের কথা আমিই বলেছি তোমাকে। আজ নাকি সময় নেই, কাল আবার আসবে সত্যি কথাটা বের করবার জন্যে।’

‘কোথায় গেল গোলাম হায়দার?’ নিয়োগী নড়ে উঠল। ‘খবরদার নিয়োগী!’ জমে গেল নিয়োগী বরফের মত। একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে গিঁঠ দিয়ে নিল রানা।

‘ওই তো সামনে একটা টিলার মাথায় কাঠের বাংলো আছে ওর। ইয়ট আর সাবমেরিন যেকোনও মুহূর্তে ছাড়ার জন্যে প্রস্তুত রাখার হুকুম দিয়ে চলে গেছে সে ওই বাংলোয়।’

‘টাকা ছাপার মেশিনটাও কি ওইখানেই?’

‘না। ওটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাটির নিচের একটা ঘরে। চারপাশে মেশিনগান নিয়ে গার্ড আছে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। ওর কাঠের আড়তের বেশ খানিকটা পুবে।’

‘এখান থেকে রাস্তা আছে টেকনাক রোডে পড়বার?’

‘হ্যাঁ, রোড দিয়েই তো এসেছে গোলাম হায়দার। কিন্তু জানা না থাকলে কেউ আসতে পারবে না পথ চিনে। উহ। মাথাটা ঘুরছে আমার। আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি, রানা।’

পড়ে যাচ্ছিল, একহাতে জড়িয়ে ধরল রানা ওকে। বিদ্যুতের মত ঘুরেই লাফিয়ে চলে এল নিয়োগী রানার কাছে। চক্চক করে উঠল ওর হাতে ধরা ছুরিটা। চট করে ঘুরে রিভলভারটা ওর দিকে তাক করতে করতে এসে পড়ল

নিয়োগী। টিগার টিপল রানা। খালি চেয়ারের ওপর ঝুঁক করে পড়ল হ্যামার, গুলি বেরোল না। লাফিয়ে সরে গেল রানা খানিকটা। বুড়ো আঙুলে হ্যামারটা টেনেই টিগার টিপল আবার। বুকের কাছে চলে এসেছিল নিয়োগীর উদ্যত ছোরা, সরে গেল সেটা হাত খানেক। ফরটি ফাইভ ক্যালিবারের বুলেট জোর ধাক্কা মারল নিয়োগীর বুকে। হড়মুড় করে পড়ে গেল হাভিডসার লম্বা দেহটা রানারই ওপর। ছিটকে চলে গেল ছোরাটা খাটের তলায় হাত থেকে খসে।

ঠিক সেই সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল লোবাক।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা নিয়োগীর দেহটা গায়ের ওপর থেকে। কিন্তু রিডলভারটা তাক করবার আগেই একখানা স্টীলের চেয়ার তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল লোবাক। হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল রিডলভারটা। একটা ত্রুণ গর্জন করে প্রকাণ্ড হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে পিঠটা একটু কুঁজো করে এগোল লোবাক রানার দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। মুখে-চোখে ওর পৈশাচিক ভয়াবহতা পিছিয়ে যাচ্ছে রানা। একলাফে রিডলভারের কাছে চলে গেল রুমানা। নিচু হয়ে কুঁকে তুলে নিচ্ছে সে রিডলভারটা মাটি থেকে। মাথাটা নিচু হয়ে রয়েছে বলে দেখতে পেল না সে লোবাককে। ডানপাশে পা ফেলে সরে এসেছে লোবাক দ্রুত গতিতে।

‘রুমানা! পালাও!’

চিৎকার করে উঠল রানা। কিন্তু সাবধান হবার আগেই পৌছে গেল লোবাক ওর পিছন দিকে। দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরল সে রুমানার। চোখ দুটো জুলজুল করেছে ওর, রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রয়েছে।

শিউরে উঠল রানা। দেখল হাতের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছে লোবাকের। চাপ দিচ্ছে সে রুমানার মাথায়। ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখ, কুঁকড়ে গেছে দেহ—কি যেন বলবার চেষ্টা করল রুমানা। ভয়াবহ একটা মড়মড় শব্দ কানে এল রানার। নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত চেপে ধরল সে। দেখল হঠাৎ কেঁপে উঠল একবার রুমানার দেহটা, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বোরিয়ে এল কান দিয়ে, পরমুহূর্তে অসাড়া হয়ে গেল।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তীব্র একটা অমানুষিক চিৎকার করেই ঢলে পড়ল অনীতা বিছানার ওপর।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রানার। ছুটে যাচ্ছিল সে লোবাকের দিকে। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল সেটা আত্মহত্যারই নামান্তর হবে। তক্তাটা তুলে জোরে মারল সে লোবাকের মাথা লক্ষ্য করে। আগুে করে রুমানার মাথাটা তুলে ধরল লোবাক—বাড়িটা পড়ল রুমানার মাথায়। পরমুহূর্তেই মাথা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে ধরে ফেলল সে তক্তাটা। একটানে রানার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল সেটা ঐকপাশে। রুমানার প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়েছে মেঝের ওপর।

আবার পিঠ কুঁজো করে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে এগোল লোবাক রানার দিকে। পালিয়ে বেড়াতে লাগল রানা। একবার মুঠোর মধ্যে চলে

গেলেই সব শেষ।

খাটের নিচে হাত বাড়াল অনীতা। ছুরিটা তুলবার চেষ্টা করছে সে মাটি থেকে।

‘সাবধান, অনীতা! মেরে ফেলবে!’ দেখতে পেয়েই চিৎকার করে বল রানা।

চট করে পিছন ফিরে চাইল একবার লোবাক। এইটুকু সময়ই চেয়েছিল রানা। একলাফে মেঝেতে কাৎ হয়ে থাকা চেয়ারটার পাশে চলে এল সে—মাথার ওপর তুলেই প্রাণপণ শক্তিতে মারল ছুঁড়ে লোবাকের দিকে। একটা বিকট শব্দ বেরোল লোবাকের মুখ থেকে। একটা পায় বকের ওপর লেগেছে জোরে। টলে উঠল, কিন্তু পড়ে গেল না লোবাক। আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা। এবার একলাফে অনেকটা কাছে এগিয়ে এল লোবাক।

তাড়াতে তাড়াতে একটা কোণে নিয়ে এসেছে লোবাক রানাকে। ওখান থেকে ওর হাত এড়িয়ে পালাবার কোনও রাস্তা দেখতে পেল না রানা। ইঠাৎ কোমর থেকে একটানে তোয়ালেটা খসিয়ে নিয়ে খোলা অবস্থায় ছুঁড়ে মারল সে লোবাকের মুখের ওপর। তোয়ালে দিয়ে ঢেকে গেল লোবাকের চোখ। মাত্র দুই সেকেন্ড সময় পেল রানা। এক লাফে ডান-পাশে সরে গিয়ে লোবাকের হাতের কাছে দেয়ালের একটা তাকের ওপর থেকে মার্টিনি ভর্তি এক লিটারের একটা বোতল তুলে নিল সে। তোয়ালেটা সরিয়ে ফেলতেই প্রচণ্ড জোরে ভাঙল বোতলটা লোবাকের মাথার ওপর। চোখ মুখ ভেসে গেল তরল পদার্থে। ভাঙা কাঁচের বোতলটা দিয়ে জোরে বোঁচা দিল রানা লোবাকের গলা লক্ষ্য করে। আত্ননাদ করে উঠল লোবাক, লাফিয়ে সরে এল রানা। প্রকাণ্ড হাত দুটো প্রায় ধরে ফেলেছিল ওকে। গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে লোবাকের গলায়। প্রথমে সাদা, পরে লাল হয়ে উঠল জায়গাটা। একটা আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করল লোবাক ক্ষতস্থানটা।

পিছিয়ে যাচ্ছিল রানা মেঝের ওপর পড়ে থাকা রিডলভারের দিকে। বুঝতে পারল লোবাক রানার মতলব। দ্রুত এগিয়ে আসছে সে। একটা চেয়ার তুলে নিল সে বাম হাতে।

ঠিক এমনি সময় গ্রাস ভাঙা একটুকরো কাঁচের ওপর পড়ল রানার পা। লবণ পানির গ্রাস। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু পিছলে গেল পা-টা। পড়ে গেল রানা। পড়েই চোখ পড়ল একটা ভীত সম্ভ্রান্ত কচি মুখের ওপর। ছোট্ট একটা মুখ দেখা যাচ্ছে পর্দার ফাঁকে। সে মুখে গিজগিজ দাড়ি। নিম্পাপ সরল দুটো চোখ। গিলটি মিঞা।

মাথার ওপর তুলে নিয়েছে লোবাক স্টীলের চেয়ার। এক বাড়িতেই ফিলু বেরিয়ে যাবে রানার। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে পেল লোবাক—রানার চোখের বিন্মিত দৃষ্টি আগেই লক্ষ করেছে সে—আওয়াজ শুনে পাই করে ঘুরে দাঁড়াল।

বানরের মত একলাফে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়িয়েছে গিলটি মিঞা। হাতে একটা ল্যাগার পিস্তল। কিন্তু হলে কি হবে, সামনে দৈত্যের মত লোবাককে দেখে অসম্ভব ভয় পেয়েছে সে। ধর ধর করে কাঁপছে পিস্তল ধরা হাত। সেই সঙ্গে ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছে দুই হাঁটু।

গর্জে উঠল গিলটি মিঞার হাতের পিস্তল। ও-ই ছুঁড়ল, না গুলিটা আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল ঠিক বুঝতে পারল না রানা; শুধু অনুভব করল ওর কানের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল বুলেটটা।

ছুড়ে মারল চেয়ারটা লোবাক গিলটি মিঞার মাথা লক্ষ্য করে। বাউলি কেটে সরে গেল গিলটি মিঞা। এবার এগোল লোবাক গিলটি মিঞার দিকে বিদ্যুৎ-গতিতে। রানা বুঝল, গিলটি মিঞাকে আরেকবার গুলি হোঁড়ার সুযোগ দিলেই নিশ্চয় মারা পড়বে সে। লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে রিভলভারটা তুলে নিল সে মেঝে থেকে। পরপর দু'বার অগিবর্ষণ করল রিভলভার। পাশাপাশি দুটো গর্ত সৃষ্টি হলো লোবাকের মাথার পিছনে। প্রকাণ্ড হাত দুটো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ওপরে উঠল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে রানার দিকে।

লাফিয়ে সরে গেল গিলটি মিঞা। সাথে সাথেই ওর হাতের পিস্তল থেকে 'বুম' করে গুলি ছুটে লাগল গিয়ে ঘরের ছাতে।

তেরো

'সন্ধানাশ! তিনশো দুইয়ে (মার্ডার কেস) ফেঁসে যাব না তো, স্যার? থী সেবেনটি নাইন (চুরি) কি ফোর ইলিভেনকে (বমাল খেতান) কুছ পরোয়া করিনে, কিন্তু মার্ডার কেসে জীবনে পড়িনি, স্যার। ওসবের মদ্যে আমাকে পাবেন না।' তিন তিনটে মৃতদেহ দেখে ঘাবড়ে গেল গিলটি মিঞা।

'তোমার কোন ভয় নেই,' বলল রানা। তোয়ালেটা কোমরে পেঁচিয়ে নিয়ে মৃতদেহ তিনটে সঙ্ক্ষিপ্ত ভাবে পরীক্ষা করেই উঠে দাঁড়াল সে। অনীতার পাশে গিয়ে বলল, 'পাশের ঘরে চলো অনীতা। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

পাশের ঘরটা সিক বে। ঘরগুলো সাউন্ড প্রুফ করা রানা বুঝল এক্ষণেই গোলাগুলির শব্দ শুনে ছুটে আসেনি কোন লোক। দরজাটা ভিতর থেকে লাগিয়ে দিয়ে কাবার্ড খুলে এক বোতল ব্র্যান্ডি বের করল রানা। তিনটে গ্রাস নিষ্ফল রানা, নিষেধ করল গিলটি মিঞা।

'আমি ওসব খাই নে, স্যার। খিদে লেগেছিল, ভরপেট পানি খেয়ে নিয়েছি টাইটমুর করে। পেটের ভেতর ঢক ঢক করচে ভরা কলসীর মত। সেই কাল রাক্তির থেকে...'

‘তুমি এখানে এলে কি করে, গিলটি মিঞা? এই পিস্তলই বা পেনে কোথায়?’

‘এইচি গাড়ি চড়ে। পেন্সলটা পেইচি কানা হারামীটার সুটকেসের মধ্যে।’

‘গাড়ি চড়ে এলে কি করে?’

‘আর বলবেন না, স্যার, বড় কষ্ট পেইচি। কাল সোন্দের সময় দেকি তিন তিনটে গাড়ি তোয়ের হচ্চে। সবচেয়ে বড় গাড়িটার পিছনে উটে পড়লুম। মাল রাকবার জায়গায়। অন্দোকারে আমার ওপরই দুটো সুটকেস চাপিয়ে দিলে শালারা। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে। একটা বাজের ভেতর থেকে সুখন্দা আসছিল—ওতে আর হাত দিলুম না, স্যার—বুজলুম ইত্তিরিলোকের। অন্য বাজের ভেতর পেলুম এই পেন্সল আর এইটা।’ ইশারায় বুক পকেটে আটা পারকার সিক্সটি ওয়ানের দিকে দেখান গিলটি মিঞা।

‘তারপর?’

‘তারপর স্টেটে ঘুম দিলুম। অট্টুকন জায়গায় কি ভাল ঘুম হয়? ঘাড় ব্যথা হয়ে গেচে আমার। ঘুম থেকে উটে দেকি বাজ দুটো গায়েব। বেরিয়ে দেকি শেষ রাত্তির, গ্যাবেজের দরজা চিচিং ফাঁক। কাঠের একটা বাংলো দেকা যাক্কে চুনকাম করা। টুকে পড়লুম। ওখানেই এক ওয়াজোবের ভেতর ডেঁড়িয়ে আপনার সব খবর শুনলুম—তা ঘট্টা দু’য়েক আগে তো হবেই।’

‘এখানে এলে কি করে? অমন কাঁপছিনেই বা কেন? আরেকটু হলে তো সাবড়ে দিয়েছিলে আমাকেই।’

‘আর লজ্জা দেবেন না, স্যার। ভয় পেয়েছিলুম খুব, সম্বো শরীল আপনা আপনি কাঁপতে আরম্ভ করে দিলে। সেই রায়েটের সময় ক্যালক্যাটায়...’

‘ইয়টে কোন লোকজন দেখলে না? বাধা দিল মা কেউ?’ ওকে খামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘না, স্যার। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। তবে দু’একজন নোক যে একেবারেই চোকে পড়েনি, তা নয়। নুকিয়ে উটে পড়েচি। একেবারে ডাঙার সঙ্গে লাগানো রয়েছে তো ইন্টিমারটা। অনেক খুঁজে এই ঘর বের করতে হয়েছে।’

‘জু, ক্যাপ্টেন এরা সব গেল কোথায়! আশ্চর্য তো!’

ফোন বেঞ্জে উঠল সিক-বের। রেডিও-টেলিফোন। গিসিডার তুলে কানে লাগাল রানা।

‘কে? নিয়োগী?’

‘হ্যাঁ।’ ডক্টর নিয়োগীর কণ্ঠস্বর নকল করবার চেষ্টা করল রানা।

‘আমি সামন্ত। কাজ শেষ?’

‘আমার কাজ শেষ। এখন বাকিটুকু নোরাবের হাতে ছেড়ে দিয়ে তামাশা দেখছি।’

‘চলে এসো। জরুরী কনকারেল বসেছে। সবাই উপস্থিত। তুমিও চলে

এসো ।'

'হঠাৎ? কি ব্যাপার?'

'আমাদের পালাতে হতে পারে। কিছুক্ষণ আগে দুটো সী-প্লেন মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে গেছে। খবর এসেছে দুটো পাকিস্তানী ডেইয়ার রওনা হয়ে গেছে। এই দিকেই আসছে ওগুলো। মিলিটারি এরিয়াতেও নাকি অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। নিচে এসে সব ভনো। চাবিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে—লোক থাকবে গেটের সামনে।'

'গোলাম হায়দার?'

'ও আছে বাঙলোতে। ওই ছুঁড়িটার সঙ্গে। দরকার হলে ওকে ফেলে রেখেই চলে যাব আমরা। কুইক!'

ছেড়ে দিল ওখারের রিসিভার। এক লাফে পাশের ঘরে গিয়ে নিয়োগীর ইউনিফর্মটা খুলে পরে নিল রানা। একটু আঁটা হলো। কিন্তু জুতো জোড়া পায়ে লাগল না। ইয়টে লোক নেই কেন এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা। সবাই আছে কনফারেন্সে। খুব সম্ভব প্রত্যেকটি লোকই ভারতীয়। যাই হোক, ঝুঁকিটা নিতে হবে রানাকে। অনীতাকে নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবার আদেশ দিল সে গিলটি মিঞাকে। রানা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পর ইয়ট থেকে নেমে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়বে ওরা।

সিক-বে থেকে বেরিয়ে খানিকদূর এগোতেই সমুদ্রের একাংশ চোখে পড়ল রানার। ডুবে যাচ্ছে সূর্যটা। পশ্চিমের আকাশ লালচে ছায়া ফেলেছে সাগরের বুকে। অন্ধকর্মেই আধার হয়ে যাবে চারদিক। তাড়াতাড়ি সারতে হবে সব কাজ।

সী-প্লেন যে কেন ইয়টটাকে খুঁজে পায়নি বুঝতে পারল রানা। সাগরতীরের ঝাড়া উঁচু দুটো জঙ্গলে ছাওয়া টিলার মাঝখান দিয়ে গভীর করে কেটে বেশ খানিকটা ভিতরে নিয়ে ইয়টটা নোঙ্গর করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘন গাছপালায় ছেয়ে আছে জায়গাটা। আকাশ থেকে সহজে কারও চোখে পড়বে না। দ্রুত এগিয়ে চলল রানা গোলাম হায়দারের কেবিনের দিকে। জাহাজের নিচে নামবার অন্য কোন রাস্তা ওর জানা নেই—জানা থাকলেও সেদিক দিয়ে নামা ঠিক হত না হয়তো, কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

ঠিকই বলেছিল গিলটি মিঞা। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ইয়টটা। দু'একজন এটা-ওটা নিয়ে ব্যস্ত আছে, ইন্ডিয়ান নৌবাহিনীর পোশাক দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করল না কেউ রানাকে। তবে কি এই ইয়টের বেশির ভাগ লোকও সাপ্লাই দিয়েছে ইন্ডিয়া?

গোলাম হায়দারের কেবিনটা খোলা। ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল রানা। গুপ্ত পথের দরজাটাও খোলা। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে নিচে। গোলাম হায়দার? উঁকি দিয়ে দেখল রানা নিচের দিকে। অন্ধকারে বোঝা গেল না। দূরে চলে যাচ্ছে শব্দটা। পনেরো সেকেন্ড অপেক্ষা করে নেমে এল

রানা সিঁড়ি বেয়ে। দুটো মোড় ফিরতেই স্বল্পালোকিত সেই করিডরটা দেখতে পেল রানা। মাথা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক চেয়েই দেখতে পেল সে লোকটিকে। গোলাম হায়দার নয়—স্টুয়ার্ড। একা।

লোকটা মোড় ঘুরতেই পা টিপে চলে এল রানা মোড়ের কাছে। সোজা গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল স্টুয়ার্ড। তেমনি বাল্ব জ্বলছে দরজার মাথায়। কী-বোর্ডের ঢাকনিটা তুলে একটু বিশ্মিত হলো স্টুয়ার্ড। এবার জোরে তিনটে টোকা দিল সে দরজার উপর। দরজাটা ফাঁক হলো একটু। একটা সাবমেশিনগানের নল বেরিয়ে এল ফাঁক দিয়ে, পরীক্ষা করা হলো নিজেদের লোক কিনা, তারপর খুলে গেল দরজা। একরাশ ধোয়া বেরিয়ে এল। আবছা মত একজন লোক দেখতে পেল রানা। পরমুহর্তেই ক্লিক করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মাথার মধ্যে। যতদূর সম্ভব শুধু একজন লোক আছে গেটে। কিন্তু ধোয়া কেন? ধোয়া না বাষ্প? এঞ্জিনরুমের কাছাকাছি কি এই দরজাটা? এই দরজা দিয়ে ঢুকলে সাবমেরিনের ঠিক কোন্ অংশে পৌঁছবে সে?

সাবমেরিনের মোটামুটি আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামাল রানা। তারপর এগিয়ে গেল আর্মার্ড স্টীলের দরজাটার সামনে। গুণে গুণে টোকা দিল তিনটে। মাথাটা বাম ধারে কাত করে রেখে এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে সে যাতে দরজা ফাঁক করেই ইন্ডিয়ান নেভির ইউনিফর্মটা দেখতে পায় প্রহরীটা। রিভলভার ধরা ডান হাত আড়ালে রাখল রানা। দরজা ফাঁক হলো একটু। সোজা রানার পেটের দিকে ধরা সাব-মেশিনগানের মুখ। আর একটু ফাঁক হলো দরজা। আবছা একটা মুখ দেখতে পেল রানা আড়-চোখে। ব্যারেলের মুখটা সরে গেছে রানার পেটের ওপর থেকে। একপাশে সরে ঢুকবার জায়গা করে দিয়েছে প্রহরী ইউনিফর্ম দেখে।

দড়াম করে রিভলভারের নল পড়ল প্রহরীর নাকের উপর। পিছিয়ে গেল সে এক পা। রানা ঢুকে পড়েছে ভিতরে। আবার মারল সে প্রচণ্ড জোরে লোকটার কানের পাশে। লুটিয়ে পড়ল প্রহরী জ্ঞান হারিয়ে। শূন্যেই ধরে ফেলল রানা সাব-মেশিনগানটা।

দরজার চাবিটা খুলে পকেটে রাখল রানা, তারপর বস্তু লাগিয়ে দিল—যাতে পিছন থেকে এসে কেউ আক্রমণ করে বসতে না পারে। ঘুরে দেখল ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম, তারপরেই সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। ধোয়াটা আসছে একটা একক্সস্ট লিকেজ থেকে। এঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না সে। ইন্ডিয়ান সাবমেরিনের মধ্যে চলে এসেছে সে এখন। রিভলভারটা পকেটে গুঁজে তর তর করে নেমে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে।

বেশিক্ষণ খোজাখুঁজি করতে হলো না। এঞ্জিনরুমের পাশ দিয়ে কিছুদূর যেতেই একটা খোলা দরজা দিয়ে অনেক লোক দেখতে পেল রানা। সারি

সারি চেয়ারে বসে কারও বক্তৃতা শুনছে ওরা। কেউ কেউ ফিরে চাইল ওর দিকে, তারপর আবার মন দিল বক্তৃতায়। দূর থেকে নিজেদেরই লোক মনে করেছে ওরা রানাকে। এগিয়ে গেল সে।

পিছন থেকে ঢুকল রানা কন্ফারেন্স-রুমে। ডায়ালিসের ব্যবস্থা নেই—তবে তিনটে চেয়ার শোভামণ্ডলীর দিকে ফেরানো। একজন উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আর দু'জন বসে আছে পায়ের উপর পা তুলে। রানা বুঝল এই তিনজনই সাবমেরিনের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ অফিসার।

সবাইকে চমকে দিয়ে গর্জের উঠল রানার হাতের সাব-মেশিনগান। এক ঝাঁক গুলি উড়ে গেল বক্তার মাথার উপর দিয়ে। হাঁ করে কোন কথা বলতে যাচ্ছিল বক্তা—সেই রকমই রয়ে গেল মুখটা। বিস্ফারিত নেত্র চেয়ে রইল সে রানার দিকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এদিকে মুখ করা অফিসার দু'জন।

'খবরদার! কেউ এক পা নড়লেই খুন হয়ে যাবে!' গর্জের উঠল রানা। 'ইয়ট আর সাবমেরিন আমরা দখল করে নিয়েছি। মাথার উপর হাত তোলো সবাই!'

ভীত সঙ্কুপ্ত দৃষ্টিতে সবাই এ-ওর মুখের দিকে চাইল। বিনা বিধায় বিশ্বাস করল ওরা রানার কথা। দখল করে যদি না-ই নেবে তাহলে একজনের পক্ষে এত বড় সাহস করা কি করে সম্ভব হয়? কারণ, ওই সামান্য অস্ত্র দিয়ে বড় জোর দশজন লোককে ঘায়েল করতে পায়বে সে একা—কন্ফারেন্স-রুমেই কেবল ওরা আছে একশোরও বেশি লোক। কাজেই নিশ্চয়ই আরও বহু লোক আছে এর পিছনে।

'তোমরা তিনজন সোজা হেঁটে বেরিয়ে এসো বাইরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা, সামনের তিনজন। কুইক মার্চ। বাকি সবাই যেমন বসে আছে তেমনি থাকো। বাধা দেয়ার চেষ্টা না করলে তোমাদের ভয়ের কিছুই নেই। তোমাদের কারও ওপরেই কোন রকম অত্যাচার করা হবে না। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা বড় ক্ষমাশীল দয়ালু জাতি। কই, খেমে দাঁড়ালে কেন, সোজা বেরিয়ে এসো।'

সামনের লোকটা খেমে দাঁড়িয়ে একজনকে কিছু বলতে যাচ্ছিল নিচু গলায়, ধমক খেয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এগোবার ইঙ্গিত করল রানা ওদের। মাথার ওপর হাত তুলে সামনে এগোল তিনজন অফিসার।

'ইয়টে যেতে হবে তোমাদের। কোনও রকম কৌশল করবার চেষ্টা করলে নির্ধাত মারা পড়বে।'

সামনে-পিছনে তাঁক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে চলল রানা ওদের পিছন পিছন কন্ফারেন্স-রুমের দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে। দশ পা এগোতে না এগোতেই শুনতে পেল উচ্চকণ্ঠে কিছু বলছে একজন লোক কন্ফারেন্স-রুমের ভিতর। স্বরটা চিনতে পারল রানা—স্টুয়ার্ড। চিনে ফেনেছে সে রানাকে। এখন নিশ্চয়ই সবাইকে বলছে যে আসলে আর্মি বা নেভি দখল করে নেয়নি ইয়ট বা সাবমেরিন—খোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছে মাসুদ রানা। ওকেই বন্দী

করে এনে নির্ধাতন করা হচ্ছিল, কোন গতিকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

‘জলদি হাঁটো! কুইক মার্চ!’ ধমকে উঠল রানা পিছন থেকে।

বারবার পিছনে চাইতে হচ্ছে বলে দরতু বজায় রাখতে হচ্ছে রানার সামনের তিনজনের কাছ থেকে। নইলে পিছনে চাইবার সুযোগে আক্রমণ করে বসতে পারে। রানার তাড়াহড়োতে সন্দেহ করল ওরা। গতি কমিয়ে দিল আরও।

এমনি সময় কন্সটারেন্স-রুমের দরজা খুলে গেল দু’পাট। দুই সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা। তারপর এক ঝাঁক গুলি গিয়ে লাগল দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা ছয়-সাতজন লোকের গায়ে। আতঁনাদ করে পড়ে গেল তিনজন তৎক্ষণাৎ। বাকি চারজন জখম হয়েছে কেবল—তারা আরও জোরে চোঁচাচ্ছে। এজিনরুমের কাছে মোড় ঘুরেই অন্যদিকে যাচ্ছিল সামনের তিনজন। এগিয়ে এসে মাঝের লোকটার পাঁজরের উপর গুতো মারল রানা সাব-মেশিনগানের নল দিয়ে।

‘এরপর গুলি ঢুকবে ওই জায়গাটা দিয়ে। সোজা চলো, শয়তান!’

এবার পা চালানল ওরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই জ্ঞানহীন প্রহরীকে দেখে টের পেল ওরা রানার ধোঁকাবাজি। কিন্তু এখন বুঝে তেমন লাভ নেই। ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে ওরা।

আরেক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করল রানা। পিছন পিছন আসছিল অনেক লোক, কয়েকজনকে পড়ে যেতে দেখে ধমকে দাঁড়ান আবার। সামনের লোকটা বল্টু খুলে ফেলেছে ইয়টে যাবার স্টীলের দরজার। হঠাৎ উঁচু গলায় তেলেন্ড ভাষায় কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল সে। রানা তার এক কর্ণও বুঝল না।

‘শাট আপ! আর একটা কথা বললে মুখ বন্ধ করে দেব চিরকালের মত। আশে বাড়ো!’

তিনজনই চলে গেল সাবমেরিন ছেড়ে ইয়টে। প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে থাকা জ্ঞানহীন প্রহরীর কল্ট থেকে একটানে বের করে নিল রানা বাঁকা একটা এক্সট্রা ম্যাগাজিন। দরকার হতে পারে।

আর্মার্ড স্টীলের দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল রানা। চাবিটা বের না করে রেখে দিল গর্তের মধ্যে একটু বাঁকিয়ে, যাতে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ওপাশ থেকে কেউ দরজা খুলতে না পারে।

সোজা ইয়টের ব্রিজের দিকে এগোচ্ছিল রানা, হঠাৎ চোখে পড়ল ডান ধার থেকে মাথার ওপর হাত তুলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে তিনজন জু। ওদের পিছনে বালকসুলভ একটা চেহারার একাংশ দেখতে পেল সে চকিতে। অনীতাকে জঙ্গলে রেখে ফিরে এসেছে গিলটি মিঞা।

রানাকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গিলটি মিঞার মুখ।

‘আপনাকেই খুঁজছিলুম, স্যার। এই তিন শানা মাহা গোলমাল শুরু করে দিলে। তাই এদের লিয়েই খুঁজে কেঁড়াছি।’

‘তুমি আবার ফিরে এলে কেন, গিলটি মিঞা?’

‘আর বলবেন না, স্যার। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। বৌদিকে জঙ্গলের মধ্যে নুকিয়ে রেখে পেস্তল নিয়ে চলে এলুম।’

‘বৌদি! বৌদিটা আবার কে?’

‘ওই অনীতা বৌদি।’

অনীতাকে গিলটি মিঞা রানার স্ত্রী ভেবে বসেছে বোধহয়। যাই হোক, এসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই। ছয়জন লোককে সাব-মেশিনগানের মুখে নিয়ে ঢুকল সে ব্রিজে। পিছন পিছন রানার পায়ে পায়ে ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে এসে ঢুকল গিলটি মিঞা।

‘কি কথা মনে পড়ে গেল, গিলটি মিঞা?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘তেমন কিছুই নয়, স্যার। এই ইস্টিমারে উটবার খানটেক আগে চারটে পেলেন দেকেছিলুম। মাতার ওপর চক্কোর মারছিল। পাচে উটে রুমাল নেড়ে দিইচি। শালারা নেবে পড়েচে পানিতে।’

‘তুমি দেখেছ নামতে?’ জিজ্ঞেস করল রানা আয়তের সঙ্গে।

‘দেকেচি। উই উদিক নেবেচে।’

‘তুমি এক কাজ করো, গিলটি মিঞা। এই মেশিনগানটা এদের দিকে ধরে বসে থাকো। বিশটা গুলি আছে এর মধ্যে। যদি একটা লোককে একটু নড়াচড়া করতে দেখো, সবগুলোকে শেষ করে দেবে। এই জায়গাটা টিপে ধরে খালি ওদের ওপর একবার এপাশ থেকে ওপাশ বুলাবে। একজনের দিকেই আবার ধরে রেখে দিয়ো না—সব গুলি শেষ হয়ে যাবে। তোমার গুলি তো আবার ছাতে গিয়ে লাগে—পেট বরাবর ধরবে। পারবে না?’

‘নিশ্চয় পারব, স্যার।’

বানরের মত একলাফে একটা টেবিলের ওপর উঠে বসল গিলটি মিঞা। নতুন ম্যাগাজিনটা ভরে রেডি করে ওর হাতে দিল রানা। হুঙ্কার ছাড়ল গিলটি মিঞা, ‘নড়েচ কি মরেচ! খবোদ্ধার, পিচন ফিরে ভেঁড়িয়ে থাকো সবাই। একটা হাঁচি দিলেও গুলি খাবে!’

সোজা ওয়্যারলেন্স রুমে ঢুকল গিয়ে রানা। পি. সি. আই.-এর সিগন্যাল ট্যাপ করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল। সংক্ষেপে হেড অফিসে রিপোর্ট করল রানা। সাবমেরিনের খবরও জানাল। পজিশন দিল ২০.৬ নর্থ—৯২.১৫ ইস্ট। তারপর বেরিয়ে এল রেডিও রুম থেকে।

মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেল সে ছানাবড়া হয়ে গেছে ওয়্যারলেন্স অপারেটরের চোখ। ঝপ করে তুলে নিচ্ছে সে মেজর জেনারেলের পার্সোনাল টেলিফোন। মেসেজার পাঠাবার সময় নেই। খবর শুনেই চমকে উঠবে বুড়ো। কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কঁচকে যাবে। হলস্থল পড়ে যাবে সারা অফিসে। পঁচিশ মিনিটের মধ্যে কাইটার বন্যার এসে যাবে গোটা কতক। ল্যান্ড ফোর্স রওনা হয়ে যাবে বিরাট সব ট্রাক, হাফ-ট্রাক নিয়ে। ইভিয়ান নেভি-গ্রাস পাকিস্তানী সাবমেরিন গাজী আসবে তেড়ে—রানা জানে কাছাকাছি কোথাও আছে ওটা। সেই সাথে তৎপর হয়ে উঠবে অনেকগুলো দেশ—কারণ

এই মেসেজ ইন্টারসেন্ট করেছে আশপাশের পাঁচ ছয়টা রাষ্ট্র। ওয়ার্ল্ড ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে ব্যাপারটা।

গ্যাং-ওয়ে দিয়ে নেমে গেল রানা ডাঙায়। সঙ্গে হয়ে আসছে। দ্রুত পা চালান সে।

গোলাম হায়দারের সঙ্গে বোঝাপড়া বাকিই রয়ে গেছে। ওকে পালাবার সুযোগ দিলে চলবে না।

চোদ্দ

বেশ উঁচু টিলাটা। অর্ধেক উঠেই হাঁপিয়ে গেল রানা। কাহিল লাগছে শরীরটা। পায়ের কজি আর কানের নতির ব্যথাটা টনটন করতে আরম্ভ করেছে। এছাড়া সারাদিনের না খাওয়ায় এবং জ্ঞানহীন দেহের ওপর লোবাকের অভ্যাচারে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বিশ্রাম নিয়ে নিল দু'তিন মিনিট।

চোখা লোহার শিক বসানো উঁচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা পুরো টিলাটা। টিলার পূর্ব দিকটা অত্যন্ত খাড়া। প্রায় নব্বই ডিগ্রি। তাই টিলার গায়ে পনেরো ফুট চওড়া আর দশ ফুট উঁচু খাঁজ কেটে রাস্তা তৈরি করতে হয়েছে পূর্ব দিকে। গোল হয়ে কয়েক পাক খেয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা টিলার মাথায়। পূর্ব দিক থেকে চাইলে খাড়াভাবে নিচের দিকে দেখা যায় শিকগুলো। কোনমতে পা পিছলে পড়ে গেলেই স্বতম। ওদিক থেকেই দেয়ালটা উপকে এপাশে এসেছে রানা।

গোলাম হায়দারকে কি পাওয়া যাবে বাঙলোতে? প্লেন দেখে পালিয়ে যায়নি তো? নাকি ঘরের মধ্যে ছিল বলে প্লেন দেখতেই পায়নি সে? দেখা যাক।

উঠে পড়ল রানা। রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে উঠতে আরম্ভ করল সে পশ্চিম দিক থেকে। বাঙলোর পিছন দিক দিয়ে উঠতে চায় সে।

গাড়িটা গ্যারেজেই আছে দেখে অনেকটা নিশ্চিত হলো রানা। সামনের দরজা খোলা। প্রথমই ড্রাইংরুম। খালি। তার পাশেই খাবার ঘর। মাঝারি সাইজের ডাইনিং টেবিলের দু'ধারে দুটো দুটো করে চারটে চেয়ার। খোলা দেয়াল-আলমারিতে ধরে ধরে চীনা মাটির ডিশ, পট, ছুরি, কাঁটা-চামচ আর ট্রে সাজানো। এক কোণে মিটসেক—তার পাশেই কেরোসিনের রিফ্লিক্সারেটর। খোলা দরজা দিয়ে অ্যাট্যাচড বাথরুমের হাত মুখ ধোয়ার সাদা বেসিন দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল রানা।

দু'জন লোক নিচে নেমে আসছে কথা বলতে বলতে। শেষের কথা

কয়টা সুনতে পেল সে। লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভিতর। গোলাম হায়দার! বলছে, ‘...ঠিক বুঝতে পারছি না, নাজনীন। কেউ কোনও জবাব দিচ্ছে না ইয়ট থেকে। এখনি যেতে হবে আমাকে।’

‘আমিও যাব!’ আবদার ধরল নাজনীন।

‘না!-’ একটু যেন কঠিন শোনাল গোলাম হায়দারের কণ্ঠস্বর। বিপদের গন্ধ পেয়েছে সে। সেক্টের সুবাস আর ভাল লাগছে না ওর। ‘তুমি এখানেই থাকো। আমি এখনি ফিরে আসছি।’

প্রথমে ঢুকল নাজনীন, তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল গোলাম হায়দার। ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট লাগানো। সময় দিল রানা গোলাম হায়দারকে তিন পা এগিয়ে যাবার, তারপর বেরিয়ে এল দরজার আড়াল থেকে।

‘এই যে, গোলাম হায়দার! কোথায় চললে?’

কাট করে ঘুরে দাঁড়াল গোলাম হায়দার। অশ্রুট একটা বিশ্বয়ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল নাজনীনের মুখ থেকে। ডান হাতে খামচে ধরল সে গোলাম হায়দারের কোটের আস্তিন। এক ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল সেটা গোলাম হায়দার। জিভ দিয়ে নিয়ে এল সিগারেটটা ঠোঁটের কোণ থেকে মাঝখানে।

‘আমিই এসে পড়েছি, তোমার আর কষ্ট করে নিচে যেতে হবে না,’ বলল রানা। ‘শেষবারের মত আল্লামার নাম ডেকে নাও।’

রিভলভারটার দিকে চাইল গোলাম হায়দার। নীরবে একবার রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে সবটা ব্যাপার বুঝে নিল অক্লেশে। ইন্ডিয়ান নেভির ইউনিফর্ম, খালি পা, কানের লতিতে রক্ত, কমানার রিভলভার—কিছুই এড়ান না ওর চোখ। ঠোঁট থেকে হাতে নিল সে সিগারেটটা, তারপর টোকা দেয়ার ভঙ্গিতে ভুঁড়ে মারল সেটা রানার মুখের দিকে। পরমুহুর্তে লাফিয়ে সরে গিয়ে এক লাখি মারল রানার রিভলভার ধরা হাতে। ভয়ে চিৎকার করে উঠে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালান নাজনীন।

জুলন্ত সিগারেটটা সোজা এসে লেগেছে রানার বাঁ চোখের কোণে। মুহূর্তের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল রানা। রিভলভারটাও ছিটকে চলে গেল দূরে। এগিয়ে এসে ঘুসি চালান গোলাম হায়দার ওর চিবুক লক্ষ্য করে। আন্দাজে ডান দিকে ঘুরে গেল রানা ঘুসিটা লাগবার ঠিক আগের মুহূর্তে। বাম কাঁধের ওপর দিয়ে ফস্কে বেরিয়ে গেল ঘুসিটা। কিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বাম হাতে রানার পেট লক্ষ্য করে চালান গোলাম হায়দার এক ভয়ঙ্কর লো লেফট সুইং। সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু এক চোখ দিয়ে পানি ঝরছে, আরেক চোখে খরখরে ছাই। এই ঘুসিটা পুরোপুরি কাটাতে পারল না সে, টলে উঠল ঘুসি থেকে। মনে হলো যেন সঁতার কাটছে। অন্ধের মত দুই হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা গোলাম হায়দারকে।

দুর্দান্ত শক্তি গোলাম হায়দারের গায়ে। ফোঁস ফোঁস করছে সে জরুরি বেড়ালের মত। আবার ঘুসি চালান সে। এক লাখিতে টেবিল উল্টে দিয়ে সরে গেল রানা। দ্রুত চোখ মিটমিট করে ছাইগুলো সরাবার চেষ্টা করছে সে। এখনও আবছা দেখছে সে গোলাম হায়দারকে। আবার ছুটে এল গোলাম

হায়দার। একটু পিছন দিকে হেলে বা হাতটা ধরে ফেলল রানা ওর, ধরেই হ্যাঁচকা টান দিল নিজের দিকে। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড জোরে হাঁটু দিয়ে মারল গোলাম হায়দারের তলপেটে। ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না রানা, তাই ঠিক যেখানটায় মারতে চেয়েছিল সেখানে লাগল না হাঁটুটা। কিন্তু এতেই ব্যথায় আতঁনাদ করে উঠল গোলাম হায়দার। চিবুকটা উঁচু করে পড়ে যাচ্ছিল সে, রানার প্রচণ্ড রাইট হুক পড়ল চিবুকের উপর। দুই পাটি দাঁত বাড়ি খেলো খট করে, ছিটকে পড়ল সে খোলা দেয়াল-আলমারির ওপর। ঝন্ ঝন্ করে কয়েকটা প্লেট, গ্লাস আর কাঁটা-চামচ পড়ল মাটিতে। কিন্তু দুই পায়ে খাড়া রইল গোলাম হায়দার। এক হাতে চেপে ধরেছে সে তলপেট। হঠাৎ মাংস কিমা করবার একটা ছুরি তুলে নিল সে তাক থেকে। এগোচ্ছিল রানা, থমকে দাঁড়ান, নাফিয়ে সরে গেল ছুরিটা ছুটে আসতেই। রানার গলায় আঁচড় কেটে মিটসেফের ওপর গিয়ে পড়ল ছুরিটা—তার কেটে ঢুকে গেল ফলাটা ভিতরে। ততক্ষণে একটা কাঁটা-চামচ তুলে নিয়েছে গোলাম হায়দার। ডাট ছোঁড়ার মত ছুঁড়ে মারল সে কাঁটা-চামচটা কাঁটাগুলো সামনের দিকে করে। ইউনিফর্ম ভেদ করে সেটা এসে বিধল রানার বাম বাহুতে। আরেকটা কাঁটা-চামচ তুলে নিচ্ছে সে তাক থেকে। হাত থেকে কাঁটা-চামচটা বের করে ছুঁড়ে মারল রানা ওর দিকে—তারপর নাফিয়ে উঠে জোড়া পায়ে লাগি মারল পাঁজর লক্ষ্য করে। কাঁটা-চামচের আঘাত বাঁচাতে গিয়ে মাথা নিচু করল গোলাম হায়দার, লাথিটা পড়ল ঠিক জায়গা মত। দেয়ালের সঙ্গে জোরে ঠুকে গেল ওর মাথা। রানাও পড়ল মাটিতে।

রানা আশা করেছিল ঝাপিয়ে পড়বে গোলাম হায়দার, এবং সেজন্যে প্রস্তুতও ছিল। কিন্তু তা করল না। হঠাৎ উল্টানো টেবিলটা উপকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে ডাইনিংরুম থেকে। নিচয়ই গ্যারেজের দিকে ছুটেছে গোলাম হায়দার। পালাতে চাইছে সে।

তড়াক করে উঠে ছুটল রানা পিছু পিছু। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার নেমে গিয়েছে, বাইরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার আলোয় দেখল রানা বাড়ির জানধারের কোণটা ঘুরে সত্যিই দৌড়াচ্ছে গোলাম হায়দার গ্যারেজের দিকে।

রানা যখন কোণটা ঘুরল তখন গাড়ির সামনের দরজাটা খুলে ফেলেছে গোলাম হায়দার। কিন্তু ড্রাইভিং সীটের দরজা না খুলে এপাশের দরজা খুলছে কেন? নিচয়ই পিস্তল বের করছে সে। প্রাণপণে দৌড় দিল রানা। পিছন থেকে গিঠের ওপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল গোলাম হায়দার সীটের ওপর। পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে দেহের অর্ধেকটা বের করে আনল রানা, পায়ের গোড়ালি দিয়ে লাগি মারল মেরুদণ্ডের ওপর। ছটফট করছে আর বুনো তয়োরের মত ঘোং ঘোং করছে গোলাম হায়দার। আরও ঝানিকটা বের করে এনে দড়াম করে দরজাটা দিয়ে বাড়ি মারল রানা ওর মাথার ওপর। চিৎকার করে উঠল গোলাম হায়দার, প্রাণপণে দুই পা ছুঁড়ল সে পিছন দিকে অন্ধের মত। রানার হাত থেকে ছুটে গেল ওর পা, উরুর ওপর এসে পড়ল একটা লাথি বেকায়দা মত। ছিটকে পড়ে গেল রানা। পড়েই হামাগুড়ি দিয়ে উঠে

বসল। আবার, তারপর এক লাফে গাড়ির ওপাশে চলে গেল গুলি থেকে বাঁচবার জন্যে। বুম, বুম করে দুটো গুলি বেরিয়ে গেল পিছল থেকে। খাবলা খাবলা সিমেন্ট উঠে গেল রানার পায়ের কাছ থেকে। তারপর কানে এল ক্লিক করে একটা শব্দ। স্লাইড টেনে আবার ট্রিগার টিপল গোলাম হায়দার। এবারও ক্লিক। ছুঁড়ে মারল সে খালি পিঙ্কলটা রানার দিকে। টুপ করে ডুব দিল রানা। বনেটের উপর ঝাঁট করে বাড়ি খেয়ে চলে গেল সেটা রানার মাথার ওপর দিয়ে।

এইবার উঠে দাঁড়াল রানা। রক্তাক্ত, খোঁতলানো গোলাম হায়দারের মুখ। ফাঁস ফাঁস শ্বাস পড়ছে, ফুলে ফুলে উঠছে চওড়া বুকের ছাতি। এগিয়ে গেল রানা ক্ষুধার্ত চিতাবাঘের মত। হঠাৎ কয়েকটা বোতল আর যন্ত্রপাতি রাখা ছোট্ট বেক্‌টার কাছে চলে গেল গোলাম হায়দার, কি যেন উঠিয়ে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল গ্যারেজ থেকে। কি একটা জিনিস পেটের কাছে চেপে ধরে রানাকে আড়াল করে কি যেন করছে সে ননের ওপর দিয়ে পুর দিকে ছুটতে ছুটতে। রানাও ছুটল পিছন পিছন।

এখনও খানিকটা গ্লান আলো আছে, আর একটু পরেই আঁধার হয়ে যাবে চারদিক, বারোটা জেট উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ত্রিশ-চল্লিশজন প্যারাপ্রুপার নেমে আসছে আসমান থেকে। কয়েকটা মিলিটারি সী-প্লেনও চোখে পড়ল রানার অন্তরঙ্গের গ্লান কালচে আলোয়।

খুব সম্ভব আরেকটা পিঙ্কল লোড করবার চেষ্টা করছে গোলাম হায়দার। আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঁচবে এমন জায়গা নেই রানার। কাজেই দ্রুত এগিয়ে ধরতে হবে ওকে। হঠাৎ থেমেই ঘুরে দাঁড়াল গোলাম হায়দার। একটা বোতল ধরা আছে ওর হাতে। বীভৎস দেখাচ্ছে ওর মুখটা।

ধমকে দাঁড়াল রানাও। ওর ভিতর থেকে কে যেন কথা বলে উঠল: সাবধান! অ্যাসিড!

ধোঁয়াটে কি যেন বেরোচ্ছে বোতলের মুখ থেকে।

এখন পিছিয়ে যাওয়া মানেই পরাজয়। এগোতে হবে।

রানা লক্ষ করল গোলাম হায়দারের পিছন দিকে পায়ের কাছেই একটা গাছের শিকড় বেরিয়ে আছে চার ইঞ্চি উঁচু হয়ে। যদি ওকে এক পা পিছনে সরানো যায় তাহলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পড়ে যদি নাও যায়, হোঁচট খাবে। এই মুহূর্তে ঝাপিয়ে পড়লে পিছোতেও পারে।

হঠাৎ ঝট করে খানিকটা ডানপাশে সরেই ঝাঁপ দিল রানা। হাতটা সামনের দিকে ঝাঁকি দিল গোলাম হায়দার। কয়েক ফোঁটা অ্যাসিড পড়ল রানার কাঁধে। সাথে সাথেই ফোঁস্কা পড়ে গেল সেখানে। নিচু হয়ে খানিকটা ধুলো তুলল রানা মাটি থেকে। চোখের নিমেষে ছুঁড়ে মারল সে ধুলোওলো গোলাম হায়দারের মুখে-চোখে। আবার জায়গা পরিবর্তন করল সে বায়ে কেটে, তারপর ঝাপিয়ে পড়ল ওর ওপর। এক হাতে বোতল ধরা কজিটা চেপে ধরে আরেক হাতে গলা টিপে ধাক্কা দিল সে পিছন দিকে। পড়ে গেল গোলাম হায়দার। তার ওপর পড়ল রানা। হঠাৎ লক্ষ করল রানা ধীরে ধীরে

নিচের দিকে নেমে চলেছে ওরা। মাটিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে কিছুদূর, তার পরেই খাড়া দু'শো গজ। পূর্ব দিকের খাড়াইয়ের কিনারে চলে যাচ্ছে ওরা দু'শনেই।

গোলাম হায়দারের বাম হাতটা রানার চিবুকে। ঠেলা দিয়ে পিছনে সরাসরি চেঁচা করছে সে রানাকে। দু'জনেই একহাত দিয়ে বোতলটা চেপে ধরেছে। রানা বুকল এখনও ওতে অ্যাসিড আছে খানিকটা।

সর্বশক্তি প্রয়োগ করল রানা বোতলের ওপর। ধীরে ধীরে হাতটা বেঁকে গিয়ে বোতলটা চলে আসছে গোলাম হায়দারের মুখের দিকে। দু'জনেরই মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে গাল কুঁচকে রেখেছে রানা শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে গোলাম হায়দারের। হঠাৎ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল গোলাম হায়দার ভাতা গলায়। বুঝতে পেরেছে সে।

ধীরে ধীরে কাত হয়ে গেল বোতলটা। চোখের কাছে চলে এসেছে বোতলের মুখ। বেরিয়ে এল বোতলের অবশিষ্ট অ্যাসিড। গোলাম হায়দারের অমানুষিক চিৎকারে কানে তাল লেগে গেল রানার। চোখ, নাক আর গালের কিছুটা অংশ অদৃশ্য হয়ে গেল গোলাম হায়দারের। আর সেই জায়গায় দেখা দিল ফুটু ফেনা। সোঁ-সোঁ শব্দ তুলে অসংখ্য ছোট ছোট বুদ্ধ সৃষ্টি হচ্ছে ওর দুই চোখের মধ্যে। আর চেয়ে থাকতে পারল না রানা, চোখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। ছটকট করছে গোলাম হায়দার চিং হয়ে শুয়ে। দুই হাত দিয়ে শূন্যে কি যেন ধরবার চেষ্টা করছে সে। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ওর দেহটা। নব্বু দিয়ে মাটি খামচে থামবার চেষ্টা করল সে। পাঁচ সেকেন্ড আটকে থেকে আবার নামতে থাকল। একদম কিনারে পৌঁছে বোধহয় আবার জ্ঞান ফিরে পেল সে। পড়তে গিয়েও হঠাৎ সচকিত হয়ে পাশ ফিরবার চেষ্টা করল, তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল দুই হাত শূন্যে তুলে।

দু'শো গজ নিচে অপেক্ষা করছে দেয়ালের ওপর গীথা তীক্ষ্ণ লোহার শিকড়লো।

ইয়টে ফিরে এল রানা ক্রান্ত পদক্ষেপে।

গ্যাঙ-ওয়ার সামনেই আটকে দিল ওকে আর্মি গার্ড।

'হ্যাভস্ আপ!' বল্ল গভীর কণ্ঠে হুকুম করল কেউ লিহন থেকে।

অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চেয়ে মাথার ওপর হাত তুলল রানা। ক্ষিপ্ত হাতে লিহন থেকে পরীক্ষা করল একজন রানার সর্বাঙ্গ। অস্ত্র পাওয়া গেল না কোন।

'আরে! ওনাকে এটিকে দিলে কেন, বাওয়া?' ছাড়ো, ছাড়ো!' গিলটি মিঞার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'লিয়ে এসো। এদিকে লিয়ে এসো ওনাকে।'

রানা দেখল কয়েকজন মিলিটারি অফিসারের মাঝখানে সভা আলো করে

বসে আছে গিলটি মিঞা। উদ্ভাসিত ওর চোখ মুখ। অনীতাকেও নিয়ে আসা হয়েছে। ডেকের ওপর হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সেই ছয়জন বন্দী।

রানাকে দেখেই চিনতে পেরে উঠে দাঁড়িয়ে স্যানুট করল একজন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে গেল তড়াক করে, বুট ঠুকে স্যানুট করল। দেখাদেখি গিলটি মিঞাও উঠে দাঁড়িয়ে স্যানুট লাগিয়ে দিল একটা। রানার সম্মান দেখে কান পর্যন্ত বিকৃত হলো ওর হাসি।

দ্রুত বুকিয়ে দিল রানা অফিসারদের সাবমেরিনের ব্যাপারটা। হুইস্‌ল বাজাল একজন। দৌড়ে এসে দাঁড়াল জাহাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে পঁচিশ ত্রিশজন সশস্ত্র সৈনিক।

এমনি সময় প্রবল বেগে দুলে উঠল ইয়টটা। কি হলো! ছুটে গিয়ে দাঁড়াল সবাই রেলিং-এর ধারে। সমুদ্রের নিচে ভয়ঙ্কর আলোড়ন হচ্ছে। প্রকাণ্ড কয়েকটা বুদুদ উঠছে উপরে। হঠাৎ বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। আবার একবার দুলে উঠল ইয়ট।

পানির নিচে তুমুল আলোড়ন তুলে চলে গেল সাবমেরিন।

